কণিকায়

প্রাউট

(পঞ্চদশ ও ষোড়শ খণ্ড)

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

সূচীপত্র

কণিকায় প্রাউট

(পঞ্চদশ ও ষোড়শ খণ্ড)

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

সূচীপত্র

প্রকাশকের বিনা অনুমতিতে এই পুস্তকের কোন অংশ অর্থকরী কিংবা উপাধিগত কিংবা গবেষণা সংক্রান্ত কার্যে ব্যবহার করা অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং কেহ যেন তাহা না করেন।

–প্রকাশক

কণিকায় প্রাউট

© আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস: আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ, আনন্দনগর,

পোঃ–বাগলতা, জেলা–পুরুলিয়া, পঃ বঃ

যোগাযোগ অফিস: আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর, কোলকাতা–৭০০ ১০০

প্রথম প্রকাশ: ১লা জুন, ২০০৭

ISBN. 81-7252-252-5

প্রকাশক: আচার্য সর্বাত্মানন্দ অবধূত

আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগ

৫২৭, ভি. আই. পি. নগর,

কোলকাতা–৭০০ ১০০

সূচীপত্র

অক্ষর বিন্যাস: আচার্য অভিব্রতানন্দ অবধূত

আনন্দ প্রিন্টার্স ৩/১সি, মোহনবাগান লেন
কোলকাতা–৭০০ ০০৪

মুদ্রাকর: শ্রীকালী আর্ট প্রেস

২০৯ সি, বিধান সরণী

কোলকাতা–৭০০ ০০৬

মূল্য: পঞ্চাশ টাকা মাত্র

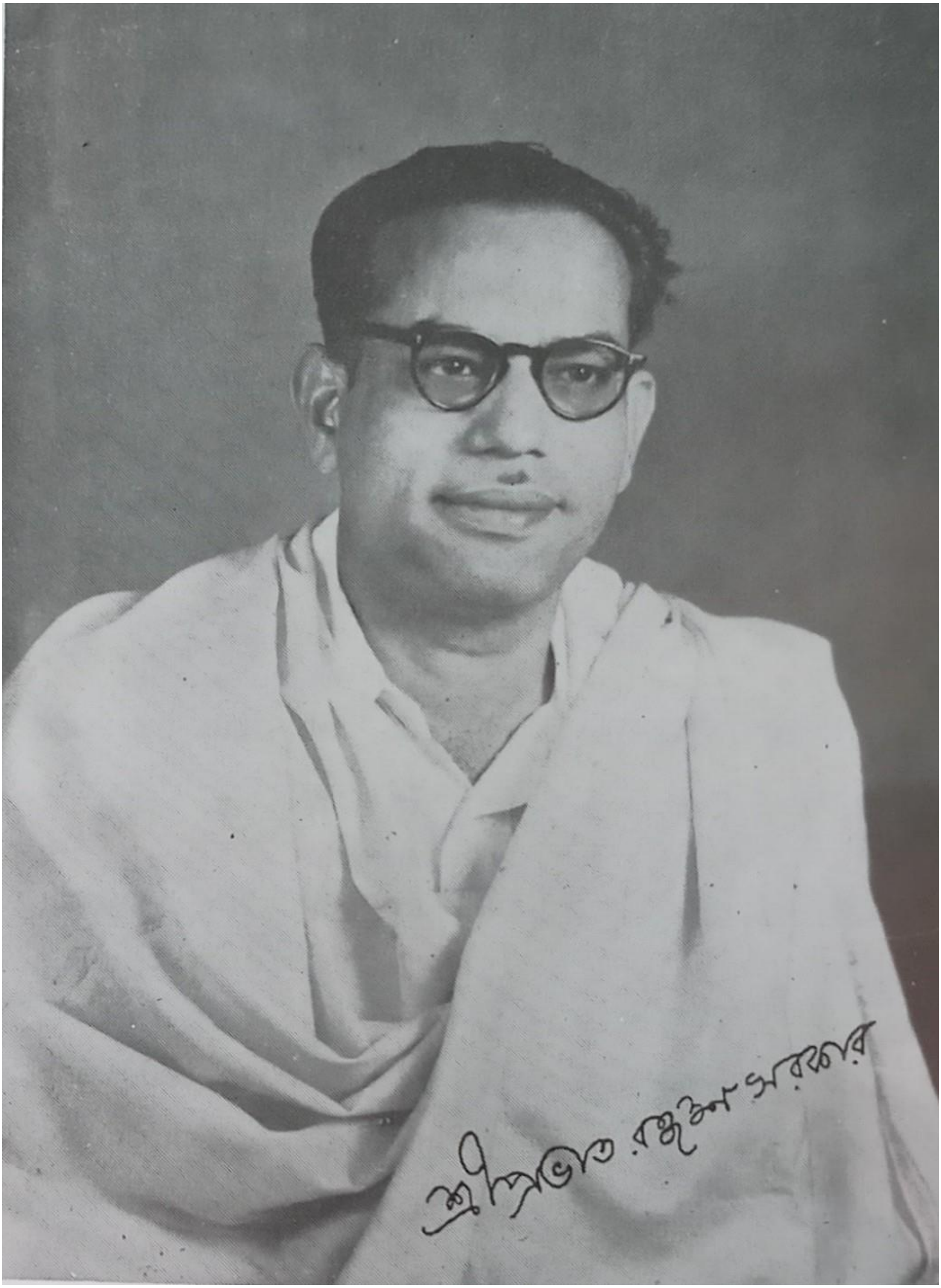

সূচীপত্র

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল:

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	aḿ	ah

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ka	kha	ga	gha	uṋa	ca	cha	ja	jha	iṋa

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
t́a	t́ha	d́a	d́ha	ńa	ta	tha	da	dha	na

সূচীপত্র

প ৰ ফ ভ ম

প ফ ৰ ভ ম

प फ ब भ म

Pa pha ba bha ma

য র ল ব

य र ल व

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

श ष स ह क्ष

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোঽহং

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

aṋ jiṋa rśi cháyá jiṋána saḿskrta tato’haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ

n ń ṋ o p r s ś t t́ u ú v y

সূচীপত্র

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f, q, qh, z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে, সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ:

ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ऴ	त्	अँ
qua	qhua	za	ŕ	ŕha	fa	ya	lra	t	aṋ

প্রকাশকের নিবেদন

“প্রাউট” এই বহুল পরিচিত শব্দটি “প্রগতিশীল উপযোগ তত্ত্ব” বা ইংরেজীতে Progressive Utilization Theory–র সংক্ষিপ্ত রূপ। যাঁরা মহান দার্শনিক শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের (ধর্মগুরুরূপে যিনি শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি নামে সমধিক পরিচিত) পুস্তকসম্ভার সম্বন্ধে অবহিত আছেন তাঁরা জানেন যে তিনি তাঁর সর্বানুস্যূত আধ্যাত্মিক দর্শন প্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে সেই দর্শনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এক সামাজিক–অর্থনৈতিক তত্ত্ব “প্রাউট”ও প্রতিপাদিত করেন। এ ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত হ’ল “অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই, চিকিৎসা চাই, নিবাস চাই। আর এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই একদিন আমি অবস্থার চাপে পড়ে ‘প্রাউট’ দর্শন তৈরী করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ যে মানুষটা খেতে পাচ্ছে না, আগে তাকে অন্ন দোব, তারপর তাকে শেখাবো অধ্যাত্ম দর্শন। তারপর তাকে সাধনায় বসাবো। তাকে সাধনাতেই বসাবো কিন্তু আগে তার পেট ভরাবার ব্যবস্থা করতে হবে তো। শীতের সময় তার বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। অসুখ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলো প্রাথমিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন–পূর্ত্তি না হলে কখনো সামগ্রিকভাবে মানুষ জাতির উন্নতি সম্ভব নয়।”

১৯৫৫ সাল থেকেই তিনি প্রথম দিককার কয়েকটি প্রবচনে তাঁর সামাজিক- অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ব্যক্ত করা শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে প্রদত্ত এক প্রবচনমালায় দু'টি বিশেষ প্রবচনের মধ্যে একটিতে ("Cosmic Brotherhood" Idea & Ideology) প্রথম তিনি প্রগতিশীল উপযোগ তত্ব তথা Progressive Utilization Theory নাম ও এই তত্ত্বের পাঁচটি মূলীভূত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। তাই ধরা হয় যে এটাই জনসমক্ষে প্রাউটের প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর ১৯৬২ সালে তিনি "আনন্দসূত্রম" পুস্তকে (পঞ্চম অধ্যায়) ভাবার্থ সহ ষোলটি সূত্রে এই প্রাউটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিককে উপস্থাপিত করেন। এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রায় ১৭০টি প্রবচনে প্রত্যক্ষভাবে তথা আরও কয়েকটি প্রবচনে আংশিকভাবে এই প্রাউট ভাবধারার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। এ ব্যাপারে যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা নিম্নরূপ 'কৃষিবিপ্লব; 'সুসামঞ্জস্য অর্থনীতি'; 'অর্থনীতির চারটি ধারা'; 'ব্লক ভিত্তিক' ও 'আন্তর্ব্লক পরিকল্পনা'; 'অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ', 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র'; 'শূদ্রবিপ্লব ও সদ্বিপ্র সমাজ'; 'শাসনব্যবস্থার কয়েকটি রূপ'; 'আদর্শ সংবিধানের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ'; 'নিউক্লিয়ার রেভেলিউশন'।

প্রাউট সংক্রান্ত প্রবচনগুলি প্রথমে তাঁর সুবিশাল পুস্তকসম্ভারে বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। ১৯৮৭ সালে তাঁর নির্দেশে "কণিকায় প্রাউট” নামক গ্রন্থমালায় সেই প্রবচনগুলি সংগ্রথিত করা শুরু হয়। ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসের মধ্যে "কণিকায় প্রাউট”–এর চতুর্দশ খণ্ড পর্যন্ত ৰাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে প্রকাশিত হয়ে যায়। এরপর নভেম্বর ১৯৮৮ থেকে শুরু করে অক্টোবর ১৯৯১ পর্যন্ত "Prout In a Nutshell"-এর পঞ্চদশ খণ্ড থেকে একবিংশ খণ্ড পর্যন্ত আরও সাতটি খণ্ড ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। "কণিকায় প্রাউট”–এর এই সাতটি খণ্ডের মোট তেষট্টিটি প্রবচন এতদিন ৰাংলায় অপ্রকাশিত থাকায় প্রাউট সম্পর্কে আগ্রহী অসংখ্য ব্যষ্টি এ ব্যাপারে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। তাঁদেরই আগ্রহাতিশয্যে "কণিকায় প্রাউট”–এর পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি প্রকাশ করার জন্যে আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রয়াস শুরু হয়। সেই প্রয়াসেরই ফলশ্রুতিস্বরূপ “কণিকায় প্রাউট পঞ্চদশ ও ষোড়শ খণ্ড” একত্রে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বাকী খণ্ডগুলি এইরূপে যথাশীঘ্র পাঠকের হাতে তুলে দেবার জন্যে আমাদের প্রয়াস চলতে থাকবে।

"কণিকায় প্রাউট” পঞ্চদশ ও ষোড়শ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত বাইশটি প্রবচনের অধিকাংশগুলি জুন ১৯৭৮ থেকে নভেম্বর

১৯৮৮ সময়কালের। যে দু'টি এর ব্যতিক্রম তা হচ্ছে, “প্রাউট প্রসঙ্গে প্রবচন" ও "ইজম্ ও মানবপ্রগতি” ("Talk on Prout Ism and Human Progress") যা ষাটের দশকের। এগুলি মূল ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুদিত। "উদ্ভিদ, পশু ও মানব" ("Plants, Animals and Human beings") ও "বিশ্বের ভূ-তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস" ("Geology & Human Civilization") এ দু'টি লেখকের 'অভিমত' চতুর্থ ও নবম খণ্ড থেকে গৃহীত। "আমাদের সমাজশাস্ত্র" ("Our Social Treatise") প্রবচনটি “তত্ত্বকৌমুদী” দ্বিতীয় খণ্ড থেকে সংকলিত। "অর্থনৈতিক মন্দা", "ভূমিক্ষয় ও বনসর্জন”, "আদর্শ নেতৃত্ব", "উন্নয়ন পরিকল্পনা”, “গণহনন”, "কম্যুনিজম প্রসঙ্গে” (আংশিক), "ধর্মমতগত ভাবজড়তা (আংশিক)”, "আইন অমান্য আন্দোলন", "সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ” এগুলি শব্দচয়নিকার বিভিন্ন খণ্ড থেকে সংগ্রথিত।

"সুসংবদ্ধ কৃষি” ("Integreted Farming") এই প্রবচনটি ইংরেজীতে প্রথম প্রকাশিত হয় লেখকের "Ideal Farming" নামক পুস্তকে যা বাংলায় অনুদিত হয়ে ২০০৬ সালে প্রকাশিত লেখকের "কৃষিকথা" নামক পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া বাকী সমস্ত প্রবচন লেখক বিভিন্ন সময়ে প্রাউট সম্বন্ধে

বিশেষ অনুসন্ধিৎসু কর্মী ও অনুগামীদের মধ্যে উপস্থাপিত করেন। তাঁরা সেগুলি সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

"প্রাউট প্রসঙ্গে প্রবচন" ("Talk on Prout") এই দীর্ঘ প্রবচনটি অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন আচার্য ত্রম্ব্যকেশ্বরানন্দ অবধূত। আচার্য বিবেকানন্দ অবধূত "সামাজিক–অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কয়েকটি দিক" ("Some Aspects of Socio-Economic Planning") প্রবচনটি ৰাংলায় অনুবাদ করেন। আমরা এঁদের দু'জনের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বাকী প্রবচনগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছেন আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগের কর্মীবৃন্দ। শ্রীপ্রণব রায় সমগ্র পুস্তকটির প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছেন। তাই তাঁর কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। আচার্য পীযুষানন্দ অবধূত বিশেষ আগ্রহ নিয়ে এই পুস্তকের DTP তৈরী, Lay out, মুদ্রণ ইত্যাদি কাজগুলি সম্পন্ন করিয়েছেন। এ ব্যাপারে আচার্য অভিব্রতানন্দ অবধূত ও তাঁর কর্মীবৃন্দ তাঁকে যথাযোগ্য সহযোগিতা করেছেন। এঁদের সকলের জন্যেই রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

লেখকের সুস্পষ্ট অভিমত হ'ল, ভাষাবিজ্ঞান তথা–শুদ্ধ বানান–বিধির স্বার্থে বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ ব–এর ব্যবহার বাংলায় থাকাই উচিত। তাই পুস্তকে এই দু'টি 'ব'–এর

যথোপযুক্ত ব্যবহার করা হয়েছে। পুস্তকের যেখানে প্রথম বন্ধনীর চিহ্ন আছে তা লেখকের বক্তব্য বলেই ধরতে হবে। আর যে সব শব্দ বা বাক্যাংশ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে আছে সেগুলি হ'ল পাঠকের সুবিধার্থে সম্পাদকীয় সংযোজনা।

আজ বিশ্বজুড়ে বঞ্চিত, শোষিত, নির্যাতিত ও অত্যাচারিত মানুষ সামাজিক- অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে যে নবতর সংগ্রাম শুরু করেছেন তাঁদের ও সমস্ত চিন্তাশীল মানুষদের কিছুমাত্র প্রয়োজন যদি সংসাধিত হয় এই পুস্তকের মাধ্যমে, তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

॥ সূচীপত্র ॥

(পঞ্চদশ খণ্ড)

প্রাউট প্রসঙ্গে প্রবচন　　পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উন্নয়ন

সামাজিক–অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কয়েকটি দিক

অর্থনৈতিক মন্দা　　ভূমিক্ষয় ও বনসর্জন

আদর্শ নেতৃত্ব　　উন্নয়ন পরিকল্পনা　　গণহনন

সামন্ততন্ত্র ও জমিদারী প্রথা
কম্যুনিজম প্রসঙ্গে
আদর্শের আস্তিত্বিক মূল্য

(ষোড়শ খণ্ড)

ইজম্ ও মানবপ্রগতি..
উদ্ভিদ, পশু ও মানব
আমাদের সমাজশাস্ত্র
বিশ্বের ভূ-তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস
সুসংবদ্ধ কৃষি
ধর্মমতগত ভাবজড়তা
আইন অমান্য আন্দোলন
সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ
তিন প্রকারের জীবিকা
তিনটি মৌল সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক নীতি

(অন্য গন্য বুক মার্কস)

Supremacy.
Suzerainty.
অঙ্গদেশ

সূচীপত্র

অস্ত্রিকদের বৈশিষ্ট্য আনন্দনগর আনন্দ পরিবার

আর্যদের বৈশিষ্ট্যঃ একতা ঐক্য ও সংশ্লেষণ

চরম দণ্ড রাহিত্য চারটি মুখ্য জাতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

জম্মু ও কশ্মীর জাতি ভেদ বিহীন সমাজব্যবস্থা

নিগ্রোদেরবৈশিষ্ট্যঃ পণপ্রথা পরিবারপরিকল্পনা ও স্মনিয়ন্ত্রণ

পাট্টাকবুলিয়ৎ পাপও পূণ্য পুঁজিবাদ

প্রথম দার্শনিক ছিলেন মহর্ষিকপিল প্রাউট প্রসঙ্গে প্রবচন

প্রাউটের পঞ্চ মূল সিদ্ধান্ত বর গর ও দার

বিমিশ্র জাতিগুলো বিশ্বরাষ্ট্র ভাবজড়তা ও বেদ

ভাষা ভূমিসংস্কার মঙ্গোলীয়দের বৈশিষ্ট্যঃ

মানব সভ্যতার সূত্রপাত রসায়নাগার জাতক

রাজনৈতিক দল রাঢ়ের ভূতত্ত্ব লিপি শান্তি শিক্ষাব্যবস্থা

শিবলিঙ্গের পূজা শৃঙ্খলা শ্রমিক সমস্যা সংঘাত

সংস্কৃতি সদবিপ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার সাধারণ আদর্শ

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক রীতি সামূহিক সামাজিক অনুষ্ঠান সুরক্ষা

সূচীপত্র

সুসংবদ্ধ কৃষি   সেমিটিক প্রজাতি   হাউস অব লর্ডের

হিমালয় তিন কোটি বছরের পুরনো

প্রাউট প্রসঙ্গে প্রবচন

জ্ঞান দুই ধরনের বুদ্ধি সঞ্জাত জ্ঞান ও ঐশ্বরীয় অনুভূতি সঞ্জাত জ্ঞান। বৌদ্ধিক জ্ঞান যেহেতু অভিজ্ঞতা সঞ্জাত সেহেতু তা আপেক্ষিকতার দোষে দুষ্ট। সেইজন্যেই বৌদ্ধিক জ্ঞানকে চরম জ্ঞানের দাবীদার বলা চলে না। ঐশ্বরীয় অনুভূতি সঞ্জাত জ্ঞানই চেতনাসম্পৃক্ত। এই জ্ঞানই সমস্ত কিছুকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে সমর্থ – তাই ঐশ্বরীয় অনুভূতি সঞ্জাত জ্ঞানই চরমজ্ঞান।

বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে' বিষয়ীর দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাওয়াই প্রাউটের পথ। এই পথই ৰৌদ্ধিক জ্ঞান ও ঐশ্বরীয় অনুভূতি সঞ্জাত জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের পথ। এই দুই জ্ঞানের স্পর্শ বিন্দু বা মিলন স্থলই বোধিজ্ঞান। বোধিজ্ঞানের সাহায্যে ঐশ্বরীয় অনুভূতি সঞ্জাত জ্ঞানকে আমরা জাগতিক সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করতে পারি। তাই প্রাউটও বোধিজ্ঞান।

যুক্তি হচ্ছে এক ধরনের মানসিক জরিপ। এই জরিপ নিখুঁত হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। সেজন্যে অন্ধভাবে যুক্তিকে মেনে চলা উচিত নয়। তোমার মানসিক জরিপই তোমার বিচার বিবেচনা। যেহেতু এই মানসিক জরিপ আপেক্ষিকতার দোষে দুষ্ট সেহেতু তাতে খুঁত থাকতেও পারে। ঐশ্বরীয় অনুভূতি সঞ্জাত জ্ঞানই সর্বোত্তম যুক্তি। তাই ঐশ্বরীয় অনুভূতি সঞ্জাত জ্ঞানই আদর্শ দিশারী হওয়ার অধিকারী। উদাহরণস্বরূপ, সবকিছুই পরম পিতা থেকে এসেছে আর শেষ পর্যন্ত সবকিছুই পরম পিতাতেই লীন হয়ে যাবে– এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু এই সত্য ৰৌদ্ধিক যুক্তির ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

পুঁজিবাদ

সূচীপত্র

পুঁজিবাদ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? ভোগ্যপণ্যের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিই পুঁজি। বুদ্ধিমান লোকেরা ভোগ্যপণ্যরূপে অন্যদের থেকে বেশী পুঁজি সংগ্রহ করে। কিন্তু যেহেতু ভোগ্যপণ্য বেশী দিন ধরে' জমিয়ে রাখা যায় না, সেইজন্যে তারা পুঁজি হিসেবে জমাতে থাকে অর্থ। এদেরই বলে পুঁজিবাদী। যেহেতু এই পুঁজিবাদীরা 'ভূমা–উত্তরাধিকার' তত্ত্বের বিরোধী তাই এরা পরমপিতার অধম সন্তান। তাদের এই রোগ সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে। পুঁজিবাদের বিরোধিতা করা তাই অন্যতম অনন্ত অভিব্যক্তির বীজ ধর্মের মধ্যেই নিহিত, কিন্তু সেজন্যে তোমাকে সচেষ্ট হতে হবে। পুঁজিবাদীরা মানুষকে পরম চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে' তাদের মহান হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যে পুঁজিবাদ ধর্মবিরোধী আর সেজন্যে পুঁজিবাদীদের কার্যকলাপও ধর্মবিরোধী। পুঁজিবাদীদের এই আচরণ সংশোধনের উপায় কী? নীতিবাদের অধিক্ষেত্রে দু'টি শক্তি পাশাপাশি কাজ করে অভ্যন্তরীণ আকুতি ও বাহ্যিক চাপ। বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুরই নিজস্ব শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি অনন্ত অভিস্ফুরণের পথ খোঁজে। আত্মা তথা সাক্ষীসত্তা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়। আর অভ্যন্তরীণ আকুতির বিরুদ্ধে অশুভ শক্তির কার্যকলাপকে নিষ্ক্রিয় করতে প্রচণ্ড বাহ্যিক চাপ প্রয়োগ করতে হয়। বাহ্যিক

চাপের নানা পদ্ধতির মধ্যে পড়ে অভিভাবন, উপদেশ, শাস্তি ও সংঘর্ষ। পুঁজিবাদীরা দুর্নীতিগ্রস্ত ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত। যেহেতু তাদের অভ্যন্তরীণ আকুতি খুবই নগন্য ও নিষ্ক্রিয়, সেহেতু তাদের স্বভাব সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি সম্প্রয়োগ করতেই হবে। সুন্দর সুন্দর বাক্য বিন্যাস সমন্বিত উপদেশ কার্যকরী হবে না।

মানুষের অভিব্যক্তি ত্রিস্তরীয়। মানুষ অনন্ত পরিমাণে জাগতিক সুখ, ভোগ করতে চায়। কিন্তু তার সেই অনন্ত আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তই থেকে যায়। জাগতিক সুখ ভোগের এই অনন্ত আকাঙ্ক্ষাই পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে। পুজিবাদীরা দিনরাত অর্থচিন্তায় নিমগ্ন থাকে। জাগতিক সুখ ভোগের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক মনে হলেও, যেহেতু জাগতিক সম্পদ অনন্ত নয় সেহেতু সীমিত জাগতিক সম্পদের মধ্যে অনন্ত আকাঙ্খা পূরণের ইচ্ছা এক ধরনের মানসিক রোগ। মানুষের অনন্ত মানসিক ভোগের আকাঙ্ক্ষাও অতৃপ্ত থেকে যায়। অতিরিক্ত মানসিক ভোগের আকাঙ্ক্ষা এক ধরনের মনোবিকৃতি নিয়ে আসে মানুষ অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত মানসিক আকাঙ্ক্ষার বিষয়সমূহ সীমিত। কিন্তু বিশুদ্ধ মানসিক বিষয় অসীম। তোমাদের মানস দেহ আর জড় জাগতিক চাহিদা সমূহ সর্বদাই পৃথক। আর এখান থেকেই দোলাচলটা শুরু হয়।

কিন্তু আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলেই আত্মা ও ভোগ্য বস্তুর মধ্যেকার দূরত্ব দূরীভূত হয়। আর এই অবস্থাতেই অনুভূত হয় প্রকৃত শান্তি। একটু আগে যে মানসিক রোগের কথা বলেছি সেই রোগের কারণেই অন্যের সঙ্গে সংঘাত হয়, ও তা বহু সময়ে মানুষকে নিঃস্ব করে' দেয়। ভ্রাতৃঘাতী এই সংঘাত থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে, ও মানবাধিকারকে সুরক্ষিত করতে আমাদের জাগতিক ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভোগের আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করতে হবে।

পুরাকালে প্রতাপশালী রাজা ও মহারাজারা নিজেদের বীরত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করতো বা পশুবলি দিত। আসলে এও ছিল এক ধরনের শোষণ। তারা যে বহু মন্দির নির্মাণ করতো তা আসলে তাদের ভক্তি প্রসূত ছিল না উদ্দেশ্য ছিল তাদের দুষ্কর্মকে আড়াল করা। জাগতিক জগতের শোষকদের সঙ্গে মানসিক জগতের শোষকদের মধ্যে একটা অপবিত্র বোঝাপড়া ছিল। বুদ্ধিজীবীরা সর্বকালেই এই রাজা-মহারাজাদের স্তুতি করে' এসেছে। পুঁজিবাদের আর একটা রূপ হচ্ছে পুরোহিত প্রথা। পুঁজিবাদীরা কখনওই পুরোহিত প্রথার বিরোধিতা করবে না, পুরোহিতরাও কখনও পুঁজিবাদীদের বিরোধিতা করবে না। জনসাধারণের মনে হীনম্মন্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণরা বহু গল্প ও পুরাণ তৈরী করেছে। শোষণের

উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের ভাবপ্রবণতাকে উস্কে দিতে এই সমস্ত অযৌক্তিক ও সাজানো গল্প ফাঁদা হয়েছে। সুবিধাবাদী শয়তানদের সৃষ্ট এ ধরনের জাজ্বল্যমান উদাহরণ হচ্ছে –

"ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীত বাহুরাজন্যোভবৎ

মধ্যতদস্য যদ্বৈশ্যঃ, প্যাম্ শূদ্র হজায়ত ।

ব্রাহ্মণরা মুখ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। ক্ষত্রিয়গণ সৃষ্টি হয়েছে বাহু থেকে। বৈশ্যরা সৃষ্ট হয়েছে দেহ থেকে, আর পদযুগল থেকে শূদ্ররা সৃষ্ট হয়েছে।

পুঁজিবাদী কাঠামোয় মুনাফার মনোভাবের দ্বারা শিল্প তথা উৎপাদন পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রাউট ব্যবস্থায় উপযুক্ত সদব্যবহারের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন হবে।

শ্রমিক সমস্যা

পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রমিক সমস্যা এক দুরারোগ্য ব্যাধির আকার ধারণ করেছে। প্রাচীন কালে বোনাস বলে কিছু ছিল না। কিন্তু বৃহৎ শিল্প দয়া করে কিছু বোনাস দিত। কিন্তু বর্তমানে বোনাস পাওয়া শ্রমিকদের একটা অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। লক্ষ্যণীয় এই যে, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে বেশীর ভাগ জায়গায় সেই দল শ্রমিক আন্দোলন দাবিয়ে রাখে, আর যখন ক্ষমতায় থাকে না, তখন শ্রমিক আন্দোলন সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ কমিউনিষ্ট পার্টি

ভারতের স্ট্রাইক সমর্থন করে, আর (তৎকালীন) সোভিয়েত রাশিয়ায় তা দাবিয়ে রাখতো।

শিল্প পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের দাবীকে মেনে নিয়ে, প্রকৃত মুনাফা থেকে কিছুটা শ্রমিকদের লভ্যাংশ দিয়ে, কিছুটা সংরক্ষিত মূলধন (reserved fund) ও কিছুটা প্রতিপূরক নিধি (sinking fund) মূলধন বাড়াবার উদ্দেশ্যে আলাদা করে' রাখলে সমাধান হতে পারে। কিন্তু এটা স্থায়ী সমাধান নয়। প্রশ্ন হচ্ছে প্রকৃত মুনাফার লভ্যাংশ কোন্ নীতিতে নির্দ্ধারিত হবে? বাঙলায় বাটাইদাররা প্রথমে প্রকৃত মুনাফার অর্দ্ধেক, ও পরে দুই তৃতীয়াংশ দাবী করেছিল। জগতের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে এটাও পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

সমবায় ব্যবস্থার ব্যাপক রূপায়ণ, ও কৃষি–শিল্প–বাণিজ্যের সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। প্রগ্রহ শিল্প সমূহ (key industries) স্থানীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে, ও তাদেরই মালিকাধীনে থাকবে। আর শ্রমিক সম্পর্ক সুন্দর রাখতে বোনাস ও পিস ওয়ার্ক ব্যবস্থা চালু্ করতে হবে। যে যত নিপুনভাবে যত বেশী কাজ করবে সে তত বেশী লভ্যাংশ অর্জন করবে।

বোনাস ও পিস ওয়ার্ক দুটি পৃথক ব্যবস্থা। কোন শিল্পের প্রকৃত মুনাফার একটা নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকদের শ্রমের ভিত্তিতে

যখন দেওয়া হয় তখনই তাকে বোনাস বলে। পিস ওয়ার্ক ব্যবস্থাটা ঠিক তা নয়। একটা বিশেষ কাজের জন্যে যে সময় নির্দ্ধারিত থাকে সেই সময়ের আগেই সেই কাজটা শেষ করে' ফেলে বাকী সময়ে যদি অতিরিক্ত কাজ করা হয় তাহলে সেই অতিরিক্ত কাজের জন্যে শ্রমিকদের প্রাপ্তিকে পিস ওয়ার্ক পেমেন্ট বলে। একটা কাঁচি তৈরী করতে যদি দু ঘণ্টা সময় নির্দ্ধারিত থাকে, আর যদি দেড় ঘণ্টায় হয়ে যায় তাহলে আধঘণ্টার যে অতিরিক্ত কাজ হ'ল তার জন্যে শ্রমিকের প্রাপ্তিই পিস ওয়ার্ক পেমেন্ট। শিল্পের প্রকৃত মুনাফা শেয়ার অনুযায়ী সকলকে দেওয়াকেই ডিভিডেণ্ড বলে। খুবই শিল্পোন্নত দেশ জাপানে যে শ্রমিক অসন্তোষ প্রায় নেই বললেই চলে তার কারণ হচ্ছে সেখানে বোনাস ও পিস ওয়ার্ক পেমেন্ট ব্যবস্থায় সমস্ত কাজ হয়, আর সমবায় ব্যবস্থার ধরনে সেখানকার শিল্পোদ্যোগ পরিচালিত হয়।

আমরা যেন ভুলে না যাই যে, একমাত্র শক্ত–পোক্ত সরকারের আমলেই সমবায় ঠিকভাবে কার্যকরী হতে পারে। দুর্বল গণতান্ত্রিক ধাঁচায় সমবায় ঠিক ভাবে কার্যকরী হয় না। সমবায় শুরু করার আগে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রাউটে বিচার সমর্থিত ব্যবস্থার অর্থ অল্প সময়ব্যাপী শ্রম, বেশী সময়ব্যাপী বিশ্রাম ও বেশী আরাম। শিল্পে সমবায়ের সুরক্ষার জন্যে প্রগ্রহ শিল্প সরকারী পরিচালনাধীন

হবে, ও সেখানে কর্মবিরতির (tool down) কোন পরিবেশ থাকবে না, আর তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী ধাপে সমবায় পরিচালিত শিল্প কখনই বন্ধ (closure) হয়ে যাবে না। যাইহোক, বর্তমানে যেহেতু সমবায়ের পক্ষে মনস্তাত্বিক পরিবেশ নেই সেহেতু এখনই সমবায় আন্দোলনের নির্ঘোষ সময়োচিত হবে না। এখন যদি সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহলে তা জাতীয় সম্পদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে সরকারের পক্ষে কি বাণিজ্যিক বিষয়ে জড়িয়ে পড়া উচিত হবে? যদি হয়, তাহলে সে সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানই বা কী হবে? নীতিগতভাবে এক্ষেত্রে সরকারের জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে সমবায়ের দ্বারা সে উদ্যোগ চালানো সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। তবে এগুলো কেবল বিভিন্ন যন্ত্র সংযুক্তির কারখানার (assembly factories) মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এই ধরনের যন্ত্র সংযোজনের কারখানায় যে সমস্ত যন্ত্র লাগবে সেগুলি শিল্প সমবায়ে প্রস্তুত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমবায় যদি কোন বিশেষ যন্ত্র তৈরীতে একেবারেই অপারগ হয় তবে কেবলমাত্র সেই যন্ত্র তৈরীতে সরকার উদ্যোগী হতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কোন মুনাফা করা যাবে না, কারণ মুনাফার ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়েই শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। উৎপাদনের খরচ এমন

ভাবে কমিয়ে আনতে হবে যাতে উদ্যোগটি 'না লাভ, না ক্ষতি'তে চলে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে [সরকারী উদ্যোগ] অবশ্য আর্থিক ও ব্যবসায়িক সমস্ত হিসাব পত্র রাখা অত্যন্ত জরুরী যার দ্বারা সব সময় লক্ষ্য রাখা হবে যে উদ্যোগটিতে কোন ক্ষতি হচ্ছে না। যদি কোন সময় কোন উদ্যোগ ঘাটতিতে চলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে শিল্প সমবায়ে রূপান্তরিত করতে হবে।

ভূমি সংস্কার

জমিদারী প্রথার বেশ কয়েকটি ত্রুটিই এই প্রথার অত্যধিক সমালোচিত হওয়ার কারণ। প্রথমতঃ, চাষীরা যে জমি চাষ করতো সেই জমির ওপর তার কোন অধিকার ছিল না, ছিল কেবল চাষ করার অধিকার। দ্বিতীয়তঃ, জমিদাররা বিশাল পরিমাণ জমি তাদের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে রেখে দিত। তৃতীয়তঃ, জমিদাররা যে খাজনা আদায় করতো তার অনেক কম সরকারের কাছে জমা করতো।

জমিদারী প্রথা বিলোপের ফলে এই সমস্ত ত্রুটি জনিত ক্ষতি যে দূরীভূত হয়েছে তা নয়, বরং সরকারী খাজনা আদায় দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাউট যদিও জমিদারী প্রথা সমর্থন করে না, প্রাউটের মতানুসারে ভারতের মত পশ্চাদপদ দেশে প্রথমেই জমিদারী প্রথা বিলোপ না করে'

ব্যাঙ্কে জমিদারদের গচ্ছিত টাকার উর্দ্ধসীমা নির্দ্ধারণ করে' অতি সঞ্চিত অংশ বাজেয়াপ্ত করে' প্রগ্রহ শিল্পে বিনিয়োগ করা উচিত ছিল।

এই সম্পর্কিত একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে জমির উর্দ্ধসীমা ও ব্যাঙ্কে সঞ্চিত সম্পদের উর্দ্ধসীমা দুটোই কি চালু করতে হবে। বলা বাহুল্য যে, দুটোই চালু করতে হবে। কিন্তু জমির উর্দ্ধসীমা ঠিক করার আগে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সম্পদের উর্দ্ধসীমা নির্দ্ধারণ করতে হবে। এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে সরকারের হাতে কিছু সম্পদ চলে আসবে, আর তা দিয়ে একদিকে যেমন নোতুন নোতুন শিল্প স্থাপন করা সম্ভব হবে, অন্যদিকে পুঁজিবাদের আগ্রাসন প্রতিহত করা যাবে। জমির উর্দ্ধসীমা নির্দ্ধারণ করলেও যেহেতু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বা উৎপাদন বাড়বে না সেহেতু জাতীয় প্রত্যক্ষ লাভ কিছু হবে না। উর্দ্ধসীমা নির্দ্ধারণ করার ফলে যে অতিরিক্ত জমি পাওয়া যাবে সেই জমিতে চাষ করাও সরকারের কাজ হতে পারে না। এই ধরনের ব্যবস্থা জনগণের ভাবাবেগকে আহত করবে, আর জনসাধারণ ভাববে জমিদারী প্রথা বিলোপ করে' সরকারই জমিদার হয়েছে। খাদ্যাভাব দেখা দিলেও তৎক্ষণাৎ জমি সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না।

পণপ্রথা

সামাজিক অবিচারের আর একটা জাজ্বল্যমান উদাহরণ পণপ্রথা। সভ্য সমাজে এ সত্যিই এক লজ্জার বিষয়। এই অবিচারের কারণ খোঁজার উদ্দেশ্যে আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলেই এর পেছনের দু'টি কারণ স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হবে।

প্রথমতঃ, যেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে আয়ের সমতা থাকে না সেখানেই পণপ্রথা এসে যায়। কেরলের নায়ার ও ইড়াবা সম্প্রদায় মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে চলে, সেজন্যে পুরুষেরা কোন পণ দাবী করে না। অসমের খাসিয়ারাও মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে চলে। বার্মায় পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে চললেও যেহেতু নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে সেহেতু তারাই পণ পেয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, যেখানে নারী পুরুষের সংখ্যার অনুপাতে বৈষম্য দেখা দেয় সেখানে পণপ্রথা চালু হয়ে যায়। যদি পুরুষের সংখ্যাধিক্য হয় তাহলে নারীরা পণ পায়, আর উল্টোটা হলে অর্থাৎ নারীদের সংখ্যা বেশী হলে পুরুষেরা পণ পায়। পঞ্জাবে যেহেতু নারীদের থেকে পুরুষের সংখ্যা বেশী সেহেতু নারীরা পণ পায়। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

আভিজাত্যের মেকী অহঙ্কারও পণপ্রথার কারণ। অভিজাত মানুষেরা মনে করে 'আমাদের পরিবার উচ্চশ্রেণীর। সেজন্য

আমাদের পণ প্রাপ্য।' প্রাউট ব্যবস্থায় কোন ধরনের পণপ্রথা থাকবে না।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, বাবার সম্পত্তি তার সন্তানদের মধ্যে কীভাবে বন্টিত হবে? দায়ভাগ ব্যবস্থা যদি সর্বত্র প্রচলিত হয় তাহলে কন্যারা বিধবা হয়ে গেলেও যাতে অভাবগ্রস্ত না হয়ে পড়ে সেজন্যে তার ভাইদের সঙ্গে সমান অংশ পাওয়ার ব্যবস্থা করে' তাদের অধিকার সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও কন্যারা তাদের জীবৎকালে সেই সম্পত্তি কেবল ভোগ দখল করতে পারবে, কিন্তু তাদের সেই সম্পত্তির মালিকানার অধিকার থাকা ঠিক হবে না। তার যদি কোন সন্তান না থাকে তবে তার মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তি তার ভাইদের মধ্যে, অথবা ভাইদের সন্তানদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।

এই বিশ্ব আমাদের সকলের মিলিত পৈত্রিক সম্পত্তি। এই পৈত্রিক সম্পত্তি তত্ত্বধানের দায়িত্ব প্রাউটিষ্টদেরই নিতে হবে, কেননা অন্যেরা স্বার্থপরতা বা দলবাজীর শিকার হতে পারে। ভোগের অধিকার আর তত্ত্বাবধানের অধিকার এক নয়। যেহেতু সমস্ত মানুষের মধ্যেই নেতৃত্বের গুণ থাকে না, যেহেতু সাধারণ মানুষ কেবল গড্ডালিকা প্রবাহে চলে' থাকে, সেহেতু

তত্ত্বাবধানের অধিকার নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন সামান্য কিছু মানুষেরই থাকা উচিত। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে বুদ্ধি ও বোধিতে সমুন্নত সামান্য কিছু মানুষেরই সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের অধিকার থাকা উচিত।

আমাদের জাগতিক সম্পদ আমাদের সকলের সামূহিক পৈত্রিক সম্পত্তি। প্রত্যেকটি মানুষেরই এই সম্পত্তি ভোগ করার জন্মসিদ্ধ অধিকার আছে। যারা এর বিরোধিতা করে তারা কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী। এই ভূমা উত্তরাধিকারের · বিরোধিতা বরদাস্ত করা হবে না। যদি কেউ তা করে তবে তার সেই মানসিক বিকৃতির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সুচিকিৎসাকেই 'ধর্মযুদ্ধ' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

ধান্দাবাজ শোষকরা জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে জাগতিক সম্পদ ভোগ করার যে মারাত্মক লালসা তৈরী করছে তার থেকে জনগণকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রতিটি সদবিপ্রের। এই সমস্ত ধান্দাবাজরা গণতন্ত্রের মুখোশ পরে' তাদের নগ্ন, বীভৎস উদ্দেশ্যকে আড়াল করার চেষ্টা করে। আসলে, গণতন্ত্র হচ্ছে গালভরা বুলির জাদুময় সোণায় মোরা পেতলের মুদ্রা।

জাতীয়তাবাদের জয়গান গাওয়া এখন এ যুগের হাওয়া। বস্তুতঃ জাতীয়তাবাদও এক ধরনের মানসিক রোগ। পরম তত্ত্বেরই আছে চরম ব্যাপকতা। একজন ব্যষ্টির মানসিক দৃষ্টিকোণের ওপর তার মনের ব্যাপকতা নির্ভরশীল। এই মানসিক দৃষ্টিকোণ যতই ছোট হতে থাকে ততই সে নীচমনা হয়ে যায়। যারা মনে করে জাতীয়তাবাদের থেকে জাতিবাদ খারাপ তারা ভুল করে। ভারতে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি আর মালয়ানদের সংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ। তাহলে বলতে হয় মালয়ান জাতীয়তাবাদীদের থেকে ব্রাহ্মণদের জাতিবাদের দৃষ্টিকোণ বড়। আবার পার্সিদের সংখ্যা দেড় কোটি, অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা ৭৫ লক্ষ। তাহলে মহাদেশবাদী অস্ট্রেলিয়ার থেকে জাতীয়তাবাদী পার্সিদের দৃষ্টিকোণ বড় বলে' মনে হতে পারে। আবার চীনের জাতীয়তাবাদী অপেক্ষা ভারতের জাতীয়তাবাদীরা বেশী নীচমনা ধরে' নিতে হয়। সেই জন্যেই বিশ্বৈকতাবাদকে, ও একমাত্র বিশ্বৈকতাবাদকেই সমর্থন করতে হয়। আসলে বিশ্বৈকতাবাদ কোন বাদ (ism) নয়। কারণ বিশ্বৈকতাবাদের বাইরে আর কোন কিছুই নেই, আর এই বিশ্বৈকতাবাদ কোন গোষ্ঠী বিশেষ বা দল বিশেষের ধ্বজা ধরে না। বিশ্বৈকতাবাদের মানস প্রক্ষেপণে কোন নীচতার স্থান নেই। সমস্ত ধরনের ভৌতিক ও আধিদৈবিক রোগের একমাত্র

মকরধ্বজ বিশ্বৈকতাবাদ। সেজন্যেই প্রাউটিষ্টরা অবশ্যই বিশ্বৈকতাবাদী।

বিশ্বরাষ্ট্র

বিশ্বৈকতাবাদের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে বিশ্বরাষ্ট্র গড়তেই হবে। বিশ্বের সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের সমাহারে এই বিশ্বরাষ্ট্র গড়তে হবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রেখে স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের (unit) সমাহারে গড়ে' তুলতে হবে যুক্তরাষ্ট্র সমূহ। অর্থনীতিতে অবনত অঞ্চলকে শোষণ করা অর্থনীতিতে উন্নত অঞ্চলের স্বাভাবিক প্রবণতা। এই জন্যে বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের (unit-এর) সমাহারে যুক্তরাষ্ট্র তৈরী করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের অন্তর্গত বিদর্ভ অঞ্চলের মানুষ মারাঠীভাষী হলেও মহারাষ্ট্রের মধ্যে না থেকে একটা নিজস্ব রাজ্যের দাবী করে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে পারস্যের (ইরানের) আজারবাইজান অঞ্চল (তৎকালীন) সোভিয়েতের আজারবাইজান অঞ্চলের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করতে চায়। এইভাবে যে সমস্ত অঞ্চল (unit) তৈরী হবে শাসন কার্যের সুবিধার্থে তাদের নাম বা সংজ্ঞার পরিবর্তন হতে পারে। এই সমস্ত অঞ্চল (unit) গুলির মধ্যে কিছু সাধারণ

মিল থাকে, আর সেই মিলের ভিত্তিতেই যুক্তরাষ্ট্র তৈরী করতে হবে।

বিশ্বরাষ্ট্র প্রথমদিকে হবে কেবল একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। বিশ্বরাষ্ট্র প্রণীত সেই আইন সমূহকে কার্যকরী করবে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা থাকবে সেই আইন সমূহ কার্যকরী করা বা না করার, তবে কখনই সেই আইনের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। আন্তর্যুক্তরাষ্ট্রীয় শান্তি বজায় রাখা ও আন্তগ্রহবিবাদের নিষ্পত্তির জন্যে সীমিত অথচ বিশেষভাবে নির্ধারিত ক্ষমতা বিশ্বরাষ্ট্রের থাকবে। অর্থাৎ বিশ্বরাষ্ট্রের অধীনেই বিশ্ব সেনা থাকবে। অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ পুলিশের ব্যবস্থা রাখবে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ অঞ্চলগুলিতে সদবিপ্র বোর্ড থাকবে। এই বোর্ডগুলি মিলিতভাবে আবার একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বোর্ড গড়ে নেবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বোর্ডই যুক্তরাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা করবে। এই বোর্ডগুলির সমাহারেই বিশ্বরাষ্ট্রীয় বোর্ড গড়ে উঠবে। এই সংস্থাই সার্বিক ভাবে বিশ্বরাষ্ট্রের পরিচালনা করবে কিন্তু কখনই কোন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবে না।

ভাষা

মানব সমাজে ভাষা সমস্যা এক পুরাতন ব্যাধির আকার ধারণ করেছে। ভাষা সম্পর্কিত অজ্ঞতা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। ভাষা ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। ছ'টি ধাপে ভাব প্রকাশিত হয়। ভাব যেখানে ৰীজাকারে থাকে তাকে বলে পরাশক্তি। এই পরাশক্তির অবস্থান মূলাধার চক্রে। সাধিষ্ঠান চক্রে এসে সেই ভাব মানসিক ভাবে বোধগম্য হয়। এই যে ৰীজ থেকে অঙ্কুরিত ভাবটি মনে মনে দেখা –একে বলে পশ্যন্তি শক্তি। মণিপুর চক্রে এসে সেই মানসিক ৰোধগম্যতা মানস– ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় একে বলে মধ্যমা শক্তি। এবার মানুষ সেই মানস– ধ্বনিকে ভাষায় রূপ দেবার জন্যে সচেষ্ট হয়। মানসিক অনুভূতিকে অভিপ্রকাশিত

করার এই প্রচেষ্টার নাম দ্যোতমানা শক্তি। নাভি ও কণ্ঠের মধ্যে এই শক্তি ক্রিয়াশীলা। কণ্ঠে এসে ভাব ভাষায় রূপান্তরিত হয় একে বলে বৈখরী শক্তি। বৈখরীর পরে তা বাস্তবের কথ্য ভাষার রূপ পায়, আর তাকে বলে শ্রুতিগোচরা। অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করি তা কেবল অভিপ্রকাশের ষষ্ঠ স্তরে সৃষ্টি হয়। প্রথম পাঁচটি স্তরে অভিপ্রকাশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভাষাতাত্ত্বিকদের ও ভাষা সমস্যা সৃষ্টিকারী শয়তানদের যদি এই প্রকৃত সত্য জানা থাকতো তাহলে ভাষা নিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার কোন্দলের অনেকটাই সমাধান করা

যেত। এককথায়, এ সম্পর্কিত অজ্ঞতার কারণেই মানব সমাজ গুমরে মরছে।

বিভিন্ন ভাষা সৃষ্টি করে' প্রকৃতি যেন মহাপাপ করে' ফেলেছে। কিন্তু প্রকৃতিকেও দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তার অমোঘ নিয়মেই সে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে' চলে। সভ্যতার আদিম অবস্থায় অবনত মানুষ অঙ্গভঙ্গি করে' তাদের মনের ভাব বোঝাতো। আর এমন সময় আসবে যখন কোন ভাষা থাকবে না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আবার নোতুন ধরনের অঙ্গভঙ্গি শিখে নেবে। আর মৌন থেকে যে শক্তি সঞ্চয় করবে সেই সঞ্চিত শক্তিকে তারা উন্নততর উদ্দেশ্যে লাগাবার চিন্তা করবে।

বুদ্ধিমান মানুষ সকলের ব্যবহারের উপযুক্ত একটা বিশ্বভাষা তৈরী করে' নেবে। এ ব্যাপারে তারা হীন ও ভ্রান্ত ভাবধারার বশবর্তী হবে না। সমস্ত জাগতিক সম্পদের মত ভাষাসমূহও পরমপুরুষ থেকে প্রাপ্ত আমাদের সকলকার পৈত্রিক সম্পত্তি। কোন ভাষাকে ঘৃণা করার অধিকার আমাদের নেই, সমস্ত ভাষাকেই ভালোবাসতে হবে, ও এই ভাষাগুলির মধ্যেই একটিকে বিশ্বভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু সমস্ত ভাষাই আমাদের সকলের মিলিত সম্পত্তি সেহেতু কোন ভাষারই অস্তিত্বের বিরোধীতা আমাদের করা উচিত নয়।

কোন ভাষাকেই বিজাতীয় বা জাতীয় হিসেবে চিহ্নিত করাও উচিত নয়।

বর্তমানে ইংরাজী ভাষাকেই বিশ্বভাষা করা উচিত, কারণ ভাষাটি বিজ্ঞানসম্মত ও ব্যাপক অঞ্চলে ব্যবহৃত। যে কোন সরকারেরই একে অস্বীকার করা অন্যায় হবে। সময়ের পরিবর্তনে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্য কোন ভাষাকেও বিশ্বভাষা করতে পারে। এইভাবে আমরা একটা সাধারণ যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা ব্যবহার করে' বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান করতে পারি। সেজন্যেই আগামী কিছুকালের জন্যে ইংরাজী ভাষাকেই আমরা যোগাযোগ রক্ষাকারী বিশ্বভাষার স্বীকৃতি দিতে পারি। সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বের সমস্ত ভাষাই আমার ভাষা। **কোন ভাষাকেই দেশীয়, বিদেশীয় বা জাতীয় ভাষা হিসেবে দেখা চলবে না।** সেই সঙ্গে বিশ্বভাষাকেও বিদেশী ভাষা ভাবা উচিত হবে না, বা তার প্রচার-প্রসারকে নিরুৎসাহিত করা চলবে না।

লিপি

বর্তমান বিশ্বে চার ধরনের লিপি রয়েছে আর্যভারতীয়, সমিতীয়, পাশ্চাত্য ও চীন-মঙ্গোলীয় লিপি। চীন-মঙ্গোলীয় লিপিগুলি ছবির মত দেখতে। সমস্ত অক্ষরগুলিই যেন এক-

একটি ছবি। এরকম ১০৫৫টি অক্ষর রয়েছে। পাশ্চাত্য লিপিতে অক্ষরের সংক্ষা ২০ থেকে ৩৫টি। আর্য–ভারতীয় লিপির অক্ষর সংখ্যা ৫০টির মত। আর সমিতীয় লিপিতে অক্ষরের সংখ্যা ২০ থেকে ৩০টির মত।

চীন ও জাপান যে চীন–মঙ্গোলীয় লিপিকে রোমক লিপিতে লেখবার চেষ্টা করছে তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। আরবী, ফার্সী, উর্দু, সিন্ধী, কাশ্মীরী প্রভৃতি সমিতীয় [সেমিটিক] লিপি, আর এগুলো লেখা হয় ডান থেকে বাঁ দিকে। এই লিপি লেখা বেশ কষ্টকর, আর ছাপতে অনেক সময় লাগে। এই অসুবিধা থেকে রেহাই পেতে মালয় আর আরবি ভাষীরা রোমান লিপি গ্রহণ করেছে।

তিব্বত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার লিপিসমূহ আর্য–ভারতীয় লিপির অন্তর্গত। এই লিপিগুলি বেশ ভাল, তবে যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধে দেখা দেয়। বৈবহারিক দিক দিয়ে লক্ষ্য করা গেছে রোমান লিপি সর্বাপেক্ষা ভাল। এই লিপি খুবই বিজ্ঞানসম্মত। স্থানীয় ভাবাবেগের বশবর্তী হয়েই কেউ কেউ এই লিপির বিরোধীতা করে। প্রাউটিষ্টরা কোন ধরনের লিপিরই বিরোধীতা করবে না, পাশাপাশি কোন একটি বিজ্ঞানসম্মত লিপিকে বিশ্বলিপি হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্যে বিশ্বজনমতকে উৎসাহিত করবে। বর্তমানে রোমান লিপিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত লিপি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর থেকেও

সূচীপত্র

বেশী বিজ্ঞানসম্মত লিপি আবিষ্কার করলে সেটাই হবে বিশ্বলিপি।

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। জীবনের বিভিন্ন ধরনের অভিপ্রকাশের সামূহিক নামই সংস্কৃতি। মানুষ খায়, আতিথ্য উপভোগ করে, কোন ব্যাপারে উল্লসিত হয়, আবার অন্য কোন ব্যাপারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে– এইভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে নিজেকে অভিব্যক্ত করে। এই সমস্ত অভিব্যক্তির সমাহারই সংস্কৃতি। অন্যের কাছে মঙ্গলজনক নয় এমন ধরনের অভিব্যক্তিকে বলে কৃষ্টি। উদাহরণস্বরূপ এক ইংরেজ পরিবার আতিথেয়তা করতে গিয়ে একজন ভারতীয়কে হয়ত গোমাংস পরিবেশন করলো যা ভারতীয় অতিথি পছন্দ করতে নাও পারে। সংস্কৃতি কিন্তু এমন নয়। সংস্কৃতি শব্দটা ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয়, ও এটা সকলের ক্ষেত্রেই মঙ্গলময়।

প্রাউটের মতে সমগ্র মানব সমাজের সংস্কৃতিই এক। অবশ্য এই সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্থানীয় বৈচিত্র্য থাকে, কিন্তু সংস্কৃতি বিশ্বজনীন। সকলেই খায়– তবে কেউ খায় হাত দিয়ে, কেউ কাঠি দিয়ে আবার কেউবা চামচ

দিয়ে। ভারতীয় নৃত্য মুদ্রা ভিত্তিক, আর ইয়ুরোপীয় নৃত্য ছান্দসিক কিন্তু তাই বলে' দুটিকে আলাদা সংস্কৃতি বলা ঠিক হবে না।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যত বেশী পরস্পর মেলামেশা করবে ততই স্থানীয় বৈচিত্র্য কমে যাবে। কারণ মেলামেশার ফলে একই ধরনের আচার-আচরণ সৃষ্টি হয়ে যাবে। নেপালে এই ভাবেই হিন্দু ও বৌদ্ধ আচার-আচরণের মধ্যে একটা সংমিশ্রণ হয়েছে। বাঙলায় আর্য ও দ্রাবিড়ীয় আচার-আচরণের সংমিশ্রণ হয়েছে। এই স্থানীয় বৈচিত্র্যকে আচার-আচরণ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অভিব্যক্তিকে আচার-আচরণ বলা যায়, কিন্তু অভিব্যক্তি মাত্রই সংস্কৃতি। অতএব ভাষা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী সীমানা নির্দ্ধারণ করাটা ভ্রান্তিবিলাস মাত্র। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিশ্ব সংস্কৃতি একই। আচার-আচরণ অনুযায়ীও সীমানা নির্দ্ধারণ সম্ভব নয়, কারণ একই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের আচার- আচরণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ

সূচীপত্র

কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা জন্মহার বৃদ্ধিকে সমর্থন করে না, কারণ জন্মহার বৃদ্ধি হলে জাগতিক সম্পদ সেই বর্দ্ধিত জনগণের সঙ্গে ভাগ করে নিতে গিয়ে তাদের সঞ্চিত সম্পদে টান পড়বে। পুঁজিবাদীরা চায় যে বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, তাতে তাদের শোষণের পথ নিষ্কণ্টক হবে। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি হয়। এই মধ্যবিত্তদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যেই পুঁজিবাদীরা পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণকে উৎসাহিত করে। তাই পুঁজিবাদীরাই এই পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্ভাবক।

যুগ যুগ ধরে' মেনে আসা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে সাধারণ মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণের পথে যায় না। একমাত্র মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই এই পথে পা বাড়ায় ও পুঁজিবাদীদের পাতা ফাঁদের শিকার হয়। প্রাউট ব্যবস্থা এর খুবই বিরুদ্ধাচরণ করবে। বিশ্বের মানুষের ভরণ পোষণের জন্যে প্রচুর সম্পদ রয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে এগোলে এমনও সময় আসবে যখন মানুষ ট্যাবলেট খেয়েই জীবন ধারণ করতে পারবে। কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিকতা রুদ্ধ না করে' প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় তার উদ্ভাবনের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব।

কৃত্রিম জন্ম নিয়ন্ত্রণের অর্থ পুরুষ বা নারীর প্রজনন ক্ষমতা কৃত্রিম ভাবে রুদ্ধ করে' দেওয়া। এতে মানব শরীর ও মনে কতকগুলি বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কৃত্রিম এই বন্ধ্যাত্বকরণের ফলে গ্ল্যান্ডের, ও গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত হর্মোনের কিছু পরিবর্তন হয়, ও শেষ পর্যন্ত তা মনের বিকাশকে ব্যাহত করে। এই পরিবর্তনের ফলে একজন মানুষ খোজায় পরিণত হয়ে যায়। প্রাউটের মতে যারা খুবই প্রতিবন্ধী অথবা জন্ম অপরাধী তাদেরই প্রজনন ক্ষমতা কৃত্রিম ভাবে রুদ্ধ করে' দেওয়া যেতে পারে।

রসায়নাগার-জাতক

এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন মানুষ রসায়নাগারে (ল্যাবরেটরীতে) টেষ্ট টিউব বেবী সৃষ্টি করবে। এই ভাবে মানুষ সৃষ্টি যখন ব্যাপকভাবে সাফল্যলাভ করবে তখন প্রকৃতি যেভাবে আদিম মানুষ অস্ট্রালোপিথেসিন থেকে শুরু করে' মানব শরীরের বিভিন্ন বিবর্তন ঘটিয়েছে ঠিক তেমনি ভাবেই প্রজনন ক্ষমতাও লুপ্ত করে' দেবে। যখন মানুষের প্রজনন ক্ষমতা থাকবে না, ও যখন মানব শিশু রসায়নাগারেই জন্মগ্রহণ করবে মানব সভ্যতার আগামী সেই যুগের আলোচনা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হবে।

সৃষ্টিশীলতা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। এই প্রবণতায় প্রোৎসাহিত হয়ে মানুষ নোতুন কিছু সৃষ্টি করে, নোতুন আবিষ্কার করে, গবেষণায় মনোনিবেশ করে। সৃষ্টির এই প্রেরণাতেই মানুষ তার আত্মজ–আত্মজা সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়। সৃষ্টির এই অভীপ্সায় যখন মানুষ নিজের অন্তরেই অন্তরতমকে তথা পরমচৈতন্যকে অনুভবের জন্যে প্রয়াসী হয় তাকেই বলে প্রেম। আধ্যাত্মিক সাধনাই সেই অনুভূতিকে অভীষ্টে রূপান্তরিত করে। অন্যথায় সৃষ্টির এই প্রবণতাকে 'কাম' (sexual impulse) আখ্যা দেওয়াই শ্রেয়। সৃষ্টির আকুলতার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের অপচয় হয় এই কামে। যখন রসায়নাগারেই মানব শিশুর উদ্ভূতি হবে, ও যখন প্রকৃতি মানুষের প্রজনন ক্ষমতা হরণ করে নেবে, তখন মানুষের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি প্রবণতা শুভ পথে সঞ্চালিত হয়ে যাবে, ও তার ফলস্বরূপ উন্নততর উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের পথ ধরে' মানুষ তার জীবনের মহত্তম লক্ষ্যে উদ্ভাসিত হবে। মানুষের এই সৃষ্টি–প্রবণতার এমনতর উপযোগিতার ধারণা এর আগে কখনই করা হয়নি। মানুষের এই সৃষ্টি–সামর্থ্যের সুবিশাল সর্বব্যাপকতার উদ্ভাবন এতকাল কেউই করেন নি। এখানেই প্রউটের নোতুনত্ব। দর্শনের জগতে প্রাউট তাই নববিধান। গবেষণাগারে দু'ধরনের মানুষ তৈরী হবে যান্ত্রিক ও জৈবিক। যান্ত্রিক মানব শিশুগুলি বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত পুতুল সদৃশ হবে। শরীর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন

সূচীপত্র

উপকেন্দ্র থেকে শরীরের বিভিন্ন অংশ পরিচালিত হবে। এদের কোন স্নায়ুকোষ বা স্নায়ু তন্ত্র থাকবে না। স্নায়ু না থাকায় তারা সাধনাও করতে পারবে না, সুখ-দুঃখের অনুভূতিও থাকবে না। তাদের প্রজনন ক্ষমতাও থাকবে না। তারা তাদের প্রভুর নির্দেশানুসারে বাধ্য ভৃত্যের মত নিঃশব্দে মানব সেবা করে যাবে।

যান্ত্রিক মানবের তুলনায় জৈব-মানব হবে অনেক ত্রুটিমুক্ত। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু - উভয়েই রাসায়নিক যৌগ হওয়ায় রসায়নাগারেই এদের প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিষিক্তিকরণের ফলে যে ভ্রুণের সৃষ্টি হয় তাও বিশেষ প্রক্রিয়ায় করা সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে যে শিশু জন্মাবে তাকেই বলা হবে রসায়নাগার-জাতক। এই পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে সমগ্র অবয়ব, এমনকি মস্তিষ্কও সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, কিন্তু মানবমন সৃষ্টি করা মানুষের সাধ্যাতীত। মানবেতিহাসের স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় যেমন হয়ে এসেছে, ঠিক তেমনি রসায়নাগার জাত ভ্রুণের সঙ্গে প্রকৃতি এক বিদেহী মনকে সংযুক্ত করে' দেবে। রসায়নাগার জাতকরা কেন সংস্কার মুক্ত হবে না, বা পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করবে তার ব্যাখ্যা এখানেই নিহিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে স্বাভাবিক মানুষ অপেক্ষা

রসায়নাগার জাতকরা দীর্ঘজীবী হবে। ভবিষ্যতে এমনকি এও সম্ভব হবে যে রসায়নাগার জাতকরা তাদের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ খুলে রেখে শুধু মস্তিষ্ক নিয়ে যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারবে। রসায়নাগার জাতকের বিভিন্ন অঙ্গ পরিবর্তন করাও সম্ভব হবে, কিন্তু মস্তিষ্ক (brain) পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ মস্তিষ্কই সংস্কারের আধার, তাই মস্তিষ্ক পরিবর্তনের অর্থই হ'ল ব্যষ্টিত্বের পরিবর্তন। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের সমাহার, আর সার্বিকভাবে সেটাই তার ব্যষ্টিত্ব। স্নায়ুকোষের মধ্যে পরিবর্তন না এনে অর্থাৎ ব্যষ্টিত্বের পরিবর্তন না করে' মস্তিষ্কের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

রসায়ানাগার জাতক–ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে প্রকৃতি মানুষের প্রজনন ক্ষমতা হরণ করে' নেবে, ও তখন আর মানুষ প্রাকৃতিক ভাবে মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে না। তখন তারা কেবল রসায়নাগার জাতকই সৃষ্টি করবে। রসায়নাগার জাতকদের সুখ–দুঃখের অনুভূতি থাকলেও তাদের যারা লালন পালন করবে তাদের প্রতি খুব বেশী টান থাকবে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যেহেতু তারা একটা ট্যাবলেট খেয়েই বেশ কয়েকটি দিন কাটিয়ে দিতে পারবে, সেহেতু তাদের খুব বেশী কায়িক পরিশ্রম করতে হবে না। যেহেতু তারা রসায়নাগারে রাসায়নিক যৌগ থেকে সৃষ্ট হবে তাই তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধনও থাকবে না। ক্রমশঃ তাদের

মধ্যে জাগতিক সুখভোগের প্রতি অনিহা সৃষ্টি হবে। কল্পনা করা অমূলক হবে না যে, এমন একদিন আসবে যখন রসায়নাগার জাতকরা মনে করবে যে প্রকৃতি তার সমস্ত মাধুর্য হারিয়ে ফেলেছে, তারা বেঁচে থাকার উৎসাহ পাবে না, ও খাদ্যেও রুচি থাকবে না। এ সম্পর্কে বেশী চিন্তা না করাই শ্রেয়। তবে সেই সঙ্গে এও ঠিক যে এই রসায়নাগার জাতকগণ তাঁদের অপূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন, ও মহান সাধক হবেন। যেহেতু তাঁদের হাতে অফুরন্ত সময় থাকবে সেহেতু তাঁরা বেশী বেশী করে' সাধনায় রত থাকবেন।

রাজনৈতিক দল

বেশীর ভাগ রাজনৈতিক নেতারা হয় জড় জাগতিক অথবা মানসিক অপরাধী। সাধারণ মানুষকে এই অপরাধীদের করাল দ্রংষ্ট্রা থেকে রক্ষা করতে হবে।

বর্তমানের এই দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রাউটিষ্টদের লড়তে হবে।প্রাউটিষ্টরা রাজনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিরোধী নয়, কিন্তু পেশাদার রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে তাদের লড়তেই হবে। রাজনীতি করার অধিকার থাকবে কেবল সদবিপ্রদের। অন্যদের রাজনীতির অঙ্গণ থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে।

সূচীপত্র

রাজনৈতিক নেতারা মুখে অহিংসার বুলি কপচালেও পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে থাকে, ও চণ্ডশক্তির ওপর নির্ভরশীল। শক্তির স্থূল রূপই চণ্ডশক্তি। সদবিপ্ররা বোধির ও বুদ্ধির শক্তিকে কাজে লাগাবেন। বোধির ইশারায় চণ্ডশক্তি তাঁদের ভৃত্যের মত কাজ করবে। অতএব বলাই বাহুল্য যে রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে সদবিপ্ররা বেশী শক্তিমান।

সংঘাত

সংঘাত জীবনের অপরিহার্য উপাদান। জীববিজ্ঞান অনুযায়ী অন্তর্নিহিত সামর্থ্যই জীবন, আর বাহ্যিক অথবা জাগতিক দিক থেকে দেখলে ভারসাম্যহীনতা থেকে ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবিরাম প্রয়াস ও সংগ্রামই জীবন। বিশ্বের সর্বত্রই এই সংঘাত বিরাজমান। কেন এই সংঘাত? সৃষ্টি রহস্যের উন্মোচনে পরিলক্ষিত হয় যে সৃষ্টির প্রারম্ভ বিন্দু তথা চক্রনাভি থেকে শুরু করে' সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ সঞ্চর ধারায় অবিদ্যাই সৃষ্টিকর্তা ভূমামনের একমাত্র সঞ্চালকশক্তি। এই পর্যায়ে বিদ্যা তথা আধ্যাত্মিক শক্তির যে কোন ভূমিকাই ছিল না, তা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ বিদ্যা ও অবিদ্যার সংগ্রামে বিদ্যা পরাভূত হওয়ায় চক্রনাভি থেকে শুরু হয় সৃষ্টির বিকাশধারা। দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ প্রত্যাহার (প্রতি সঞ্চর) ধারায় চক্রনাভিতে ফিরে যাওয়ার কালে বিদ্যাই একমাত্র কেন্দ্রানুগা গতির রসদ সরবরাহকারী।

এখানেও অবিদ্যা সংগ্রামরতা কিন্তু পরাভূতা। সারাৎসার হচ্ছে এই যে, প্রতিটি পর্যায়েই বিদ্যা ও অবিদ্যার সংগ্রামের ফলেই বাহ্যিক অথবা অভ্যন্তরীণ বিকাশধারা প্রবাহমান। অবিদ্যা জয়ী হলে ক্রিয়ান্বিত হয় স্থূলীকরণ, আর বিদ্যা জয়ী হলে ক্রিয়ান্বিত হয় অভ্যন্তরীণ যাত্রা তথা কেন্দ্রে ফিরে যাওয়া।

বিশ্বের প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যা ও অবিদ্যা অন্তহীন সংগ্রামরতা। যেহেতু সমাজের মধ্যেই বিদ্যা ও অবিদ্যার সংগ্রাম বিদ্যমান, সেহেতু শাসন ব্যবস্থায় জবরদস্ত মিলিটারী ও পুলিশী ব্যবস্থা থাকা জরুরী। এমনকি প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যা ও অবিদ্যার এই সংগ্রাম সতত বিরাজমান। যে সমস্ত দেশ অস্ত্র সংবরণে মুখর তারাও যুদ্ধের জন্যে অস্ত্র শানায়। তাই শান্তি রক্ষার্থে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও পুলিশ–মিলিটারীর প্রয়োজন থেকেই যাবে।

শিক্ষাব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে অ–শিক্ষাবিদ রাজনৈতিক নেতারা নাক গলায়। তারা শিক্ষার কিচ্ছুই না বুঝলেও তাদের মতবাদকে জনসমর্থনপুষ্ট করে' তুলতে ভাবাবেগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে।

সূচীপত্র

এছাড়া তাদের আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট প্রাপ্তিকে সুনিশ্চিত করতে, জনসমর্থন লুটে নিতেই এই রাজনৈতিক নেতারা ভাবাবেগ সৃষ্টির জন্যে সর্বাত্মক ভাবে সচেষ্ট হয়। কম্যুনিষ্ট শাসনাধীন দেশগুলিতে মার্কস্ট্রিজম ছাড়া অন্য কোন মতবাদের প্রচার নিষিদ্ধ। মার্কস্ট্রিজম সমর্থন করতে জনগণকে বাধ্য করা হয়। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত মূল্য আছে সেগুলি পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষাবিদদেরই থাকা উচিত রাজনীতিওয়ালাদের নয়। রেডিও, টেলিভিশন পরিচালনার দায়িত্বও শিক্ষাবিদদেরই ওপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত। অন্যথায় যেমন ভাবে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বইতে তাদের মতবাদের প্রচার করে, ঠিক তেমনি ভাবেই রেডিও – টেলিভিশনেও সেই সুযোগের অপব্যবহার করবে।

আনন্দ পরিবার

আনন্দ পরিবার তথা বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক পরিবারের প্রতিষ্ঠা শুধু বিশ্বরাষ্ট্রের ওপর নয়, বিশ্বজনীন সরকারের ওপর নির্ভরশীল। আরও নির্ভুল ভাবে বলতে গেলে বিশ্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থাই আনন্দ পরিবার। প্রশ্ন হ'ল কীভাবে সেই ধরনের পরিবার গড়ে' উঠবে। অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে

বিপ্লবের মাধ্যমে – সে বিপ্লব গণতান্ত্রিক হতে পারে, আবার অগণতান্ত্রিকও হতে পারে, অথবা পিরামিডীয় বিপ্লব, প্রাসাদ বিপ্লব বা ন্যূক্লিয়ার বিপ্লব হতে পারে। সমস্ত প্রকার বিপ্লবের মধ্যে ন্যূক্লিয়ার বিপ্লবই সর্বোৎকৃষ্ট। পরম চৈতন্যই সৃষ্টির মধ্যমণি। বিপ্লবীদেরও লক্ষ্য সেই পরম চৈতন্য প্রাপ্তি। এই লক্ষ্যে স্থির থেকে বিপ্লব করতে গিয়ে বিপ্লবীরা যাই করুন না কেন শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের যাত্রাপথের শেষ বিন্দুতে পৌঁছে যান। বিপ্লবের একটা আদর্শগত লক্ষ্য আবশ্যিক। সারকথা হ'ল জাগতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক – বিশ্বের এই তিন শক্তিকেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করাই বিপ্লব।

গণতান্ত্রিক পরিবেশে জনসাধারণকে প্রাউট চেতনায় সমৃদ্ধ করা যেতে পারে, আর নির্বাচনেও সেই চেতনার প্রভাব পড়তে পারে। এমনকি নির্বাচন হবার আগেই সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এই চেতনাই বিপ্লব নিয়ে আসতে পারে।

সদবিপ্র

সদবিপ্র ও নীতিবাদী সমার্থক শব্দ নয়। সাধকদের মধ্যে যাঁরা সমাজচক্রের কেন্দ্রবিন্দুকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরাই সদবিপ্র। সদবিপ্রগণ এই কেন্দ্রবিন্দুকে নিয়ন্ত্রণ করে' এক শ্রেণীর ওপর আর এক শ্রেণীর শোষণ স্তব্ধ করে' দেবেন।

প্রয়োজন হলে তাঁরা তীব্র শক্তি সম্পাতের সাহায্যে সমাজচক্রে দ্রুতি এনে বিপ্লব সংঘটিত করতে পারেন। সমাজ চক্রের পরিঘূর্ণনের ফলে যখন বৈশ্য শ্রেণীর আধিপত্য প্রতির্ষ্ঠিত হয়, ও অন্যান্য শ্রেণীর ওপর তাদের শোষণ চলতে থাকে, সদবিপ্ররা তখন বিপ্লবের দ্বারা সমাজচক্রে পরিবর্তন এনে ক্ষাত্র আধিপত্য প্রতির্ষ্ঠিত করে।

সুরক্ষা

প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের কাছে সুরক্ষা চায়। সুরক্ষার এই দাবী সততই বর্দ্ধমান। দায়িত্ব বৃদ্ধির অর্থ কর্ত্তৃত্বের বৃদ্ধি। পুরাকালে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিশৃঙ্খলা থেকে জনগণকে রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র দায়িত্ব ছিল। বর্তমানে সতত বর্দ্ধমান দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব যেমন বেড়েছে, কর্ত্তৃত্বও তেমনি বেড়েছে। পুরাকালে রাষ্ট্রের কাছে কেউ খাদ্য ও কর্মসংস্থানের দাবী করত না। তখন ধর্মঘটও হ'ত না, জনসভাও হ'ত না। এখন জনগণ চায় রাষ্ট্র তার দায়িত্ব উপলব্ধি করুক, কিন্তু যে কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ তারা চায় না।

প্রাউটের অভিমত হচ্ছে আমরা কখনই মূল জনস্বার্থের অথবা মৌলিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে যাব না। মৌলিক তত্ত্ব হচ্ছে দায়িত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বও বেড়ে যাবে। তবে

এই কর্তৃত্ব জাহির করতে গিয়ে জনগণের ভাবাবেগের বিরোধিতা করা উচিত হবে না। জীবনধারণের জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজন–পূর্ত্তির নিশ্চিততাই মৌল জনস্বার্থ।

প্রশ্ন উঠতে পারে প্রয়োজনপূর্ত্তির নিশ্চিততা প্রদান করা কি সরকারের উচিত। সরকারকে যদি চাল, ডাল, নুন, তেল প্রভৃতি সকলকে সরবরাহ করতে হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ (control) ব্যবস্থা চালু করতে হবে, আর তা অনেকেই চাইবে না। তাই প্রাউটের অভিমত হ'ল ওই সমস্ত প্রয়োজন পূর্ত্তির উপযুক্ত ক্রয়ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে সরকারকে কোন কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না। সকলের ন্যূনতম চাহিদা অনুযায়ী ভোগ্যবস্তু সরবরাহ করার আর একটা অবগুণ হচ্ছে জনগণ অলস ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়বে। তাই জনগণের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবদানের বিনিময়ে তাদের ক্রয়ক্ষমতা সরবরাহ করা উচিত।

বৈচিত্র্যই প্রকৃতির বিধান। তাই ন্যূনতম প্রয়োজনের কোন ধরা বাঁধা নিয়ম থাকতে পারে না। স্থান–কাল–পাত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী ন্যূনতম প্রয়োজনও পরিবর্ত্তিত হবে। যাঁদের শারীরিক মানসিক বা বৌদ্ধিক অবদান বেশী সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাঁদের কিছুটা বেশী দাবী থাকতেই পারে। তাঁদের জন্যে বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মত কিছু বিষয় ন্যূনতম প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কিছুই স্থির নয়, সব কিছুই গতিময়। সেজন্যে স্থান–কাল–পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ন্যূনতম প্রয়োজন ও বিশেষ সুযোগ–সুবিধাও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে প্রাউটিষ্টরা কোন্ পন্থা অবলম্বন করবেন? ন্যূনতম প্রয়োজন ও বিশেষ সুযোগ সুবিধার মধ্যের পার্থক্যকে কমিয়ে আনার অন্তহীন প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। এই প্রয়াসের একস্তরে বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলি জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন হিসেবে গণ্য হবে, আর সেই স্তরে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্নরা বিশেষ সুযোগ সুবিধা হিসেবে পাবেন আরও অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা। ভারতের পরিকল্পনা পর্ষদ প্রণীত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এক অসৎ চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। এতে একদিকে রয়েছে সরকারের অব্যবস্থিত ও অপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ, ও অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থের পরিকল্পিত শোষণকে সমর্থন। অত্যধিক বিনিয়োগ করা হলেও শ্রমিকরা ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্তির মত পর্যাপ্ত ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী হয়নি। পরিণাম স্বরূপ কম ক্রয়ক্ষমতার কারণে শ্রমিকরা যেমন কম ভোগ্যবস্তু পেয়েছে, অন্যদিকে বিনিয়োগকারীগণ অনেক বেশী ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় অনেক বেশী ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করেছে, আর তার ফলে সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে এসেছে বিশাল

অসাম্য। অর্থনীতি তার ভারসাম্য খুইয়ে বসেছে। বিনিয়োজিত পুঁজির মুনাফার সিংহভাগ ভোগ করেছে বিনিয়োগকারীগণ, আর শ্রমিকদের ভাগে পড়েছে অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। তাই ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে মধ্যবিত্তদের যে ধরনের অস্তিত্ব ছিল, এখন আর সে ধরনের মধ্যবিত্ত নেই। এখন ধোপদুরস্ত শ্রমিকরাই তথাকথিত মধ্যবিত্ত।

মানব ঐক্য সম্পূর্ণতই আদর্শগত ঐক্য, অর্থাৎ মানসিক জগতের ঐক্য। মানসিক জগতের ঐক্যই জাগতিক জগতে প্রতিফলিত হয়। ঐক্যের পরিভূতে ঐক্য সর্বদাই মানস-সঞ্জাত। আদর্শগত ঐক্য বলতে বোঝায় মনের সূক্ষ্মস্তরের ঐক্য। তবে আমরা যদি একটা গোষ্ঠীর ওপর আর এক গোষ্ঠীর শোষণে উৎসাহ যোগাই তাহলে এই মানসিক বা আদর্শগত ঐক্যেও ফাটল ধরতে পারে। তাই ঐক্যকে অব্যাহত রাখতে সমাজে কোন ধরনের শোষণের সুযোগ রাখা চলবে না। আর এই ঐক্যকে সুনিশ্চিত করতে ও শোষিত জনসাধারণের স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এক নোতুন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। তাই এক যথাযথ সামাজিক সংশ্লেষণের জন্যে তথা আদর্শগত ঐক্যের জন্যে প্রয়োজন সর্বজনীন এক দর্শন। কিন্তু জাগতিক স্তরে শোষণ বন্ধ করতে আরও যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন সেগুলি হ'ল একটি সর্বজনীন সংবিধান, একটি সর্বজনীন দণ্ড সংহিতা, ও

সূচীপত্র

জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম আবশ্যিক বস্তুসমূহের সুনিশ্চিত সরবরাহ।

যেহেতু এক জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সম্পর্কিত তাই সমগ্র মানব সমাজেই এই সমস্ত উপাদান সমূহের সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা উচিত। অদ্যাবধি জনগণের বিশ্বাস, স্থানীয় আচার-আচরণ, প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতির ভিত্তিতে আইনসংহিতা সৃষ্ট হয়েছে। সাধারণতঃ স্থানীয় আচার-আচরণ ও প্রথা-প্রকরণ মৌল মানবিক নীতির বিরুদ্ধে যায় না, কিন্তু কখনও কখনও বিরুদ্ধেও যায়। এই সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতেই আইন সংহিতা রচিত হয়েছে। আইন সংহিতা রীতিনীতিকে অংশতঃ মানে সম্পূর্ণ মানে না। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম রীতিনীতি অনুযায়ী সুদ নেওয়া পাপ কিন্তু ইসলাম দেশ সমূহের আইন সংহিতা এই সুদ নেওয়াকে অপরাধ গণ্য করে না।

পাপ ও পূণ্য

যম-নিয়মের বিধান অনুযায়ী অথবা নীতিবাদের মৌল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৎ কর্মই পূণ্য আর তার বিরুদ্ধ কর্মই পাপ। ব্যাসদেব একটি শ্লোকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে' পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করেছেন-

"অষ্টাদশ পুরাণেসু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্।

পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্, ॥"

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ব্যাসদেবের দুটি বাক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ— পরোপকারই পুণ্য, পরপীড়নই পাপ।

সামূহিক স্বার্থের সেবা তথা সমাজের গতিতে দ্রুতি নিয়ে আসাই পুণ্য। সমাজের গতিকে রুদ্ধ করে দেওয়ার প্রয়াসই পাপ।

প্রাউট পাপ ও অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখতে চায় না, আর সেই জন্যেই মৌল মানবিক নীতির ভিত্তিতেই দণ্ড সংহিতা সংরচিত হওয়া উচিত। যম–নিয়মের বিধি মেনে চলাই মৌল মানবিক নীতি মেনে চলা, আর অমান্য করাই মৌল মানবিক নীতির বিরোধীতা করা। যম–নিয়মের লঙ্ঘন যেমন পাপ তেমনি অপরাধও। মানব সমাজের আইন সংহিতা সংরচনার সময় প্রাউটিষ্টরা স্থানীয় বিশ্বাস বা প্রথাকে গুরুত্ব দেবে না। তোমরা তো জানই যে, এই আপেক্ষিক জগতে কিছুই নিখুঁত নয়। তাই এটাই স্বাভাবিক যে বিশ্বের বিচার ব্যবস্থাও তা সে অতীতের, বর্তমানের বা ভবিষ্যতের যাই হোক না কেন কখনই নিখুঁত হতে পারে না। তাই এই

ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থার ভিত্তিতে কাউকেই প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত নয়। অপরাধীই হোক অথবা নিরপরাধই হোক প্রত্যেকেই সমাজের কাছে নিজের স্বভাব সংশোধনের সুযোগ পাওয়ার দাবী করতে পারে। তাই প্রাউটের বিচার ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই তার স্বভাব-চরিত্র সংশোধনের সুযোগ পাবে। যদি কাউকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাহলে সে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই প্রাউট এই ধরনের দণ্ডকে স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু যেখানে একজন মানুষ দানব প্রকৃতির হয়ে গেছে, ও সামূহিক স্বার্থের বিরুদ্ধতা করছে, আর তার স্বভাব সংশোধনের কোন সম্ভাবনাই নেই এই ধরনের বিশেষ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই ধরনের ব্যতিক্রম অনুমোদন যোগ্য। কিন্তু সাধারণতঃ মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করা আমাদের উচিত নয়। আইনলঙ্ঘনের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি হওয়া উচিত।

বিশ্বরাষ্ট্রের একটি বিশ্ব সংবিধান ও আইন সংহিতা থাকা দরকার, আর পুলিশ- মিলিটারীও থাকা দরকার।

ঐক্য ও সংশ্লেষণ

বাস্তব ক্ষেত্রে, বিভিন্নতার মধ্যে সাধারণ ঐক্যের সূত্রকে প্রাউট গ্রহণ করে, ও সংঘাতময় স্বার্থ সমন্বিত বিভিন্ন গোষ্ঠী

বা সমষ্টির বিভেদ প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করে' এই সাধারণ সূত্রসমূহকে গ্রহণ করতে প্রোৎসাহিত করে। এইভাবে প্রাউট বিভিন্নতার মাঝে ঐক্য ও সংশ্লেষণের জয়গান গায়।

সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলেই আমরা দেখতে পাব যে যখন বিভেদ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়েছে, ও তাকে সমাজজীবনে আধিপত্য বিস্তার করতে দেওয়া হয়েছে তখনই অনৈক্য ও শোষণের সূত্রপাত হয়েছে। কতকগুলি ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

যেখানে প্রাউটের অভিমত হচ্ছে সমস্ত মানুষেরই বিশ্বের যে কোন স্থানে বসবাস করার অধিকার আছে সেখানে এই অভিমতের ভিত্তিতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে তিব্বতে চীনা অনুপ্রবেশ কি সমর্থনযোগ্য? অবশ্যই উত্তর হবে– 'না', কারণ এটা আন্তর্জাতিক অনুপ্রবেশ সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের প্রতিফলন।

অনুরূপভাবে, সিকিম ও ভূটানে নেপালীদের সম্প্রসারণ কি সমর্থনযোগ্য? আমরা যদি ইতিহাসের ঘটনাবলীর কিছুটা পেছনে ফিরে যাই তাহলে লক্ষ্য করবো যে নেপালীরা যে নেপাল ত্যাগ করেছিল তার পেছনে দুর্ভিক্ষ ছাড়া অন্য কোন কারণ ছিল না। তাই এই অভিপ্রয়াস সমালোচিত হওয়া

উচিত নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যাঁরা 'মহানেপাল'-এর আন্দোলন শুরু করেছেন তাঁরা নেপালেরও বন্ধু নন, ভারতেরও বন্ধু নন। এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া নেপালী অভিবাসীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। এই আন্দোলনের সমর্থকদের যুক্তিতেই ভারতও নেপালের তরাই এর ভোজপুরী, মৈথিলী ও বাংলাভাষী অঞ্চল দাবী করেতে পারে। কিন্তু এরকম পরিস্থিতি অবশ্যই বাঞ্ছনীয় নয়।

ইহুদীদের প্যালেষ্টাইন পর্যন্ত সম্প্রসারণও অনুরূপ বিষয়। আদিতে প্যালেষ্টাইন ইহুদিদেরই অন্তর্গত ছিল আরবীয়রা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল।

অনুরূপভাবে ভারতে পাকিস্থানী অনুপ্রবেশকে যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না। পরিকল্পিত এই অনুপ্রবেশই প্রমাণ করে যে এই অনুপ্রবেশ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

ভারত স্বাধীন হবার আগে ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস তিনটি বিভাজনের সমন্বয়ে ভারতকে একটা যুক্তরাষ্ট্র করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অসম আর বাঙলা ছিল একটা বিভাগে, পঞ্জাব, বালুচিস্তান সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু নিয়ে ছিল আর একটি বিভাগ, অবিভক্ত ভারতের অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে ছিল তৃতীয় বিভাগ। ভারত ছাড়া অন্য দুই বিভাগে কিছুদিনের মধ্যেই অন্য সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে পারবে বুঝে

মুসলমানরা এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিল। যাইহোক, অসম এই প্রস্তাব সমর্থন করেনি।

শ্রদ্ধেয় সর্বভারতীয় নেতাদের ভাষাভিত্তিক রাজ্য নির্মাণের ফলস্বরূপ ভারতের পশ্চিম কোণে পঞ্জাবী সুবার দাবী উঠেছে।

এই দাবীর নেতারা লক্ষ্য করেছিলেন যে অন্য কিছু নেতা মুসলমান দরদী, তাই তাঁরা পঞ্জাব সুবার দাবী তুললেন। স্বাধীন পঞ্জাব সৃষ্টি করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। অতীতে তাঁরা শিখিস্তানের আওয়াজ তুলেছিলেন। শিখরা বেশীর ভাগই থাকে উত্তর ও পশ্চিম পঞ্জাবে। তাছাড়াও যেহেতু পঞ্জাবে হিন্দু আর শিখ উভয়েই একই ভাষা বলে' ও একই হিন্দু আইন মেনে চলে, সেজন্যে এদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্যই নেই। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে পঞ্জাবে মুসলমানরা ছিল মোট

প্রাউট প্রসঙ্গে প্রবচন জনসংখ্যার ৫৭%, হিন্দুরা ৩০%, আর শিখরা ১০%। এখন সেখানে ৭০% হিন্দু ও ৩০% শিখ। পঞ্জাব সুবার দাবী আপাতদৃষ্টিতে ভাষা ভিত্তিক রাজ্যের দাবী বলে' মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে সাম্প্রদায়িক। যে সব নেতারা ভাষা ভিত্তিক রাজ্যের দাবী তুলেছিলেন তাঁরাই এখন শিখদের দাবীকে ভয় পাচ্ছেন। সত্যিই এ এক মজার ব্যাপার।

বিভেদ প্রবণতা সর্বদাই সামূহিক জীবনে নিয়ে আসে অনৈক্য ও শোষণ। এই বিভেদ প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে

বিভিন্নতার মধ্যে যে সমস্ত সাধারণ সূত্র আছে প্রাউট সেগুলিকে প্রোৎসাহিত করে, আর সেই সাধারণ সূত্রগুলিই ঐক্য ও সংশ্লেষণের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

প্রাউটের পঞ্চমূল সিদ্ধান্ত

(১) **কোন ব্যষ্টিই সামবায়িক সংস্থার, (collective body) সুষ্পষ্ট অনুমাদন বা অনুমতি ব্যতিরেকে ভৌতিক সম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে না।**

যদি কেউ সামবায়িক সংস্থার অনুমতি ব্যতিরেকে ভৌতিক সম্পদ সঞ্চয় করে তবে তা অবশ্যই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পরিপন্থী হয়। ব্যষ্টি স্বাধীনতাকে যে সমষ্টি স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করতে দেওয়া উচিত নয় সেটাই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ্য বিষয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যষ্টি স্বাধীনতাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হলেও যেহেতু জীবন ধারণোপযোগী ন্যূনতম প্রয়োজন ও বিশেষ সুখ-সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চিততা থাকবে সেহেতু জনগণ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না।

(২) **বিশ্বের যাবতীয় জাগতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের সর্বাধিক উপযোগ গ্রহণ, ও যুক্তিসঙ্গত বণ্টন করতে হবে।**

সূচীপত্র

এই বিশ্ব আমাদের সকলের পৈত্রিক সম্পদ। তাই এই বিশ্বের সমস্ত জাগতিক, অতি–জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের সর্বপ্রকার উপযোগ গ্রহণ করতে হবে। কোন বিষয়ের উপযোগকেই অবহেলা করা চলবে না।

(৩) **মানব সমাজের অন্তর্গত ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সর্বপ্রকার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের সর্বাধিক উপযোগ গ্রহণ করতে হবে।**

প্রত্যেকেই কিছু না কিছু শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক সামর্থ্য সম্পন্ন। নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে সমাজসেবা করার জন্যে তাদের উৎসাহিত করা উচিত। অনুরূপভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকেও তাদের সামর্থ্যনুসারে সমাজসেবা করার জন্যে উৎসাহিত করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, গোর্খারা যেহেতু যুদ্ধকুশল সেহেতু সেই গুণের উপযোগিতা নিতে তাদের সেই ধরনের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া উচিত। অনুরূপভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণার প্রতি জার্মানদের এষণার উপযোগিতা নিতে তাদের সেই দিকেই উৎসাহিত করা উচিত।

(৪) **(জাগতিক, মানসিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উপযোগ সমূহের মধ্যে যথোপযুক্ত সামঞ্জস্য রক্ষা করা উচিত।**

যদি কোন বিশেষ ব্যষ্টি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হয় অথচ কেবল তার শারীরিক সামর্থ্যের উপযোগিতা গ্রহণ করা হ'লে সমাজ তার বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের দ্বারা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই ব্যষ্টি ও সমষ্টির উপযোগিতা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উৎসাহ প্রদানের প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৫) দেশ–কাল–পাত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী উপযোগ নীতিও পরিবর্তিত হবে, আর এই উপযোগ হবে প্রগতিশীল স্বভাবের।

একটা বিশেষ উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে কর, দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান মানুষ একজন রিক্সা চালক হিসেবে রিক্সার প্রচলন যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার শারীরিক সামর্থ্যের উপযোগিতা বদলে যাবে। একজন শারীরিক ভাবে শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধিকতায় বলীয়ান হ'লে তার বৌদ্ধিকতারই উপযোগ নিতে হবে। অর্থাৎ সকলের উপযোগিতা নেওয়ার ধরণ একই রকমের হবে না। সর্বোত্তম উপযোগিতা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সর্বদাই নব নব উদ্ভাবনের জন্যে সচেষ্ট থাকতে হবে, আর উপযোগিতার প্রক্রিয়াকেও প্রগতিশীল হতে হবে।

জুলাই ১৯৬১, রাঁচী

সূচীপত্র

পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উন্নয়ন

বিশ্বের বিভিন্ন পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা আমাদের আশু কর্তব্য।যেহেতু বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন পূর্ত্তির প্রতি ও সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতির প্রতি নজর না দিয়ে সমাজের এক বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে' চলেছে, সেইজন্যেই পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবদমনের শিকার হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, মার্কসবাদে রাষ্ট্র যেহেতু কেবল সর্বহারাদের কল্যাণের কথা ভাবে, তাই যারা সর্বহারা নয় তারা অবদমিত ও প্রদমিত হয়। বলা হয়ে থাকে এই ব্যবস্থা শূদ্রের শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু বাস্তবে শূদ্রদের দ্বারা কোন শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে না। সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের ধারণাটাই অবাস্তব, অসম্ভব ও অবৈজ্ঞানিক। বাস্তবের মাটিতে মার্কসবাদের কোন শিকড় নেই। এটা একটা উদ্ভট তত্ত্ব। তাই

১৯৭৭ সালেই (তদানিন্তন) সোভিয়েত রিপাবলিক সর্বহারার শাসন ব্যবস্থার মত উদ্ভট ধারণাকে পরিত্যাগ করে' কল্যাণ রাষ্ট্রের ঘোষণা করেছিল। যাইহোক, মার্কসবাদ হ'ল এক তাসের ঘর যা হাল্কা হাতুড়ির টোকাতেই ভেঙ্গে পড়বে। বাস্তব বিশ্বে মার্কসবাদ কোন সাফল্য রেখে যেতে পারবে না।

পুঁজিবাদে বা গণতন্ত্রে রাষ্ট্র যদিও তত্ত্বগত ভাবে রাষ্ট্র যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণকামী, বাস্তবে কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ বৈশ্য তথা পুঁজিবাদীদের স্বার্থরক্ষাকারী। আর বাকীরা পর্যবসিত হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে।

প্রাউটের সমাজ ব্যবস্থায় সকলের কল্যাণই রাষ্ট্রের কাম্য– 'সর্বজন হিতায়'। এই ব্যবস্থায় কেউই দমিত বা অবদমিত হয় না। প্রাউট সদবিপ্রের শাসনকে সমর্থন করে'। সদবিপ্রেরা যেহেতু সমাজের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে', সেহেতু কেবল সদবিপ্রেরাই সকল গোষ্ঠীর কল্যাণকে সুনিশ্চিত করতে পারে।

প্রাউট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের মধ্যে উপজাতিরা সব থেকে বঞ্চিত। ত্রিপুরা সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গার ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপজাতিরা দরিদ্র ও অশিক্ষিত। তাদের সামাজিক–অর্থনৈতিক

উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বিশেষ ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে থাকবে – শিক্ষা ক্ষেত্রে অসাম্য দূর করা, ব্যাপক কুটিরশিল্পের প্রচলন, সুষ্ঠু কৃষি সহযোগিতা, অতিরিক্ত সেচের জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য শক্তি উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা, আর রেল ও টেলিফোনের সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ।

এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে, ও তাদের অবলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অনতিবিলম্বে এদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করা উচিত। এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে আফ্রিকার জুলু ও পিগমী, ৰাংলার লোধা, ছোটনাগপুরের বীরহোড়, মালদহের মালো, বিহারের রোহতাস জেলার ভোজপুরী ভাষাভাষী আঙ্গার, কশ্মীরের লাদাখী, ইয়ুরোপের রোমাঁশ, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মাওরী, ও কিন্নৌর–এর সিডিউল কাষ্টরা। রাঢ় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৈবর্ত্তদের অবলুপ্তির আশঙ্কা না থাকলেও, তাদের জন্মহার সাধারণ জন্মহার থেকে কম। এই সমস্যা সমাধানে অবিলম্বে সচেষ্ট হতে হবে।

পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর চাকরী প্রাপ্তি ও তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে কিছু কিছু দেশে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। প্রাউট–আদর্শ অনুসারে অবশ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। যখন প্রাউট–ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হবে, তখন যেহেতু

সকলের প্রগতিই সুনিশ্চিত হবে, সেহেতু কেউই চাকরীতে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে না। তখন এমন এক কর্মসংস্থান হবে যে, সে সময় মানুষকে কাজ খুঁজতে হবে না, কাজই মানুষকে খুঁজবে।

যাই হোক, বর্তমান সামাজিক–অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের দুর্দশা মোচনের উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিকভাবে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার ব্যবস্থা চালু করা যায়:–

• জন্মসূত্র যাই হোক না কেন, পিছিয়ে পড়া, গরিব পরিবারের সদস্য চাকরী ও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার পাবে।

• গরিব, কিন্তু পিছিয়ে পড়া নয়, এমন পরিবারের সদস্য দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পাবে।

• গরিব নয়, কিন্তু পিছিয়ে পড়া পরিবারের সদস্য তৃতীয় অগ্রাধিকার পাবে।

• সবশেষে সুযোগ পাবে গরিবও নয়, পিছিয়ে পড়াও নয়,

এখানে 'পিছিয়ে পড়া পরিবার' বলতে বোঝাবে যে পরিবারের সদস্য অতীতে কোন চাকরী বা শিক্ষার সুযোগ পায়নি। যতক্ষণ না দেশ দারিদ্র্য মুক্ত হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ না সকলের নূন্যতম প্রয়োজন–প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়, ততক্ষণ এই পরিবারগুলি এই সুবিধা পেতে থাকবে।

এইভাবে, কে কোন্ জাতে জন্মালো তা না দেখে, সেই পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে এই অগ্রাধিকার সূত্র মেনে চলতে হবে। তথাকথিত নীচু জাতের একজন মুচি যদি ধনী হয়, সেক্ষেত্রে সংরক্ষণের কোন প্রয়োজনই নেই, আবার তথাকথিত উচ্চজাতের অন্তর্গত একজন মৈথিলী ব্রাহ্মণ দরিদ্র হতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁর জন্যে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই ধরনের অগ্রাধিকার ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থায় সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে।

বহু অনগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর উন্নতির প্রশ্নে সংঘর্ষ চলছে। উদাহরণস্বরূপ, বিহারে জাত-পাত ভিত্তিক তথাকথিত উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছে। যদি এই ধরনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয় তাহলে ভারতসহ বিশ্বের সমস্ত দেশেই উন্নত ও অনুন্নতদের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষের সমস্ত সম্ভাবনা দূর করা যাবে। সেই সঙ্গে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সুযোগও এসে যাবে। জাত-পাত-ধর্মমত-ভাষা-নারীপুরুষ নির্বিশেষে সরকার সকলের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি অর্জনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে। এই পদ্ধতিতে পশ্চাদপদদের মন থেকে সমস্ত হীনম্মন্যতা দূর হয়ে যাবে, ও সকলেই নিজেদের সামর্থ্য

অনুযায়ী নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার মত আয় করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

জুন ১৯৭৯, কলিকাতা

সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কয়েকটি দিক

প্রাউটের মতানুযায়ী মানবসমাজ এক ও অবিভাজ্য। মানবসমাজ ঠিক যেন একটি সূতোয় গাঁথা নানা ধরনের ফুলের একটি মালা। সেই মালার সামগ্রিক সৌন্দর্য নির্ভর করে' প্রতিটি ফুলের সৌন্দর্যের ওপর। সেই রকম, যদি আমরা সমাজের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে চাই তাহলে সমাজের প্রতিটি স্তরকে সমানভাবে দৃঢ় করতে হবে।

কোনও দেশের সমাজব্যবস্থাকে ভালভাবে গড়ে' তুলতে হলে তিনটি মূল জিনিস চাই। তার প্রথমটি হচ্ছে শৃঙ্খলা। পতঞ্জলি তাঁর "যোগসূত্র" গ্রন্থ শুরু করেছিলেন এই সূত্রটি দিয়ে:-

সূচীপত্র

"অথ যোগানুশাসনম্"।

অর্থাৎ এখন আমি যোগকে আত্মানুশাসনের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করব। সেই রকম, একটা সুসংবদ্ধ সমাজব্যবস্থা গড়ে' তুলতে হলে প্রথমত চাই সামাজিক অনুশাসন বা শৃঙ্খলা। এই পৃথিবীর কিছু দেশ তাদের ক্ষমতা দ্রুত হারিয়ে ফেলছে কারণ তাদের ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত জীবনে কোন শৃঙ্খলা নেই। দ্বিতীয়ত, ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত জীবনে সার্বিক প্রগতিতে একটা যথোপযুক্ত আদর্শগত উদ্দীপনা থাকতেই হবে। তৃতীয়ত, দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেই হবে। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি খুবই সুদৃঢ় হওয়া দরকার।

সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যেও দরকার সুনির্দিষ্ট নীতি। এই নীতিগুলি বাস্তবায়িত হলেই সেগুলি সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল অঙ্গ হয়ে যায়। তাই সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেহেতু সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলিতে স্থানগত পার্থক্য থাকে তাই সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্ভাবনারও স্থানগত পার্থক্য থেকে যায়। একই অঞ্চলের দু'টি ভিন্ন অংশে জমির উর্বরতা, শ্রমের যোগান ইত্যাদি উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে ভিন্নধর্মী হতে পারে। তাই

প্রয়োজন হলে দু'টি অংশের জন্যে পৃথক পৃথক পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিহারের উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব জেলাগুলিতে উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি শ্রমের সমস্যা রয়েছে। কাজেই এই দুই এলাকার জন্যে একই পরিকল্পনা নেওয়া নিতান্তই বোকামী হবে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় এ ধরনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাগুলি রাজ্য সরকারের হাতে অথবা স্থানীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। যদি তা না করা হয় তাহলে বিকেন্দ্রিত অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হবে না। বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা করতে হলে প্রথমে সর্বনিম্নস্তরের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্লক ভিত্তিক পরিকল্পনাই হবে পরিকল্পনার সর্বনিম্নস্তর (basic level)। পরিকল্পনাকারীদের উদ্দেশ্য হবে ব্লকগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে' তোলা যাতে একটি সামাজিক- অর্থনৈতিক অঞ্চল (unit) সামগ্রিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। তা হলেই প্রকৃত অর্থে কোন দেশ বা ফেডারেশন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধও উন্নত হয়ে উঠবে। পরিকল্পনার এই প্রকরণই প্রাউটের অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের অভিনবত্ব।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে এই বিকেন্দ্রীকরণ বাস্তবায়িত হবে। সামাজিক- অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার সঠিক পদ্ধতি বা

ভিত্তি কী হবে? প্রাউট মতানুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা ইয়ূনিট সারা পৃথিবী জুড়েই করা উচিত। এই ইয়ূনিটগুলি তৈরী করতে হবে নিম্নলিখিত উপকরণের ভিত্তিতে:–

- একই ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যা।
- একই ধরনের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা।
- জাতিগত সাদৃশ্য (ethnic similarity)।
- সদৃশ সাংবেদনিক উত্তরাধিকার (সেন্টিমেন্টাল লিগ্যাসি)।
- সাধারণ (common) ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।

এই উপকরণের (factor) ভিত্তিতে সারা ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীকে সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলে (socio-economic unit) নতুন করে' ঢেলে সাজানো যেতে পারে। এই অঞ্চলগুলি শুধুমাত্র ভৌগোলিক সীমানাযুক্তই হবে না, এরা হবে এক একটি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল। এখানে মূলতঃ সামাজিক–সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে, ধর্মমত বা ভাষাগত বিষয়গুলি নয়। সমৃদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার ধারণাই ফলিত প্রাউটের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সারা পৃথিবী জুড়ে সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার যৌক্তিকতা হচ্ছে যে, কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে তৃণমূল স্তর থেকেই তা শুরু করতে হবে। তার অর্থ অর্থনৈতিক উন্নতির গতি নীচুস্তর থেকে উঁচুস্তরের দিকে যাবে, উঁচু থেকে নীচুস্তরের দিকে নয়, কারণ এটা একেবারে অবাস্তব ও ইউটোপিয়ান। প্রতিটি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলকে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী তৈরী করতে হবে আর সেগুলি করতে হলে কয়েকটি বিষয় বিচার–বিবেচনা করতে হবে। এতে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ, জমির ঢাল, নদীগুলির অবস্থান, সাংস্কৃতিক অবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা আর শিল্প ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বা প্রকল্পসমূহ। এই বিষয়গুলি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উন্নত করার পরিকল্পনা রচনায় সহায়ক হবে।

সারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে ভারতের শাসকবৃন্দের প্রাক স্বাধীনতা পর্বে বা স্বাধীনোত্তর পর্বে কোন আন্তরিক প্রয়াস ছিল না। স্বাধীনোত্তর পর্বকে তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করা যেতে পারে নেহেরু যুগ, গান্ধীযুগ ও জনতা সরকার। এই তিনটি যুগই বৈশ্য বা পুঁজিপতিদের শাসনের আওতায় ছিল, আর তাদের যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা হচ্ছে পুঁজিপতিদের প্রতি সরকারের নরম মনোভাব।

জনতা সরকার বৈশ্যযুগেরই অন্তর্গত একটি counter movement-এর প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এটা বিপ্র বা বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব ছিল না অথবা বিপ্রদের বিক্রান্তিও (counter evolution) ছিল না। এটা ছিল শুধুমাত্র একটা বৈশ্য মানসিকতার প্রভাব সম্পন্ন আন্দোলন। এই আন্দোলন পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার্থেই করা হয়েছিল। বৈশ্যদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্যেই শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও বিপ্রদের অস্থি ও মজ্জা চিবিয়ে খেতে তাদের আরও সুযোগ করে' দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু এটা ছিল একটি counter movement তাই এটি স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল ও শূদ্রবিপ্লবকে আরও নিকটে এনে দিয়েছিল। ফলতঃ এই সময়ের মধ্যে কোন অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি। কাজেই প্রাউটিষ্টদের কাছে সামাজিক–অর্থনৈতিক আন্দোলন গড়ে' তোলা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প রাস্তা নেই।

ভারতের ক্ষেত্রে প্রায় চুয়াল্লিশটি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরী করা যেতে পারে। এ ছাড়াও সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক সংখ্যক সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরী হতে পারে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই একটি সামাজিক–অর্থনৈতিক গোষ্ঠী একটি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করবে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে একটি অঞ্চলে একাধিক সামাজিক–অর্থনৈতিক গোষ্ঠী থাকতে পারে। এই গোষ্ঠীগুলি এক সঙ্গে চলতে চায় এমন মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করবে, আর এই গোষ্ঠীগুলির সকলের সঙ্গে

পারস্পরিক সম্পর্ক হবে ভাই ও বোনের। কাজেই এই ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধতা কখনই মানবতা বিরোধী হবে না। মানুষ বা অমানুষ যেই হোক না কেন 'যারাই এই সামাজিক সংহতি নষ্ট করতে চাইবে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্য সংগ্রাম করতে হবে। এশিয়া, ইউরোপ ও সমগ্র বিশ্বের অসামাজিক ও অমানবীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় ঐক্যবদ্ধ একক শক্তি হিসেবেই আন্দোলন করতে হবে। অর্থাৎ যখনই অমানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, তখন বিশ্বের সমস্ত সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে হবে, ও এই আন্দোলন করতে হবে বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত ও নির্যাতিতদের হয়ে।

কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রাউটের এই প্রায়োগিক (applied) পদক্ষেপকে সংকীর্ণতাবাদ আখ্যায় অভিহিত করতে পারে। কিন্তু সেটা কি যথার্থ? প্রাউটের সামাজিক–অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলির তিনটি ভিত্তি রয়েছে– সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক। মানুষের সমস্ত ধরণের অভিপ্রকাশই সংস্কৃতি। মাতৃভাষার ব্যবহারই অভিপ্রকাশের স্বাভাবিক ও সহজতম উপায়। মাতৃভাষার মাধ্যমে জনগণের যে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, তা যদি ব্যাহত হয় তাহলে তাদের মনে হীনম্মন্যতা বাসা বাঁধে। এর ফলে তাদের মধ্যে গেড়ে বসে পরাজিতের মনোভাব, ও শেষপর্যন্ত তাদের ওপর চলে মানস–

অর্থনৈতিক শোষণ। ভারতের কিছু নেতাদের উদ্যোগে হিন্দিভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া এর একটি উদাহরণ। হিন্দি উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের অধিবাসীদেরও স্বাভাবিক ভাষা নয়। এই সব অঞ্চলে অনেক স্থানীয় ভাষা ও উপভাষা রয়েছে যাদের অবিলম্বে উৎসাহ দেওয়া দরকার। জনগণের সাংবেদনিক উত্তরাধিকারের উপযোগিতা নিতে হলে তাদের চেতনা বাড়িয়ে তুলতে হবে, জানতে হবে শোষক কারা, বুঝতে হবে মানস- অর্থনৈতিক শোষণের কৌশল, আর উদ্বুদ্ধ হতে হবে সংগ্রামী চেতনায়। ভাষাটা নিজে তত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের ফলশ্রুতি।

একটি ভাষা সাধারণতঃ প্রতি এক হাজার বৎসরে বদলে যায়, আর লিপি পরিবর্তিত হয় প্রতি দু'হাজার বৎসর অন্তর। বেদ রচনাকালে কোন লিপি ছিল না। ঋগ্বেদের রচনা শুরু হয়েছিল আজ থেকে পনের হাজার বৎসর আগে, আর শেষ হয়েছিল পাঁচ হাজার বৎসর আগে। এইভাবে দশ হাজার বৎসর ধরে' এর রচনা হয়েছিল। প্রাচীনকালে প্রথমে মানুষ ভেড়ার চামড়ার ওপর লিখত। পরবর্তীকালে লোকে প্যাপিরাসে লিখতে শুরু করল। আরও পরে এই প্যাপিরাস থেকে কাগজ এল। ৰাংলা লেখা হত কাঠের কলমে, আর ওড়িয়া লেখা হত

লোহার কলমে। লোহার কলমে লিখতে গিয়ে কাগজ যাতে কেটে না যায় সেইজন্যে ওড়িয়া লিপির আকৃতি হয়ে গেল গোলাকার।

সব ভাষারই অভিব্যক্তির উৎস এক। ভৌম–গোষ্ঠীগত (geo-racial) পার্থক্যই বিভিন্ন রেস (race) বা জাতির উদ্ভবের কারণ। এই বিভিন্ন race সৃষ্টি করেছে অজস্র ভাষা। পৃথিবীতে মূলতঃ চারটি জনগোষ্ঠী আছে। তারা হচ্ছে (১) অস্ট্রিক যাদের উদ্ভব হয়েছে এশিয়াতে, (২) নিগ্রয়েড যাদের উদ্ভব হয়েছে আফ্রিকাতে, (৩) মঙ্গোলয়েড যাদের উদ্ভব হয়েছে মঙ্গোলিয়াতে আর (৪) আর্য যাদের উদ্ভব হয়েছে মধ্য এশিয়াতে। আর্যদের আদি নিবাস হচ্ছে দক্ষিণ রাশিয়ায় উরাল পর্বতের পূর্ব দিকে যা এখন ককেশাস নামে পরিচিত। [তদানিন্তন] USSR-এর মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলি হচ্ছে উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, আজারবাইজান ইত্যাদি। আর্য জনগোষ্ঠীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে নর্ডিক, আলপাইন ও ভূমধ্যসাগরীয়। স্কাণ্ডিনেবীয় দেশগুলিতে নর্ডিক আর্যদের দেহের রঙ লাল, ও চুলগুলি সোণালী রঙের। জার্মানী ও তার আশপাশের অঞ্চলে অবস্থিত আলপাইন আর্যদের দেহের রঙ লালচে–সাদা। চুলের রঙ কালচে–নীল, ও চোখের তারা নীল। দক্ষিণ ইয়ুরোপে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরীয় আর্যদের দেহের রঙ সাদা, চুলের রঙ কালো

ও চোখের তারা কালো। ভৌম–জনগোষ্ঠীগত পরিস্থিতির কারণে (geo-racial conditions) স্বরযন্ত্র (vocal cord) ও শরীরের অন্যান্য গ্রন্থিগত সংরচনায় পরিবর্তন এসে যায়। ফলতঃ সামগ্রিকভাবে উচ্চারণে ও ভাষার অন্যান্য বিষয়েও প্রভেদ দেখা দেয়। তাই অন্যতম উপাদান হলেও সামাজিক সংহতি স্থাপন করা, বা সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ায় ভাষা একমাত্র ভিত্তি হতে পারে না।

কোন একটি অঞ্চলের উন্নতি সুনিশ্চিত করতে হলে আরও কতকগুলি সমস্যার কথা মাথায় রাখতে হবে। প্রথম সমস্যা তাদের নিয়ে যাদের জীবিকার জন্যে অন্য অঞ্চলে যেতে হয়, ও তজ্জনিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেহেতু প্রত্যেক অঞ্চলেই কর্ম সংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, সেহেতু জীবিকার জন্যে কাউকেই নিজের অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অধিকন্তু, জীবিকার জন্যে অন্য অঞ্চলে যাওয়ার অর্থ অযথা দু'টো সংসারের বোঝা মাথায় নেওয়া।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক অঞ্চলের উন্নতি সুনিশ্চিত করতে হ'লে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অর্থের বহিঃস্রোত অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। যদি কোন অঞ্চল থেকে অর্থের বহিঃস্রোত বন্ধ না করা হয়, তাহ'লে সেখানকার মাথাপিছু আয় বাড়বে না।

এই কারণেই প্রতিটি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলের অধিবাসীদের দাবী হবে দেশের উন্নত অঞ্চলের মাথাপিছু আয়ের সমান না হওয়া পর্যন্ত সেই অঞ্চলের রাজ্য বা কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা একশো ভাগ সেই অঞ্চলেরই উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা। শোষণের মুলোৎপাটন করতে আঞ্চলিক সম্পদের বহিঃস্রোত বন্ধ করা বৈবহারিক ও সাহসী পদক্ষেপ। যাই হোক, বর্তমান নেতারা কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে কখনই সাহস করবে না।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন অঞ্চলের পারস্পরিক প্রয়োজন মেটাতে বর্তমান রপ্তানী পদ্ধতির জায়গায় প্রাউট দ্রব্য বিনিময় (barter) ব্যবস্থায় উৎসাহ দিতে চায়। রপ্তানী পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি বাণিজ্যিক ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে দাঁড়ায় ও শোষণ–মূলক হয়ে ওঠে।

প্রাউটের আরেকটি সাহসী পদক্ষেপ হচ্ছে আয়করের সম্পূর্ণ বিলোপ। যদি আয়কর সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দেওয়া হয়, আর করযোগ্য উৎপাদনের ওপর উৎপাদন শুল্ক যদি মাত্র ১০% (শতকরা দশভাগ) বাড়িয়ে দেওয়া হয় তা হলে সরকারের রাজস্বের কোন ক্ষতি হবে না। আয়কর না থাকলে কেউই কালো টাকা রাখার চেষ্টা করবে না। সব টাকাই তখন সাদা হবে, ও তার ফলে অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হবে, ব্যবসা ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে, আরও বিনিয়োগ হবে। তাছাড়া

কর্মসংস্থান আরও বৃদ্ধি পাবে, আর বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার (revenue) বৃদ্ধি পাবে। আয়কর বিলোপের দাবীটি বুদ্ধিজীবীদের গ্রহণ করা উচিত।

এছাড়াও, সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে সমস্ত যুবক–যুবতীর কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে; কর্ষকদের সেচের জল দিতে হবে; চাল–ডাল–আটা–চিনি–ভোজ্যতেল–কেরোসিন ইত্যাদি অত্যাবশ্যক পণ্যগুলি বর্তমানে রেশনে যে দরে সরবরাহ হচ্ছে, তার থেকে সস্তাদরে সমস্ত শ্রমিকদের সরবরাহ করতে হবে।

মূলনীতি (fundamental policy) অনুসারে প্রাউট ছোট ছোট রাজ্য গঠনের বিরোধী কারণ অতিরিক্ত ব্যয়ভার হেতু এগুলো নাগরিকদের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে। সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির উচিত আলাদা আলাদা উন্নয়মূলক প্রকল্পের দাবী করা, ও সেগুলি বাস্তবায়িত করার জন্যে বাজটে পৃথক সম্পদ প্রতিস্থাপনের (allocation of resources) দাবী তোলা। অবশ্য কোন কোন মহল থেকে কোন সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির রূপায়নের বাধা সৃষ্টি করা হলে সেই অঞ্চলের পৃথক রাজ্য গঠনের দাবী তোলা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না।

প্রাউটের সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির আয়তন হবে চিরপ্রসারণশীল। ছোট ছোট ইয়ূনিটগুলি একত্রিত হয়ে বড় বড় ইয়ূনিট তৈরী করবে। এমনও দিন আসতে পারে যখন সমগ্র দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া একটি ইয়ূনিটে পরিণত হবে। নীচের চারটি সর্ত্ত ভবিষ্যতে সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির মিলনের ভিত্তি হবে (১) সামাজিক–অর্থনৈতিক বৈষম্যের ক্রমাবসান, (২) বিজ্ঞান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, (৩) প্রশাসনিক দক্ষতা ও (৪) সামাজিক–সাংস্কৃতিক মেলা–মেশা।

পরিশেষে, ভৌম–মানসিক (geo-psychological) বৈশিষ্ট্য সামাজিক– অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক (aspect)। যেমন, পূর্বাদ্র অঞ্চলের (area) অধিবাসীরা দুর্বল ও ঢিলেঢালা স্বভাবের হয় কিন্তু পশ্চিমী শুষ্কাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ হয়। এটাকে বলা যেতে পারে পূর্বার্ড তত্ব। এই বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু বৈয়ষ্টিক সামর্থ্য বা দুর্বলতার জন্যে হয়নি। এগুলো ভৌম–মানসিক (geo-psychological) কারণে হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, পাঞ্জাবীরা শুষ্ক–পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করে বলে' তারা শারীরিক বলে বলীয়ান ও কঠোর পরিশ্রমী। কিন্তু পূর্বাদ্র অঞ্চলের অধিবাসী সামাজিক–অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কয়েকটি দিক অসমীয়ারা অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমী। তাই

সামাজিক–অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কালে এই সমস্ত বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। কাজেই এটা একেবারে পরিষ্কার যে প্রাউটের প্রয়োগভৌমিক দিকটা মানবিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যান্য তত্ত্ব ও দর্শনের মত ভৌম–রাজনৈতিক দেশাত্মবোধের ওপরে নয়। যেখানে অন্যান্য তত্ত্বগুলি সমাজে শুধুমাত্র শত্রুতা ও দলাদলি সৃষ্টি করে, সেখানে প্রাউটের সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলি একত্রে আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা গড়ে' তোলে। কাজেই প্রাউটের প্রায়োগিক দিকটাকে কখনই সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট বলে' অভিহিত করা যায় না।

এখন কিছু বাস্তব দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করা যাক। কীভাবে বিকেন্দ্রীকরণ নির্দিষ্ট কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে লাভজনক হতে পারে তার উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথমেই নেওয়া যাক পাটশিল্পকে। ব্রিটিশরা চলে যাবার পর বাঙলার অনেক পাটকল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাট উৎপাদনকারী কর্ষকদের বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। সেই কারণে কাঁচা পাট অবিলম্বে বিক্রয় করার জন্যে তাদের ক্রেতা অর্থাৎ পাইকারদের মর্জীর ওপর নির্ভর করতে হত। পাটশিল্পের প্রধান সমস্যা হচ্ছে এই সব পাইকারদের (middle man) উৎখাত করা। পাটশিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে পাট উৎপাদকদের উচিত উৎপাদন সমবায় প্রতিষ্ঠ করা, কাঁচা পাট থেকে পাটের সূতো

তৈরী ও সরবরাহ করা। সূতো বয়নের কারখানাগুলি পাট উৎপাদকদের কাছ থেকে সরাসরি পাটসূতো কিনে নেবে, ও ব্যাগ, মোটা কাপড় প্রভৃতি ক্রেতাসমবায়ের চাহিদা অনুযায়ী তৈরী করবে।

তামাক উত্তর ভারতে উৎপন্ন হয়, দক্ষিণ ভারতে ব্যবহারোপযোগী (pro- cessed) করা হয় ও তা উত্তর ভারতে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। উৎপাদক অঞ্চলের কর্ষকদের কাঁচা তামাককে কাটা তামাকে পরিবর্তিত করার সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার। অর্থাৎ প্রসেসিং-এর জন্যে এক অংশ থেকে অন্য অংশে তামাক নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। এতে আরও কর্মসংস্থান হবে ও তামাকের দাম কমবে।

সামবায়িক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশলাই শিল্প সফলভাবেই চলছিল। অথচ সরকার দেশলাইয়ের বৃহৎ উৎপাদনকারীদের বিশেষ সহায়তা দিয়ে এই শিল্পের ক্ষতি করেছে। দক্ষিণ-ভারতে চা উৎপাদন করার পরিবর্তে রবার চাষ করা উচিত। যদিও এই দু'টির চাষেই যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত দরকার, তবুও চা অপেক্ষা রবার উৎপাদন করা অধিক প্রয়োজনীয় ও লাভজনক। যে কোন উৎপাদনের উপযোগিতা ও বাজার [বিক্রয় সম্ভাবনা] দু'টিই থাকা দরকার।

এছাড়াও, উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাতের জন্যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে' তোলা উচিত। আনারস পাতার আঁশ কাপড় তৈরীতে লাগানো যেতে পারে। পুরুলিয়ার চুনাপাথর সিমেন্ট উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে; বাঁকুড়ার ষ্টোনচিপস্ রাস্তা তৈরীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। নদীয়া জেলায় গুড় ও ডালের উৎপাদন হতে পারে। বীরভূম জেলায় জলসম্পদকে ব্যবহার করে' যথেষ্ট পরিমাণে মাছ উৎপাদন করা যেতে পারে। আর আখের ছিবড়েকে ব্যবহার করে' পশ্চিম উত্তর প্রদেশে ও পঞ্জাবে কাগজশিল্প গড়ে' তোলা যেতে পারে।

এখন আমরা অঙ্গদেশ আর জম্মু ও কশ্মীরের উদাহরণ নিয়ে দেখব কীভাবে সঠিক পরিকল্পনা ভারতের নির্দিষ্ট সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অঙ্গদেশ

অঙ্গদেশের স্থানীয় অধিবাসীরা বহিরাগতদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। অঙ্গদেশীয় লোকেরা খুবই দরিদ্র ও সম্বলহীন। তাদের অধিকাংশই জীবিকার জন্যে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। উন্নত প্রগতিশীল পদ্ধতির কৃষি ব্যবস্থা অবলম্বন করে' তাদের ভাগ্য ফেরান যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পূর্ণিয়া,

কাটিহার, মাধেপুরা ও উত্তর ভাগলপুরে গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে ছয় মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাছাই করা কিছু অর্থকরী ফসল বেশ ভালভাবে ফলানো যেতে পারে। এই অঞ্চলে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের এক নোতুন ব্যবস্থা নীচে দেওয়া হ'ল।

(১) কেরলের হাইব্রিড প্রজাতির নারিকেল। এর প্রতিটি চারা লাগানোর আগে তিন ফুট গভীর গর্ত খুঁড়তে হবে, ও গর্তের তলদেশে পাঁচ কিলো লবণ দিতে হবে। সেই লবণকে বালুর স্তর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এর ওপর নারিকেল চারা সোজা করে' লাগাতে হবে, ও আরও বালু দিয়ে গর্তটি ভরে' দিতে হবে। মাটির ওপরে চারাগাছের গোড়া ঘিরে বালুস্তূপ দিয়ে উঁচু করে' দিতে হবে। এই স্তুপের ওপর পাতাসার দিতে হবে। এটা ক্রমশঃ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। যদি বৃষ্টিপাত কখনও কম হয় তবে গাছের জন্যে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চারাগাছগুলিকে বৃষ্টির মত জল ছিটিয়ে সেচ দিতে হবে। এই ভাবে চারাগুলি স্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে উঠবে।

(২) গোলমরিচের চাষ: যদি গোলমরিচ নারিকেল গাছের পাশে লাগানো যায়

তবে তার জন্যে আর কোন অতিরিক্ত জমির দরকার হবে না। কেননা গোলমরিচ লতা নারিকেল গাছের গা বেয়ে উঠে যাবে। গোলমরিচ চাষে পাতা সার ও গোবর সার ছাড়া আর অন্য কোন সার দেবার দরকার পড়ে না।

(৩) কোচবিহার প্রজাতির সুপারী চাষ: ওই একই জমিতে কোচবিহার প্রজাতির সুপারী চাষ বেশ ভালভাবেই করা যেতে পারে। বৎসরে একবার বর্ষা শুরু হবার আগে গোবর সার দিতে হবে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে সুপারী গাছের শুকনো পুরোনো পাতা ছেঁটে ফেলে গাছগুলি পরিষ্কার করতে হয়।

(৪) আনারস: আনারসের খুব ভাল ফলন হতে পারে পূর্ণিয়া, কাটিহার ও মাধেপুরা জেলার সেই সব অঞ্চলে যেখানে ছয় ইঞ্চির বেশি বৃষ্টিপাত হয়। লবণাক্ত জমিতেও আনারসের ভাল ফলন হতে পারে। পূর্ণিয়াতে শিলিগুড়ি প্রজাতির আনারসের খুব ভাল ফলন হবে, আর কাটিহার ও মাধেপুরা এলাকায় বারুইপুর (কলিকাতা) প্রজাতির আনারসই বেশি উপযুক্ত।

(৫) লাল লঙ্কা ও কাঁচা লঙ্কা: অঙ্গদেশের উত্তরাংশে লাল লঙ্কা, আর দক্ষিণাংশে কালনা (বর্ধমান) প্রজাতির কাঁচা লঙ্কা ঋতুকালীন দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থকরী ফসল হিসেবে যথেষ্ট

পরিমাণে ফলানো যেতে পারে। ৰাবগী (সোবা) কাঁচা লঙ্কার চাষ দক্ষিণ অঙ্গদেশে আরও ভাল হবে। এই চাষে সরষের খোল, রেড়ীর খোল আর করঞ্জর খোল সার হিসেবে দিতে হবে। ৰীজ থেকে তেল নিঙড়ে নেবার পর যে পরিশিষ্ঠাংশ থেকে যায় তাকে খোল বলা হয়।

(৬) আঁব/আম: অঙ্গদেশের উত্তরে মালদহ জেলার ফজলী, ল্যাংড়া, আশ্বিনা, সূর্যপুরী, লক্ষ্মণ ভোগ প্রভৃতি প্রজাতির আঁব খুব ভাল জন্মাবে। যেখানে জমির অভাব আছে সেখানে এই ধরণের আঁব গাছ বড় বড় মাটির পাত্রে লাগানো যেতে পারে। এতে সার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে ২৫% জৈব গোবর সার, ২৫% পাতা-পচা সার, ২৫% হাড়গুড়ো ও ২৫% ইষ্টক চূর্ণ। হাড়গুড়োর বদলে মরা চূণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

দক্ষিণ অঙ্গদেশে আঙুর চাষ খুব ভাল হবে। বাঁকুড়া প্রজাতির কাঁটাল ও জম্মু প্রজাতির লাল জাম সেখানে খুবই ভাল জন্মাবে। দক্ষিণ অঙ্গদেশে পাহাড়ী অঞ্চলে নীচের দ্রব্যগুলি বেশ ভালভাবে উৎপাদন করা যেতে পারে- কাপড়, কার্পেট, শিশল প্রজাতির আঁশ (রামবাঁশ) থেকে মাদুর ইত্যাদি, এরণ্ড গাছের চাষ, তুঁতের চাষ ও রেশমগুটি পালন করে' তসর ও সিল্ক। এছাড়াও দক্ষিণ অঙ্গদেশে পেঁপের চাষ করা যেতে পারে আর তার থেকে প্যাপেন (পেঁপের কষ) উৎপন্ন হতে পারে।

চালের ভুষি থেকে তেল ও ধানের তুষ থেকে সিমেন্ট তৈরী হতে পারে। উত্তর অঙ্গদেশে পাটচাষ করে' পাটকাঠি থেকে দেশলাই এর কাঠি তৈরী করা যেতে পারে। আখের ছিবড়ে থেকে ও ভুট্টার বর্জিতাংশ থেকে কাগজ উৎপাদন করা যেতে পারে। অঙ্গদেশের লালমাটিতে হায়দরাবাদী আঙ্গুর, বাঁকুড়া বা আনন্দনগর প্রজাতির পেঁপে, কাজু বাদাম, বাঁকুড়া প্রজাতির কাঁটাল, জম্মু প্রজাতির লালজাম আর রাঢ়ী বোম্বাই ও রাঢ়ী মধুকলকলি প্রজাতির আঁবের বেশ ভাল ফলন করা যেতে পারে।

নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। ভারতবর্ষে নির্বাচনে টাকা আসে স্থানীয় পুঁজিপতি ও বিদেশী দালাল উভয়ের কাছ থেকে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই শোষণ রয়েছে। যারা শোষক তারা কখনও বিচার করে' না কোন্ এলাকার শ্রম উদ্বৃত্ত বা কোন্ এলাকার শ্রম ঘাটতি। ভোজপুরী এলাকা শ্রমোদৃত্ত অথচ বাংলার অংশ বিশেষ ও অসম রাজ্য ঘাটতি শ্রমের এলাকা। এই সব এলাকার সবগুলিই শোষকদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। অঙ্গ দেশ ও অসম সব চাইতে বেশি শোষিত। অঙ্গদেশে ভাগলপুর ও মুঙ্গের এই দু'টি মাত্র শহর আছে। আর এই দু'টি শহরেই বহিরাগত শোষকদের আধিপত্য রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা বা সাংবেদনিক উত্তরাধিকারের (sentimental legacy)

প্রতি এই সব বহিরাগতদের কোন সহানুভূতিই নেই। রাঁচীও বহিরাগত শোষকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, আর ওড়িষ্যার জমি ও সম্পদ বহিরাগতদের হাতেই রয়েছে।

জম্মু ও কশ্মীর

জম্মু ও কশ্মীরের তিনটি অংশ আছে: (১) জম্মু, (২) কশ্মীর ও (৩) লাদাখ। সংস্কৃতে জম্মুকে দ্বিগর্তভূমি বলা হয়। এখানে কোন উপত্যকা নেই। আছে শুধু পাহাড় ও মালভূমি। মালভূমিতে আউশ ধান হতে পারে, আর নীচু এলাকায় আমন ধান হতে পারে। পাহাড়ী অঞ্চলে ধাপে ধাপে ভুট্টা জন্মানো যেতে পারে। এখানকার জলবায়ু পশুপালনের বিশেষ করে' গুজরাট প্রজাতির মহিষ পালনের পক্ষে খুবই ভাল। এখানকার মাটি রেপসিড ও সরষে চাষের উপযুক্ত। এখানে আউশ বা আমন ধান জন্মালেও বোরো ধান হবে না। ওষুধের গাছ–গাছড়ার চাষ এখানে করা যেতে পারে। এই সমস্ত অঞ্চল জুড়ে কৃষিসহায়ক শিল্প স্থাপন করা উচিত। জম্মুর একটি জেলা কাঠুয়া শিবালিক পাহাড়ে অবস্থিত। এখানকার মাটি তৈলবীজ চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। অনেকদিন আগে যখন রামায়ণ মহাকাব্য লেখা হচ্ছিল তখন এই অঞ্চল কাষ্ঠক নামে পরিচিত ছিল। কাষ্ঠ মানে কাঠ, আর যে হেতু এই অঞ্চল কাঠের জন্যে বিখ্যাত ছিল তাই এই

দেশ "কাষ্ঠক" নামে অভিহিত হত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্যে এখানে চিনেবাদাম ও ধান (বিশেষ প্রজাতির) উৎপাদন করা যেতে পারে। চিনেবাদামের খোলা থেকে অমসৃণ জাতীয় কাগজ তৈরী হতে পারে।

জম্মুতে কফি (coffee) ও কশ্মীরে চা উৎপাদন করা যেতে পারে। জম্মুর উঁচু অঞ্চলে মটর (peas) ও অড়হর ডালের চাষ হতে পারে। নীচু জমিতে ছোলা (Bengal gram) ও মাসকলাই ফলানো যেতে পারে। পায়রা ফসল হিসেবে গমের সঙ্গে মুসুর ডালের (lentil pulse) চাষ করা যেতে পারে। সুগার বীট জম্মুর উঁচু অংশে চাষ করা যেতে পারে, আর ডোডাতে তার বীজ উৎপন্ন করা যেতে পারে। কিন্তু সেচ ব্যবস্থাই মূল সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে ছোট ছোট নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা, ও লিফ্ট্ পাম্পিং-এর সাহায্যে। উপর হিমালয়ের উপত্যকা ও পাহাড় নিয়ে কশ্মীর রাজ্যের অবস্থান। বরমূলা জেলার কিছু অংশ উপত্যকা ও কিছু অংশ বরফে আচ্ছাদিত থাকে। কশ্মীরে শরৎকালে ও শীতের প্রাক্কালে চাষ করা যেতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্যে এই জমি গম ফলানোর উপযুক্ত নয়।

কশ্মীরের জনগণ ভূমধ্যসাগরীয় বর্গের আর্য-জাতি। কশ্মীরের আদি অধিবাসীদের কশ্ (বা খশ্) বলা হত যাদের নাম অনুযায়ী এই অঞ্চলটির নাম হয়েছে কশ্মীর। উজবেকী

ও তাজাকী ভাষার মত কাশ্মীরী ভাষা এসেছে পাশ্চাত্য প্রাকৃত ভাষা থেকে।

লাদাখী ভাষা পাশ্চাত্য প্রাকৃতের টিবেটান গ্রুপের অন্তর্গত। লাদাখের মাঝারী সম্প্রদায় উর্দু জানে, আর উচ্চবর্ণের লোকেরা ইংরেজী জানে। প্রচলিত লিপি তিব্বতীয়। পূর্ব-দক্ষিণ লাদাখে মহাযানী বৌদ্ধদের বাস। লাদাখের সব চাইতে বড় শহর কার্গিল। লাদাখ তুষার-মরু, আর সাহারা উষ্ণ-মরু। লাদাখের উত্তর- পশ্চিমের অধিবাসীরা উর্দু জানে না। বালুচিস্তানের অধিকাংশ লোক উর্দু বলে না। কশ্মীরের বরমূলা থেকে অনন্তনাগ জেলা পর্যন্ত প্রচলিত কথ্য ভাষা হচ্ছে কাশ্মীরি।

শিয়া মুসলমানেরা লাদাখের উত্তর-পশ্চিম অংশে বাস করে' ও তারা উর্দু মেশানো লাদাখী ভাষায় কথা বলে। কাশ্মীরি ভাষা চলে মুজঃফরাবাদ, বরমূলা, অনন্তনাগ, শ্রীনগর ও ডোডাতে। মুজঃফরাবাদের ভাষা কাশ্মীরি ভাষা ও পশ্চিম পঞ্জাবের কথ্য ভাষার সংমিশ্রণ। ডোডার দক্ষিণাংশের লোকেরা ডোগরী ভাষায় কথা বলে। উত্তরের লোকেরা বলে ভদ্রবাই ভাষা। ৫৫০ বৎসর আগে কশ্মীরের লোকেরা হিন্দু ছিল। কিন্তু রাণী দিদ্দার রাজনৈতিক চাপে (ও ভুলে) লোকেরা মুসলমান হয়ে যায়। এই অঞ্চলের বর্ণময় ইতিহাস আছে, আর আছে মহৎ সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্ভাবনা।

জুন ১৯৭৯, কলিকাতা

অর্থনৈতিক মন্দা

তোমরা জান অর্থনৈতিক জগতে মোদ্দা কথা হচ্ছে দু'টো। একটা হচ্ছে মুদ্রাকে বহতা রাখতে হবে; টাকাকে যতটুকু সময় অচল অবস্থায় রাখছ অর্থাৎ তার ক্রয়ক্ষমতাকে যতটুকু সময়ের জন্যে কাজে লাগাচ্ছ না, বুঝতে হবে ততক্ষণ তুমি আর্থিক জগতের ক্ষতি করে' চলেছ। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে টাকা প্রত্যক্ষভাবে ও টাকার সুদ অপ্রত্যক্ষভাবে ধনকেন্দ্রিক বৈষম্য ডেকে আনতে পারে যদি তা সন্তুলিত ভারসাম্যের একক হবার যোগ্যতা হারায়। আর্থিক জগতের এই মূল দু'টি কথা আংশিকভাবে বিস্মৃত হলে বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা (economic depre- ssion) দেখা দেবে। যে সকল রাষ্ট্র বা অর্থনৈতিক প্রকোষ্ঠ নিজের আর্থিক মানকে ঠিক অবস্থায় রেখেছে সেও যদি অন্য দেশের সঙ্গে বিত্তমান সংক্রান্ত আদান– প্রদানে রত থাকে তবে তাকেও পূর্ণভাবে না হোক আংশিকভাবে এই অর্থনৈতিক মন্দার অংশভাক্ হতে হবে। কেউ যদি অন্যান্য দিক দিয়ে ঠিক আছে কিন্তু অন্য কোন অর্থনৈতিক মন্দাক্লিষ্ট দেশের সঙ্গে সম্পর্কও না রাখে, কিন্তু নিজের অভ্যন্তরীণ

সম্পদকে কোন অন্–আয়সূচক (non-yielding nature) লগ্নীতে বা ব্যয়েতে রত থাকে– যেমন অতিরিক্ত মাত্রায় সামরিক খাতে খরচ.... অতিরিক্ত মাত্রায় অট্টালিকা নির্মাণ, আমোদ ও ভোগসূচক ব্যয় এই সকল ব্যয়ের বিনিময়ে কোন আয় নেই এ অবস্থায় ওই সকল দেশকেও অর্থনৈতিক মন্দার অংশভাগী হতে হবে। তবে কোন দেশ যদি অর্থনৈতিক লগ্নী সংক্রান্ত কোন লেনদেন প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে না করে', কেবল বিনিময় প্রথায় (barter trade) বাণিজ্য করে' থাকে তবে তাকে এই অর্থনৈতিক মন্দায় বড় একটা ভুগতে হবে না। কেবল এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতি আর্থিক বছরের অন্ত মুহূর্তে লেনদেনের অসাম্যঘটিত অত্যল্প মাত্রায় অর্থনৈতিক মন্দা ঘটে থাকে যা সহজে অনুভূত হয় না। এই ধরনের মন্দা তিন বছরে খুব অল্প মাত্রায় অনুভূত হয় আর ত্রিশ বছরে আরও একটু বেশী মাত্রায় অনুভূত হয় ও সাড়ে তিনশ' বছরে আরও বেশী মাত্রায় অনুভূত হয়।

২০ ডিসেম্বর ১৯৮৭, কলিকাতা

(শব্দচয়নিকা পঞ্চদশ খণ্ড প্রবচন ১০৯)

ভূমিক্ষয় ও বনসর্জন

তোমরা ভূমিক্ষয় বা [soil] erosion জান তো রাঢ় বাংলায় যাকে বলে 'খোয়াই'। জমির ওপর প্রবল বর্ষণ হয়ে চলেছে .... জলের সঙ্গে মাটিও মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটে চলেছে। একটা বৃষ্টি চলে যায় ভূমির একটা স্তরও চলে যায়...... সেই হিসেবে উর্বরতাও ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে। প্রাচীনকালে পৃথিবীতে অনেক অরণ্য ছিল, ছিল ঘন সন্নিবিষ্ঠ অরণ্যানী। অরণ্য যেমন একদিকে দূর আকাশের মেঘকে কাছে টেনে আনত, ও বৃষ্টিপাত ঘটাত, অন্যদিকে তেমনি তা শিকড়ের দ্বারা মাটিকে আটকে রেখে ভূমিক্ষয়ের প্রতিরোধ ঘটাত। শিকড়ের মধ্যবর্তী স্থানের মাটিকে অধিকাংশ গাছই, বিশেষরূপে গুচ্ছমূল গাছেরা, আঁকড়ে ধরে' রেখে জলকেও নিজের গোড়ায় সঞ্চয় করে' রাখত। শীতে– গ্রীষ্মে বা টানের সময়ে নদীর জলের স্তর নেবে গেলে নিজেদের সঞ্চিত জল ধীরে ধীরে ছেড়ে দিয়ে নদীকে বহতা ও নাব্য রাখত। বেপরোয়াভাবে অরণ্যোচ্ছেদের ফলে আরণ্য গাছ সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ও এই বেপরোবাহ অরণ্য ধ্বংস বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে বৃষ্টিপাত যাবে কমে, বন্যা যাবে বেড়ে ও ধীরে ধীরে সবুজ শ্যামল জনপদ পরিণত হবে

ঊষর মরুভূমিতে, যেমনটি হয়েছে রাজস্থানের দক্ষিণ–পূর্বাংশে। মানুষকে আজ সংযত হতে হবে, কোনভাবেই কোন কিছুকে আর যথেচ্ছভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না।

অরণ্য–ধ্বংসের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানবেরও বিনাশেরই বীজ একথা আমরা যেন সব সময়ই মনে রাখি। এখন আর deforestation নয়, এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত afforestation |

২০ ডিসেম্বর ১৯৮৭, কলিকাতা

(শব্দচয়নিকা পঞ্চদশ খণ্ড প্রবচন ১০৯)

আদর্শ নেতৃত্ব

'গজতা' শব্দের অর্থ হ'ল হস্তীযূথ। তোমরা অনেকেই জান পৃথিবীর জীবসমূহ সমাজগতভাবে দু'টি ভাগে বিভক্ত– এককচারী জীব ও যূথবদ্ধ জীব। যেমন ধর আমাদের অতি পরিচিত ছাগল, মুর্গী। এরা এককচারী জীব। নিজের স্বার্থেই ব্যস্ত..... একেবারেই self centered. এরা সাধারণতঃ একে অপরের কোন কাজে লাগে না। একে অপরের বিপদে ছুটে

সূচীপত্র

এসে রুখে দাঁড়ায় না। এরা প্রভুভক্ত বা নিষ্ঠাবান–ও (sincere) নয়। এরা প্রভুর দুঃখে তিলমাত্র বিচলিত হয় না। যেখানে থাকে... থাকে নিজের স্বার্থে। কিন্তু ভেড়া যূথবদ্ধ জীব। দু'জায়গায় দাঁড়িয়ে দু'টো ভেড়া ঘাস খাচ্ছে। একে অন্যকে দেখতে পেলে ছুটে তারা কাছে চলে আসে। পাশাপাশি থেকে ঘাস খেতে থাকবে। এক সঙ্গে থাকার দরুণ ভেড়ার পালের গতিকে বলা হয় 'গড্ডালিকা–প্রবাহ'।

"ঐসী গতী সংসার কী সব গড়ার কী ঠাট্
এক জব্ গাঢ় মেগীরে সব জাত তেহি বাট।"

পৃথিবীর মানুষের ধারা কতকটা এই রকমের একপাল ভেড়ার মত। একটা ভেড়া গর্ত্তে পড়লে বাকি সবাই সেই গর্ত্তেই পড়ে। মানুষও একটি যূথবদ্ধ জীব। বেশীদিন একলা থাকতে হলে সে ছটফট্ করতে থাকে। তার প্রাণ–মন মানুষের খোঁজে হাঁকুপাঁকু করে'। এজন্যে মানুষের সমাজে নেতা নির্বাচনে বড় বেশী সতর্ক হতে হয়। পৃথিবীর অনেক দেশের ইতিহাসে দেখা যায় দানব–স্বভাবের কোন কোন বুদ্ধিমান নেতা গোটা সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে, অনেক জনগোষ্ঠী তাতে ধ্বংস হয়ে গেছে, অনেকে ধ্বংস হবার শেষ সীমায় এসে কোনক্রমে টাল সামলে নিয়েছে। কেউ কেউ personal cult বা ব্যষ্টিপূজার নিন্দায় পঞ্চমুখ। তাদের

বোঝা উচিত যে personal cult বা ব্যষ্টিপূজা চলে এসেছে ও চলবেও। তাই বলছিলুম যে, নেতা নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হবে। এ ব্যাপারে কমিউনিষ্ট, ক্যাপিট্যালিষ্ট, সোস্যালিষ্টে কোন ভেদ নেই। সবাই এক রঙে রাঙা। নেতা চিনতে হবে তাঁর বিদ্বত্তা, বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়তা, অগ্রগামিতা, ত্যাগ স্বীকারে সদাপ্রাস্তুত্য ইত্যাদি গুণ দেখে। বাঘ যূথবদ্ধ জীব না হলেও সিংহ–হাতী যূথবদ্ধ জীব। হাতীর দলে অনেক সময় পঁচিশ–তিরিশ থেকে পঞ্চাশ–একশ'টা হাতীও থাকে। অল্পবুদ্ধি, ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক আফ্রিকান হাতী যূথৰদ্ধ, আবার তুলনামূলক বিচারে অধিকবুদ্ধি বৃহৎমস্তিষ্ক ভারতীয় প্রজাতির হাতিও যূথৰদ্ধ। ভারতের পূর্ব প্রত্যন্তে মধ্যমাকৃতির পাংশুবর্ণ হাতী কিছুটা কম যূথবদ্ধ। তবে বিপদে–আপদে তারা সবাই একত্রিত হয়ে থাকে। এই এক একটি হস্তীযূথ বা একসঙ্গে থাকা প্রকাণ্ড একদল হাতীকে 'গজতা' বলা হয়। হাতী ধরবার জন্যে প্রাচীনকাল থেকে যে খেদা–ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাও সাধারণতঃ হাতীর যূথৰদ্ধতার কথা ভেবে।

৬ মার্চ ১৯৮৮, কলিকাতা

(শব্দচয়নিকা পঞ্চদশ খণ্ড– প্রবচন ৩১৫)

*   *   *   *   *

সূচীপত্র

'গজেন্দ্র' শব্দের আরেকটি অর্থ হ'ল হাতীদের সর্দার। এর আগে অনেকবারই বলেছি হাতী যূথৰদ্ধ জীব। যূথের দৃঢ়তা নির্ভর করে' দৃঢ়চেতা নেতার ওপরে। অন্যথায় তার সংরচনা জীর্ণ–দীর্ণ হয়ে যায়...... ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আকবরের দৃঢ়তায় মোগল সাম্রাজ্য ভারতে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্তের দৃঢ়তায় এককালে গুপ্ত সাম্রাজ্য হিমাচল থেকে গোদাবরী পর্যন্ত দৃঢ়নিৰদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সেই দৃঢ়চেতা নেতার অভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মগধ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছল। আকবর গতায়ু হবার পর তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতে পড়ে মোগল সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছল, ও শেষ পর্যন্ত মারাঠা–শিখ শক্তির অভ্যুদয়ে, পাণিপথের শেষ যুদ্ধে তথা সীতাবলদীর যুদ্ধে মোগল সাম্রাজ্যের অস্থি–পঞ্জরও ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছল।

বর্তমানে মানুষ শাসনতন্ত্রের যে কয়টি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে তাদের মধ্যে গণতন্ত্র তুলনামূলক বিচারে ভাল হলেও গণতান্ত্রিক সংরচনায় দৃঢ় নেতা পাওয়ার সুযোগ একনায়কত্ব শাসিত রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম। যার ফলে যুদ্ধ বিগ্রহেই হোক, বা সামাজিক–অর্থনৈতিক মানোন্নয়নেই হোক, অথবা অন্য কোন ভৌমিক দৃঢ়ভিত্তিক অগ্রগতিতেই হোক, সবেতেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একটু দুর্বল হয়েই থাকে, যদিও একনায়কত্বর তুলনায় গণতন্ত্র অনেকটা দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাতে খেয়াল–খুশীর

তুলনায় যুক্তির স্থান কিছুটা বেশী থাকে। তা সত্ত্বেও একনায়কত্ব রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সংৰদ্ধতা এনে দেয় গণতন্ত্র তা পারে না। হয়তো বা মানুষ ততটা চায়ওনা। একনায়কত্ববাদে ব্যষ্টির খেয়াল-খুশীতে অনেক সময় জনসাধারণকে হয়রাণ হতে হয়.......কিন্তু গণতন্ত্রে পার্টির খেয়াল-খুশীতে তথা পার্টির ক্যাডারদের তথা পার্টির চ্যালা-চামুণ্ডাদের অত্যাচারেও জেরবার হয়ে যেতে হয়...... শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের নেস্তনাবুদ হতে হয়। তোমরা ঠাণ্ডা মাথায় জিনিসটা ভেবে দেখ। ব্যষ্টি-একনায়কত্ব জিনিসটাকে যদিও সম্পূর্ণভাবে সমর্থন না করা যায় তাইলে পার্টি- একনায়ত্বকেই বা কোন যুক্তিতে সমর্থন করব। সে তো ব্যষ্টি-একনায়কত্বের চেয়েও আরেক কাঠি সরেস। অনেক সময় পার্টি-একনায়কত্বে অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত, অমার্জিত ক্যাডারদের উৎপাতে শিক্ষিত, মার্জিত রুচি মানুষদের ত্রাহি ত্রাহি করতে হয়। সেই রকম অবস্থায় পড়ে তারা অনেক সময় একনায়কত্বের অবসান চায়। কখনো কখনো বা বৈদেশিক রাষ্ট্রের শরণাপন্ন হয়ে দয়নীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে চায়, হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চায়। জিনিসটা কঠোর হলেও সত্যি নয় কি? এই একনায়কত্ব, পার্টিএকনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের টানাপোড়েনের একমাত্র সমাধান প্রাউটের সদ্বিপ্র-সূত্র।

যাই হোক মোদ্দা কথায় ফিরে আসা যাক। হাতীর সমাজ দৃঢ়নিৰদ্ধ... দৃঢ়ভাবে সংৰদ্ধ। তাই প্রতিটি হস্তীযূথেই একটি করে' উন্নত মানের সর্দার থাকে। 'গজেন্দ্র' মানে সেই হাতীর সর্দার।

২৭ মার্চ ১৯৮৮, কলিকাতা

(শব্দচয়নিকা ষোড়শ খণ্ড প্রবচন ১১৮)

উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রাচীন পৃথিবীতে রাষ্ট্রিক ও বৈবসায়িক লেনদেনে প্রচলিত ছিল স্বর্ণমান। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই বিত্তমান (bullion) ছিল স্বর্ণের। তবে কোন কোন দেশে রৌপ্যও ছিল। যে সকল দেশে স্বর্ণমান ছিল তারা কেউ কেউ রৌপ্য বিত্তমানকে স্বীকৃতি দিত, কেউ বা দিত না। স্বর্ণমানের দেশ রৌপ্য-মানকে স্বীকৃতি না দিলে বিত্তমানগত তারতম্যের দরুণ মুদ্রাগত লেনদেন সম্ভব ছিল না। তাই সেই সকল দেশের মধ্যে বিনিময় বাণিজ্য (barter trade) চলত।

"কুরঙ্গ বদলে লবঙ্গ নিব, কুমকুম বদলে চুয়া,
গাছফল বদলে জাইফল পাব, বহেড়ার বদলে গুবা।"

সূচীপত্র

ৰাংলার সঙ্গে সিংহল বা শ্রীলংকার, সুবর্ণদ্বীপ বা বার্মার লেনদেন বিনিময় প্রথা বা অদলবদল প্রথায় (barter trade) চলত। বাংলার গ্রামজীবনের অধিকাংশ কেনাবেচা বিনিময় প্রথায় চলত–অল্পস্বল্প হত মুদ্রার মাধ্যমে। গ্রামের কৃষিজীবীরা কৃষিপণ্যের বিনিময়ে বৃত্তিজীবীদের কাছ থেকে পণ্য নিতেন। আজ থেকে ১৫০ বছর আগেও রাঢ়ের বীরভূম জেলায় মুদ্রা বিনিময় একরকম ছিল না বললেই চলে। চাষী চালের বিনিময়ে আঁৰ কিনত, পিদিম কিনত, পিলসুজ কিনত, ধুতি–শাড়ি কিনত। ছুতোর কাঠের বিনিময়ে বা চিঁড়ের বিনিময়ে বঁটি–কাটারি কিনত। বীরভূমের গ্রাম্য মানুষ এই প্রথাকে বলত অদল–বদল প্রথা।

যেখানে বিত্তমানগত তারতম্য ছিল সেখানে স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রায় কেনাবেচা চলত না। সেকালে রাজশক্তি কিছু স্বর্ণমুদ্রা (সীনক), কিছু রৌপ্যমুদ্রা (টংক) বুলিয়ান হিসেবে রাজকোষে রাখতেন। কিছু জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন সরকারী উন্নয়নমূলক কর্ম ও কর্মচারীদের বেতনের মাধ্যমে। রাজশক্তি যেখানে এই মুদ্রা প্রস্তুত করতেন তাকে বলা হত 'টঙ্ক শালা', বাংলায় বলা হয় টাঁকশাল...... ইংরেজীতে mint; এই 'টঙ্ক' শব্দ থেকে 'তঙ্ক', 'তঙ্কা', 'তনখা' প্রভৃতি শব্দগুলি এসেছে। উত্তর ভারতে এখনও বেতন অথবা পেন্সন অর্থে

'তথা' শব্দের ব্যবহার রয়েছে। শুভঙ্করীতেও (প্রবক্তা: শুভঙ্কর দাশ, বাঁকুড়ার রাঢ়ী কায়স্থ) রয়েছে–

"মন প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর....."

যাই হোক রাজশক্তি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যে যে পরিমাণ রজতমুদ্রা বাজারে ছাড়তেন তাকে বলা হত 'গণটঙ্ক'। মনে রেখো এই 'টঙ্ক' শব্দ থেকেই 'টঙ্কা' বা 'টাকা' শব্দও এসেছে। তোমরা 'টঙ্ক' বলতে গিয়ে ভুল করে' যেন 'টঙ্গ' বলে ফেলো না। 'টঙ্গ' শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে পায়ের নিম্নাংশ, উর্দুতে যাকে 'টাঙ্গ' বলা হয়। সংস্কৃতে পৃষি দীর্ঘ করে' টাঙ্গ শব্দটিও চলতে পারে। এই 'টাঙ্গ' শব্দটি থেকে 'টেংড়ি', 'ঠ্যাঙ' প্রভৃতি শব্দ এসেছে। একটি ঘোড়ায় টানা গাড়ীকে ফার্সীতে বলা হয় 'ইক্কা' অর্থাৎ যা একে তৈরী একক বা unit। 'টাঙ্গা' শব্দ সেই অর্থেই চলে। ফার্সী 'ইক্কা' ও সংস্কৃত 'টাঙ্গ' দু'য়ের মিশ্রণে বাংলায় একক অর্থে টেক্কার বদলে 'ইক্কা' শব্দটি অনায়াসে চলতে পারে। এক ঘোড়ার গাড়িকে এই সেদিন পর্যন্ত 'এক্কা' গাড়ী বলা হত। এক্ষেত্রে অবশ্য 'টেক্কা' গাড়ী শব্দ চলবে না। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতায় আছে–

"বেঘোরে বেহারে চড়িনু এক্কা"। সেকালের ঘোড়ায় টানা গাড়ীর ওপরে ছাউনি (ছই বা টপ্পর) থাকলে তাকেও 'টঙ্গা'

বলা হত। উত্তর ভারতে আজও তা বলা হয়। 'টঙ্গা' শব্দটিও সংস্কৃত 'টঙ্গ' শব্দ থেকে এসেছে। যাই হোক, 'গণটঙ্ক' শব্দের অর্থ সাধারণের ব্যবহার্য রজতমুদ্রা।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি, যদিও মূর্তিশিল্প, মন্দির শিল্পগুলিতে সূক্ষ্মত্বের নানা নিদর্শন থাকে যার দ্বারা মানব মনের সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতে সর্বত্র বিশেষ করে' দক্ষিণ ভারতে ও ওড়িষ্যায় – অনেক রাজাই গণটঙ্ক বা গণসীনক উন্নয়নমূলক কাজে বা জনসেবায় খরচ না করে' মন্দির তৈরীতে ব্যয় করতেন। শোণা যায় প্রাচীন উৎকলের চার বৎসরের রাজস্ব বাবদ আয়ের এক কণাও জনসেবায় ব্যয়িত হয়নি। সবটাই খরচ করা হয়েছিল কোণার্কের মন্দির নির্মাণে। কোণার্ক মন্দির স্থাপত্যশিল্পের অনবদ্য নিদর্শন, কিন্তু ওড়িষ্যার দরিদ্র মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ওই মন্দির নির্মাণ করা কতটা সঙ্গত কাজ হয়েছিল আজকের ওড়িষ্যার শিক্ষিত তরুণেরা তার চুলচেরা বিচার করে' দেখবে বলেই আশা রাখি।

গণসীনক বা গণটঙ্ক সাধারণ সরকারী কাজকর্ম ও সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাদে যতটা বেশী উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা যায় ততই ভাল। তাতে জনসাধারণের সেবা বেশী হবে, উন্নয়নও তাতে বেশী হবে ও মুদ্রার ঘূর্ণায়মানতার দরুণ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তাতে বেড়ে যাবে। রাজকর্মচারীদের

গ্রাসাচ্ছাদনের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে, কিন্তু জনসেবা বাবদ যে অর্থ ব্যয় তা অতি প্রয়োজনীয় বলে তাকে কর্তন করে' সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি সমর্থন করা যায় না। কারণ উন্নয়নমূলক কার্যে যত অধিক অর্থ ব্যয় করা হয় প্রকারান্তরে তার মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের উন্নতিই হবে, কিন্তু উন্নয়নমূলক কাজ না করে' সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করলে বাজারে নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ফলে অধিক বেতন পেয়েও সাধারণতঃ সরকারী কর্মচারীদের কোন লাভ হবে না। কোন দ্রব্যের আজ বাজার দর যদি হয় ৫ টাকা কেজি, সরকারী কর্মচারীদের স্বচ্ছন্দে রাখবার জন্যে তাদের বেতন যদি দ্বিগুণিত করে' দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতাও কি সেইজন্যে দ্বিগুণ পরিমাণ হয়ে যাবে? বেশী টাকা বাজারে নিয়ে গেলেও সরকারী কর্মচারীরা সেখানে গিয়ে দেখবে ভষ্মে ঘি ঢালার সামিল হচ্ছে। বাজার চড়ে হয়েছে আকাশ–ছোঁয়া। মুদ্রাস্ফীতি দেশকে আরও চরম ভাবে গ্রাস করবে। তাই উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে' অন্য কোন খাতে ব্যয় বাড়ালে অর্থনৈতিক বিচারে তা আত্মহত্যার সামিল হবে। উন্নয়নমূলক কার্যের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়লে কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি না করিয়েও ক্রয়ক্ষমতা বাড়তে থাকবে। আর এই ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী নির্বিশেষে সকলেরই লাভ।

সূচীপত্র

বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক বিচারে উন্নয়নমূলক কার্য বলতে সেই কাজকেই বোঝায় যা প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ বৃদ্ধি করে, অপ্রত্যক্ষভাবে সম্পদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যা প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ বৃদ্ধি করে না, অপ্রত্যক্ষভাবে সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজন–পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত তাকে উন্নয়নমূলক কাজ বলে গণ্য করা যাবে না।

যাই হোক, আমাদের মত আদার ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজের খবর না রাখাই ভাল। তোমরা 'গণটঙ্ক' শব্দের মানেটা কেবল বুঝে নাও।

১৭ এপ্রিল ১৯৮৮, কলিকাতা

(শব্দচয়নিকা ষোড়শ পর্ব– প্রবচন ১২১)

গণহনন

'গণহনন' শব্দটির অর্থ হ'ল এক সঙ্গে অনেক মানুষকে হত্যা করা (mass murder or massacre)। যদি একসঙ্গে অনেক অপরাধীকে হত্যা করা হয় তাকেও 'গণহনন' বলা হয়। কারণ বিশুষ্ক সৈদ্ধান্তিক বিচারে কে অপরাধী, কে নিরপরাধ তা যাচাই করে' দেখা এক দুরূহ ব্যাপার। অনেক

সময় কাগজে–কলমে দলিল–দস্তাবেজে ভুল তথ্য থেকে যায় যার ফলে নিরীহ মানুষের ওপর নেবে আসে কঠোর দণ্ডব্যবস্থার খড়্গাঘাত। অনেক সময় বিচারকের বিচারেও ভ্রান্তি– দোষ থাকতে পারে বা থাকেও, সেক্ষেত্রে নিরপরাধকে হত্যা করা হয়। অনেক সময় বিচারের নামে প্রহসন ঘটিয়ে নির্দোষকে বা অল্প দোষীকে হত্যা করা হয়। সেগুলো কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। সক্রেটিসকে হত্যা করা সমর্থন করা যায় না, মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডও সমর্থন করা যায় না। সিরাজ–উদ্–ওলার হত্যাও বিবেক বুদ্ধিসম্মত নয়, আবার তার ওপরে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল প্রাণদণ্ড জিনিসটাই সমর্থনযোগ্য নয়। যে মানুষ অন্যকে হত্যা করেছে সে বিধাতার বিধানের বাইরে গেছে। শুধু মানুষকে নয়, নির্দোষ পশুকেও যে হত্যা করেছে সেও বিধাতার বিধানের বাইরে গেছে, ও তাই তার কার্য কোন ক্রমে সমর্থনযোগ্য নয়। আর বিচারের নাম করে' যে অন্যকে হত্যা করছে তার কার্য অধিকতর নিন্দনীয়। তাই প্রাণদণ্ড সমর্থন করা যায় না। তবে পাপী বুক ফুলিয়ে রাজপথে ঘুরে বেড়াবে আর হত্যালীলা চালিয়ে যাবে এটাও সমর্থন করা যায় না। তাই হত্যাকারীদের মানবতাসম্মত এমন কোন বিধানের ভেতর আসতে হবে যাতে তার সেই জিঘাংসা স্থায়ীভাবেই প্রতিহত হয়... চিরতরে সংবারিত হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যে শক্তিশালী, যে রণজ্ঞয়ী সেই থাকে বিচারকের ভূমিকায়....... যেন সে গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতা, আর যে পরাভূত সে যদি নিরীহ নিষ্পাপ মানুষও হয়, তাকে বলা হয় সমাজদ্রোহী। গত মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তি (allied forces অর্থাৎ আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া) জয়ী হয়েছিল....পরাভূত হয়েছিল অক্ষশক্তি (axis powers অর্থাৎ জার্মানী, ইতালিয়া, জাপান প্রভৃতি)। কে কতটা দোষী সে বিচার না করেও বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলুম রণজ্ঞয়ী মিত্রশক্তি নেবেছিল বিচারকের ভূমিকায়। ইত্যালির সিনর বেনিতো মুসোলিনীকে অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, জার্মানীর হের এ্যাডলফ হিটলারকে পেট্রোলে পুড়ে মরতে হয়েছিল, জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। শোনা যায় যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুর খোঁজাখুঁজি চলছিল। যে আর্ন্তজাতিক আদালত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছিল তাদের অন্যতম ছিলেন বাঙলার বিচারক রাধাবিনোদ পাল। তিনি এই ভাবে যুদ্ধবাজ অপবাদ দিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করেননি। যাই হোক, এক সঙ্গে অনেক মানুষকে যদি হত্যা করা হয়, তা যাকে হত্যা করা হচ্ছে সে যুদ্ধবাজ হোক বা না হোক, তথাকথিত অপরাধী হোক বা না হোক, যে কোন ধরনের লোককেই

যদি হত্যা করা হয় আর তা যদি করা হয় এক সঙ্গে অনেককে, তবে তাকে বলা হবে 'গণহনন'।

এ্যাটম বোমের দ্বারা মিত্রশক্তি যে হিরোসিমা, নাগাসাকিতে সম্পূর্ণভাবে নিরীহ নির্দোষ লক্ষ লক্ষ বৃদ্ধ, শিশু, নারী, শান্তিপ্রিয় তরুণ–তরুণীকে গণহননের যূপকাষ্ঠে ফেলে দিয়েছিল, অগ্নির দহনজ্বালায় বিষবাষ্পে ফুসফুসের স্পন্দনকে স্তব্ধ করে' দিয়েছিল, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে বিষপ্রবাহে বক্রিল করে' বিকলাঙ্গ করে' দিয়েছিল, সেটা কি মানবতাসম্মত কাজ হয়েছিল? তবে তারা কোন্ অধিকারে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর বিচার করার স্পর্দ্ধা দেখিয়েছিল এই প্রশ্ন বিদগ্ধ ও বিচারবাদী মানুষের মনে চিরকালই উঁকি–ঝুঁকি মারতে থাকবে। বড় বড় বুলির আড়ালে শান্তির শাদা পায়রা উড়িয়ে এই মসীলিপ্ত ইতিহাসকে কিছুতেই ঢাকা যাবে না।

আমি একজন প্রধানমন্ত্রীকে জানতুম যিনি মানবতাবাদ ও অহিংসা তত্ত্বকে হুজুগের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এমন বেশ কিছু রাষ্ট্রনায়কের খবরও রাখি, ও আরও অনেকে রাখেন যাঁরা মুখে শান্তির বাণী আউড়ান.....হয়ত বা শাদা পায়রাও ওড়ান কিন্তু তলে তলে সমরাস্ত্রে শান দিয়ে চলেন..... হাতে ফুলের মালা, আস্তিনে লুকোনো ছুরি নীতি হ'ল preach the gospels of peace, but keep your powders dry. প্রচার করে' যাও শান্তির ললিত বাণী কিন্তু কামানে

ভরবার জন্যে বারুদ শুকনো রাখো। মানবতার দরদে এঁদের প্রাণ বিগলিত, ভাষণের উচ্ছ্বাসে এঁদের দু'চোখ বেয়ে নেবে আসে গঙ্গোত্তরীর জলধারা, কিন্তু উদরে গজগজ করে' নিরীহ মুর্গীর কাতরোক্তিকে উপেক্ষা করে', তাকে হত্যা করে' মশল্লা সহযোগে পাক করা মুর্গ–মশল্লম্। তাদের মুখে শান্তির ললিত বাণী শোভা পায় না। তাঁরা শ্লোগান দিন "মুর্গমশল্লম্ কী জয়".... "বকরে কে পসীন্দে কী জয়"।

১লা মে ১৯৮৮, কলিকাতা

(শব্দচয়নিকা ষোড়শ পর্ব– প্রবচন ১২৩)

সামন্ততন্ত্র ও জমিদারী প্রথা

তোমরা যারা জমির খাজনা সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা নিয়ে পড়াশোণা করেছ তারা জান যে ভারতে পাঠান, মোগল, প্রাক্–বৌদ্ধ ও বৌদ্ধযুগে রাজাকে খাজনা দেওয়া হত সোণার বিনিময়ে। দশ–বিশটা গ্রামকে একত্র করে' এক একটা revenue village বা মৌজা তৈরী হত আর গ্রামবাসীদের মধ্যে একজনকে ক্ষমতা দেওয়া হত খাজনা সংগ্রহের। এই খাজনা বা কর আদায়কারীদের সরকার কোন পয়সাকড়ি দিত না,

জমি দিত যা চাষ করে' তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা কৃষিক্ষেত্রে রাজা ও জনসাধারণের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী (intermediaries) রূপে কাজ করত, আর ধীরে ধীরে এরাই শক্তিশালী জমিদারে পরিণত হ'ল। প্রাচীনকাল থেকেই এই মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব ছিল। এদের বলা হত জমিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, সেপত্তনিদার, জোতদার, বর্গাদার ও অধিকারী। অবশ্য প্রাউট এই প্রথাকে সমর্থন করে' না।

অতীতে শক্তিশালী রাজার অধীনে থাকতেন অনেক ছোট রাজা। এই দুই ধরনের রাজাই নিজস্ব সৈন্যদল ও মিলিশিয়া রাখতেন যদিও মধ্যস্বত্বভোগীদের সেই অধিকার ছিল না। বর্তমানে অসম রাইফেলস ও রাজপুত রেজিমেন্ট মিলিটারীরই অঙ্গ। তাই তাদের আর মিলিশিয়া বলে গণ্য করা হয় না। মিলিশিয়া মানে অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয় এমন স্থানিকবাহিনী বা নিজস্ব সৈন্যদল। এই মিলিশিয়া পরিচালনা করার জন্যে চাই ক্ষমতা ও দাপট, আর যার সেই গুণ থাকত তাদের বলা হত মিলিটান্ট বা সামরিক ক্ষমতাসম্পন্ন। যদি ছোট রাজা অন্য ক্ষমতাশালী রাজাকে কর প্রদান সহ সব ব্যাপারেই মেনে চলত, তখন বলা হত, তারা সেই রাজার supremacy বা প্রভুত্ব স্বীকার করে' নিয়েছে। অবশ্য "supremacy" আর "suzerainty" এই দুই শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। Suzerainty শব্দটার অর্থ হ'ল ছোট রাজা কোন

ক্ষমতাবান রাজার অধিকার স্বীকার করে' নিয়েছে, কিন্তু তাকে করপ্রদান করতে সে বাধ্য নয়। যেমন অস্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ রাজা বা রাণীর suzerainty-কে স্বীকার করে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারকে কোন করপ্রদান করে না।

সেই যুগে তিন রকচমের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল: গরীব জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় করত; যারা কিছুটা বিত্তশালী ছিল তারা রজতমুদ্রার বিনিময়ে জিনিসপত্র কিনত; আর ধনী লোকেরা ক্রয় করত স্বর্ণ মুদ্রার মাধ্যমে। কর সংগ্রহকারী এই তিনের মধ্যে যে কোনটির মাধ্যমে কর সংগ্রহ করত কিন্তু তারা রাজাকে খাজনা দিত স্বর্ণবিত্তের মাধ্যমে।

দীর্ঘকাল ধরে' এই কর বা খাজনা ব্যবস্থা চলে এলেও আকবরের সময় এর একটা নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হ'ল। যেমন আকবর ডিক্রী জারী করলেন যে খাজনা আদায়কারীদের জমি দেওয়া হবে পাঁচ বা দশ বছরের জন্যে। পরবর্ত্তীকালে লর্ড কর্নওয়ালিশ সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাদের জমি দেওয়া হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে। তিনি বিধান দিলেন যে কর আদায়কারীদের প্রদত্ত জমির মালিকানা ও তাদের অধিকার বংশানুক্রমিক হবে। এই ব্যবস্থা এই জন্যে নেওয়া হয়েছিল যাতে কর আদায়কারী, কর আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, এলাকা ত্যাগ করে' চলে না যায়। আকবর আরও একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন যে প্রতিটি জমিখণ্ডের (plot) উত্তর ও

পশ্চিম সীমা জমির মালিকের অধিকারভুক্ত হবে। জমির বিধিনিয়মকে বলা হত "পাট্টা কবুলিয়ৎ” ব্যবস্থা। আকবরের প্রধানমন্ত্রী টোডরমল এই ব্যবস্থা কার্যকর করেন। জমির খাজনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাকেও বলা হত জমিদারী ব্যবস্থা।

আকবর জায়গীরদার প্রথারও প্রবর্তন করেছিলেন। জমিদারী ও জায়গীরদারী এই দুই প্রথাতেই জমির খাজনা দেওয়া হত রাজাকে। এদের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে জমিদারী প্রথায় জমিদার যদি সময়মত খাজনা প্রদানে অসমর্থ হত, তাকে কারাবাসে পাঠানো হত। আর বকেয়া খাজনা দিয়ে দিলে তাকে মুক্তি দেওয়া হত। জায়গীরদার প্রথায় খাজনা প্রদানে অসমর্থ হলে জায়গীরদারের জমি বাজেয়াপ্ত করে' নেওয়া হত। সমগ্র ভারতে হয় জমিদারী প্রথা না হয় জায়গীরদার প্রথা বলবৎ ছিল। যদিও ব্রিটিশ আমলে জমিদারদেরই মুখ্য খাজনা আদায়কারী রূপে গণ্য করা হত।

জমিদারেরা শুধুমাত্র খাজনা আদায়কারী রূপে গণ্য হত, ও তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। অবশ্য তারা যা খাজনা আদায় করত তার একটা নির্দিষ্ট অংশই রাজকোষে জমা পড়ত; তাই জমিদারেরা এক ধরনের সামাজিক পরগাছার মতই আরামে আয়েসে জীবন অতিবাহিত করত। জমিদারী ব্যবস্থায় সরকারকে কোন অর্থ ব্যয় করতে

হত না এটা সরকারের পক্ষ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের একটা ব্যবস্থা মাত্র ছিল।

ব্রিটিশ যুগে কৃষি বিভাগে সরকার কর্তৃক দুইজন উচ্চপদস্থ অফিসার এই কর সংগ্রহ ও কৃষিকাজের তত্ত্বাবধানের জন্যে নিযুক্ত হত। এদের মধ্যে যিনি civilian পর্যায়ভুক্ত তিনি করসংক্রান্ত কার্যালয় পরিচালনা করতেন। তিনি ছিলেন **সচিব** (secretary) পদমর্যাদাযুক্ত, ও তার কার্যালয়কে বলা হত সেক্রেটারিয়েট। অপর জন হতেন কৃষির ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন। তাঁকে বলা হত **অধিকর্তা** (director), ও তাঁর কার্যালয়কে বলা হত ডাইরেকটরেট। সচিব ইন্ডিয়ান সিবিল সার্বিসের সদস্য হতেন।

রাজস্ব বিভাগে একটি রেভেন্যু বোর্ড থাকত। ইন্ডিয়া সিবিল সার্বিসের একজন সদস্য সেই বোর্ডের সভাপতি হতেন। এই পদের গুরুত্ব এত বেশী ছিল যে, ভাইসরয় অসুস্থ থাকলে তাঁর পক্ষে রেভেন্যু বোর্ডের সভাপতি সরকারের সমস্ত কার্যাবলী পরিচালনা করতেন। সেকালে রাজস্ব বিভাগের কত গুরুত্ব ছিল তা এই ব্যবস্থাতেই বোঝা যায়। আজ রাজস্ব বিভাগ যেন সরকারের বোঝাস্বরূপ, আর তার আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণই বেশী।

রাশিয়ায় জার–সম্রাটদের সময় সেখানেও এক ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল, আর রাজস্ব আদায়কারীরা ভারতের মতই বংশানুক্রমিকভাবে অধিকার ভোগ করতেন। রাশিয়ায় এই ব্যবস্থা ছিল অবশ্য এক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, কেননা রাজস্ব আদায়কারীরা রাষ্ট্র ক্ষমতাও ভোগ করতেন। কিন্তু ভারতে এই ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না, কেননা জমিদারদের কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকত না। জমিদার কোন অপরাধ করলে অন্য সাধারণ মানুষের মত তাকেও বিচারব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হত। জমিদারেরা সামন্তপ্রভু না হওয়ার জন্যে তারা অন্যের জমি কেড়ে নিতে পারত না।

ব্রিটেনেও ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, ও তাতে ব্যারন, ভাইকাউন্ট, আর্ল, মার্কওয়েসেস্, ডিউক – এরা সব ছিলেন সামন্তপ্রভু। তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল ও তাঁরা হাউস অব লর্ডের সদস্য হতেন। হাউস অব কমন্সের সদস্যরা নির্বাচিত হতেন সাধারণ মানুষদের ভোটে। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা করা হ'ল যে হাউস অব কমন্স কোনো আইন পাশ করে' পাঠালে হাউস অব লর্ডস তা প্রত্যাখ্যান করতে পারত। কিন্তু হাউস অব কমন্স দ্বিতীয়বার তা পাশ করে পাঠালে, হাউস অব লর্ডস তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকত, ও রাজা বা রাণী তাতে হস্তাক্ষর করতে বাধ্য থাকতেন। এতে বোঝা যায় যে সেখানে পুরোদস্তুর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম ছিল।

ইংল্যান্ডে নিয়ম ছিল যে, কোনো লর্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি কোনো বিবাহ বিচ্ছিন্নাকে বিবাহ না করে' থাকে তবে সে হাউস অব লর্ডের সদস্য হবে। কিন্তু ফ্রান্সে নিয়ম ছিল সামন্তপ্রভুর সব ছেলেরাই লর্ড বলে গণ্য হবে। এতে লর্ডের সংখ্যা এত বেশী বেড়ে গিয়েছিল যে তারা তাদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল।

জমিদার প্রথার কিছু ভাল দিকও ছিল। ভাল জমিদাররা গরীব প্রজাদের দেখাশোনা করত। তারা যদি কর প্রদানে অসমর্থ হত তবে অনেক সময় জমিদার তাদের পক্ষ থেকে কর জমা করে' দিত। অনেক জমিদারের নিজস্ব বনাঞ্চল (private forest) ছিল। আর সরকারী বনাঞ্চলকে বলা হত সংরক্ষিত বন (reserve forest)। এই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বনাঞ্চল জমিদারেরা সাধারণতঃ ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করত। এর ফলে পরিবেশগত সাম্য ঠিকভাবে বজায় থাকত। বন্যা, ভূমিস্খলন, ভূমিক্ষয় কম হত, আর জমির উর্বরতা বজায় থাকত। গ্রীষ্মকালে নদী সচরাচর শুকিয়ে যেত না। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর এই সব private forest কেটে সাফ করে' দেওয়া হয়েছে, ও এই ভাবে পরিবেশের ভারসাম্যও ধ্বংস হয়েছে।

জমিদারী প্রথার অনেক ত্রুটিও ছিল। চাষীদের জমিতে কোন অধিকার ছিল না–তারা ছিল শুধুমাত্র কর্ষণকারী।

অথচ জমিদারেরা এক বিশাল পরিমাণ জমি নিজেদের ব্যষ্টিগত মালিকানায় রেখে দিত। তদতিরিক্ত জমিদারেরা যত রাজস্ব আদায় করত, আর সরকারের কোষাগারে যা জমা দিত তার মধ্যে বিশাল ব্যবধান থাকত।

জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচার চলতে থাকায় এই প্রথা বিলুপ্ত করে' দেওয়া হ'ল। বারংবার মানুষকে যদি একই কথা শোণানো হতে থাকে তবে মানুষ এক সময় ভাবে যে তাতে নিশ্চয়ই সত্যতা আছে, ও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। জমিদারী ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাই–ই ঘটেছিল। জমিদারী ব্যবস্থা রদ হয়ে যাওয়ার পরে সরকারকে বেতন দিয়ে কর সংগ্রহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হ'ল যার খরচ নির্বাহ হত এই রাজস্ব বিভাগ থেকেই। জমিদারী ব্যবস্থা রদ করে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নি। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত না করে' সরকার যদি পুঁজিপতিদের পুঁজির ওপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতেন, আর তাদের bank balance আর সঞ্চিত স্বর্ণবিত্তকে সিলিং–এর আওতায় আনতেন, তাতে সমাজের বেশী উপকার হত। এছাড়া আরও নানা ভাবে জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করা ও চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করা যেতে পারত। তার পরিবর্তে সাধারণ মানুষকে নিরন্তর শোণানো হতে থাকল, যে চাষ করে' জমি তার। এই যুক্তি যদি মেনে নিতে হয় তবে বলতে হয় যে দাড়ি কামায়, মাথার মালিকও সেই–ই।

সূচীপত্র

১৩ জুলাই ১৯৮৮, কলিকাতা

কম্যুনিজম প্রসঙ্গে

যে সকল মানুষ বা যে মানবগোষ্ঠী একটি বিশেষ সামাজিক মতবাদকে মেনে চলছে ধর, জাতপাত মানছে, যেমন বামুন–কায়েৎ–বদ্যি–নবশাখ প্রভৃতি জাতপাতের হিসেব বিধিনির্দিষ্ট মনে করে তাকে মেনে চলছে......ভাবছে, উঁচু–নীচু বিচার বুঝি পরমপুরুষেরই আদিষ্ট ......ভাবছে, মানুষ চোখে দেখতে পাক বা না পাক প্রতিটি জীবের পিঠে বা বুকে কিংবা ব্রহ্মতালুতে স্থায়ী রবার ষ্ট্যাম্পে জাতের কথা লেখা আছে কোন অপাঠ্য ভাষায় সেই সকল জনগোষ্ঠীকে 'গণ' বলা হয়, যেহেতু তারা একটা সামাজিক বিধি মেনে চলে।

যদি কিছু লোক মনে করে তারা গতর খাটিয়ে রোজগার করবে তাদের যেমন গতরের বিনিময়ে রোজগার হয়, তেমনি যারা বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবসা করছে, শনি মহারাজের কৃপায় তাদের যত ইচ্ছা অর্থ উপার্জনের অধিকার আছে...... তাদের যুক্তি হ'ল অনেককে ঠকিয়ে নয়, অনেকের তারা ট্রাস্টি, তারা কারো মুখের গ্রাস কাড়ছে না, অতিভোজন থেকে

ক্ষুৎপীড়িত মানুষকে বাঁচাবার জন্যে তাদের শালপাতা থেকে রুটি তুলে নেয়– এই যে বিশেষ মনোবৃত্তির দ্বারা গ্রসিত জনগোষ্ঠী তাদের জন্যে 'গণ' শব্দ চলবে।

আবার এমনও কিছু লোক থাকতে পারে যারা কোন অর্থনীতি বা দর্শনের ফাঁকা আবাজ শুণে ভাবে, এতেই বুঝি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি–মোক্ষ এসে যাবে সব মানুষ এক হয়ে যাবে মুড়ি–মুড়কি তো বটেই, মুড়ি–মিছরিরও এক দর হবে........incentive অর্থাৎ কাজ করার রুচি, প্রেরণা বা প্রেষণা না থাক সবাইকে কেবল প্রয়োজনের দৃষ্টিতে দেখে, তার যোগ্যতার বিশেষ মূল্য দেয় না....এই ধরনের মানুষের ফাঁকা বুলি, ফাঁকা শ্লোগানের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে মানুষে মানুষে ভেদ বুদ্ধি বাড়িয়ে দেয় আর এই ভেদ–বুদ্ধিতে সামান্যতম আঘাত পড়লে বলে এসব রাজনীতির ব্যাপার.....এগুলিকে সামাজিক অপরাধ বলে শাস্তি দেওয়া চলবে না – এই ধরনের বিপথগামী আবাজসর্বস্ব মানুষের গোষ্ঠীর জন্যে 'গণ' শব্দটি ব্যবহার করতে পার।

কোন তথাকথিত রেলিজিয়নকে যে সকল জনগোষ্ঠী মেনে চলে.... চোখ কাণ বুজে তাদের ডগমাকে মানে ইতোপূর্বে আমি তোমাদের বলেছি, ডগমার সমাহারে তৈরী হয় ইজম্......ইজমের সমাহারে তৈরী হয় রেলিজিয়ন (লৌকিক অর্থে 'রেলিজিয়ন' বলতে ধর্মকে বোঝায় কিন্তু দার্শনিক অর্থে

রেলিজিয়ন ও ধর্ম এক নয়)। রেলিজিয়ন যে কেবল আত্মা-পরমাত্মা সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বই তা নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক ভূমিতেও বিভিন্ন ধরনের ডগমাশ্রয়ী যে রেলিজিয়ন, যে ইজ্‌ম তাদের মধ্যেও রেলিজিয়নের মত অনেক বক্তব্য শুণতে [একই রকম] লাগে। রেলিজিয়ন যেমন অনেক সময় মানুষের মনে কুশিক্ষা ঢুকিয়ে দিয়ে, সংঘর্ষের প্রেরণা জোগায়, এই সব ইজমও তেমনি শ্রেণী-সংগ্রামের নাম দিয়ে মানুষকে পশুত্বের নিম্নস্তরে নাবিয়ে দেয়। যাই হোক এই রেলিজিয়ন ভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে বলব 'গণ'।

একই রেলিজিয়ন ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা রয়েছে।. যেমন, জৈনমতে রয়েছে শ্বেতাম্বর, দিগম্বর, তেরাপন্থী সম্প্রদায়, বৌদ্ধদের মধ্যে রয়েছে মহাযানী, হীনযানী, লামাবাদী, স্থবিরবাদী, সম্মিতীয় প্রভৃতি। একই অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যেও তোমরা দেখেছ সামান্য ছোট-খাট ব্যাপারে মত পার্থক্যের ফলে একটি রাজনৈতিক দল, একটি অর্থনৈতিক দল হাজারো শাখায় টুকরো হয়ে গেছে-যাচ্ছে...... যাবেও। এরাও সবাই 'গণ' পর্যায়ভুক্ত। গণের এই সব অর্থগুলো ঠিক ঠিক বুঝে নিলে তো।

বর্তমান পৃথিবী যেমন মতবাদের জ্বালায় জর্জরিত ঠিক তেমনি গণেদের, ঠ্যালায় আর হুমকিতে বিপর্যস্ত। শান্তশিষ্ট মানুষদের এর থেকে পরিত্রাণের একটা রাস্তা খুঁজতে হবে....

একটা এসপার–ওসপার করতেই হবে। মানুষ চলবে নীতিবাদের পথে ৰৌদ্ধিকতাসম্মত মুমুক্ষা বা তিতিক্ষার পথ ধরে .... "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।”

১০ এপ্রিল ১৯৮৮, কলিকাতা

(শব্দ চয়নিকা ষোড়শ খণ্ড প্রবচন ১২০)

* * * * *

'অচল' শব্দের আরেকটি অর্থ হ'ল ধর্ম। ধর্মের স্থানচ্যুতি ঘটে না, স্থানচ্যুতি ঘটে মানুষের। মানুষ দুষ্ট বুদ্ধিতে, ভুল দর্শনে, কু–সঙ্গে বা কু–পরামর্শে ধর্মের আশ্রয়ের বাইরে চলে যায় ও গিয়ে অনেক সময় অনেক অনর্থ ঘটায়। সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীতে তোমরা দেখেছ মার্ক্সবাদীরা গলা ফাটিয়ে আলজিবে টাটিয়ে চীৎকার করত– "ধর্ম আমরা মানি না।" আজ [তাঁরা যে] বিভ্রান্ত [তা] দর্শনের কলে ধরা পড়েছে, আজ ধরা পড়েছে তাদেরই নেতৃস্থানীয় লোকেরা। অকাতরে সামান্য ছুতোনাতায় ন্যায়সঙ্গত বিচার পর্যন্ত না করে লাখ লাখ নিরীহ–নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছিল। এটা কি মনুষ্যোচিত কাজ হয়েছিল? অচল অর্থাৎ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে [এরা] এই ধরনের নারকীয় ঘটনা ঘটিয়েছে। আজ এই সব মানুষের ধিক্কার অবশ্য প্রাপ্য। এদের নামে স্তম্ভ–মিনার, তাজ রচনা করা, সরণি তৈরী করে জনসাধারণের অর্থের

অপচয় করা পাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব কপটাচারীরা কোন দেশেই যতক্ষণ না ক্ষমতা হস্তগত করছে ততক্ষণ লোক- দেখানো গণতন্ত্রের বুলি কপচায়। ক্ষমতা অধিগত হবার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে পার্টি একনায়কতন্ত্রের ষ্টিমরোলার চালিয়ে মানুষের সমস্ত সংবেদনাকে, সমস্ত সূক্ষ্ম মানবিক রুচিবোধকে গুড়িয়ে ধূলো করে দেয়।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

তোমরা জান যে প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের এই বাঙলাদেশ যুক্তিতর্কের দেশ.... ন্যায়শাস্ত্রের দেশ..... নব্য ন্যায়ের শিরোপা পরেছে আমাদের বাংলা। বাঙলার মানুষ অযৌক্তিক ভাবে কখনও কোন কিছুকে মানে নি..... মানে না... মানবে না। ক্ষণেকের জন্যেও অযৌক্তিক কোন কিছুকে মেনে থাকলেও পরে যখন তাকে যুক্তিগ্রাহ্যতার পরিবেশের মধ্যে আনা হয়, তখনই সে অযৌক্তিক বস্তুকে ত্যাগ করে। বৌদ্ধধর্মের দুঃখবাদ জীবের জীবনধর্মকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল। **গার্হস্থ্য জীবনে মুক্তি নেই– এই ধারণা মানুষের গার্হস্থ্য জীবনের কাঠামোকে ছিন্নভিন্ন করেছিল।** বাঙলার

মানুষ এর ওপরে তাই যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করে বলেছিল পরমপুরুষ আমার লক্ষ্য, দুঃখের ভেতর দিয়ে চলছি ঠিকই, তাই বৌদ্ধ দুঃখবাদ মানছি কিন্তু আমার চরম লক্ষ্য রাগে অনুরাগে পরমপুরুষকে পাওয়া ("রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে আসল মানুষ প্রকট হয় / মানুষে মানুষে নেইকো প্রভেদ নিখিল মানব ব্রহ্মময়"), তখন মানুষ বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ভক্তিরসের অভিসিঞ্চনে তৈরী করল অতিসুখবাদ। মার্কস্বাদের অযৌক্তিক, অমানবিক, বন্ধ্যা কমুউন প্রথা মানবতার স্পান্দনিক অভিব্যক্তিকে একেবারে জলো করে তুলেছিল। মানুষ আজ মার্কস্বাদের সেই পানসে আবহাওয়া থেকে মুক্ত হতে চাইছে...... এগিয়ে যেতে চাইছে দৃঢ় পদবিক্ষেপে মানবের মহাতীর্থ তথা চরম লক্ষ্যের দিকে।

১০ অগষ্ট ১৯৮৮, কলিকাতা

(শব্দচয়নিকা সপ্তদশ খণ্ড প্রবচন ১৩১)

ইংরেজী Communism শব্দটি এসেছে commune শব্দ থেকে যা mune এই মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'co' উপসর্গ যোগ করে নিষ্পন্ন। 'co'-এর অর্থ "মিলিত ভাবে" আর mune এর অর্থ "কিছু করা"। তাই কম্যুনিজম কথাটার প্রকৃত অর্থ "মিলিত ভাবে কোন কিছু করা"। যেখানে কম্যুউন ব্যবস্থার অস্তিত্ব আছে সেক্ষেত্রে কম্যুনিজম শব্দটির প্রয়োগ করা চলে। আর যারা সেই ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে তারাই 'কম্যুনিষ্ট'।

কম্যুউন ব্যবস্থায় সব কিছু ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাই সেখানে মানুষের মিলিত ভাবে কিছু করার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। কম্যুনিষ্টরা আজ যে অর্থে কম্যুনিজম শব্দটির ব্যবহার করে তা অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিমূলক।

কার্ল মার্ক্স কম্যুনিজম সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে তাঁর প্রতিপাদিত দর্শনের সেই অংশটুকুর মধ্যে যা মৌল মানবীয় মনস্তত্ত্বের বিরোধী। অর্থাৎ তিনি তার দর্শনে যেখানে যেখানে কেবল কল্পনার জাল বুনেছেন বা চোরাবালিতে প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন তা নিয়েই আমাদের এই আলোচনা।

কম্যুনিজম মূলতঃ একটি জড়বাদী দর্শন। শুধু জাগতিক উদ্দেশ্য পূর্তিই এর মূল উপজীব্য। এতে মানুষের মনের ভাবনাকে বৌদ্ধিক ধারার সঙ্গে পরমসত্তার পানে প্রধাবিত করার কোন সুযোগ নেই। মানব মনের স্বাভাবিক গতি পশুত্বের প্রতি। কিন্তু সেই মনই যদি সূক্ষ্মতম সত্তার ভাবনা নেয় তবে এক সময় মন তাতেই সমাহিত হয়ে যায়। সাধকের কর্তব্য মনকে উচ্চতর চিন্তায় ব্যাপৃত রাখা। এইভাবে মন মানসোত্তর দিক থেকে যত ক্রমোন্নত হতে থাকে তত মানস–সংরচনা সূক্ষ্মতর হতে থাকে, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে আর মনে নোতুন নোতুন ভাব বা idea-র জন্ম হয়। কিন্তু শুধু জাগতিক বিষয়ের মধ্যে মনকে সীমাবদ্ধ রাখলে

মন স্থূলতর ও জড়ভৌমিক হতে বাধ্য। কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থায় ঠিক সেটাই হয়। তাই কম্যুনিজমের দর্শন এমনই যে তা মনকে স্থূলত্বে পর্যবসিত করে।

কম্যুনিষ্ট সমাজে মানবিকতা, নীতি বা নৈতিক জীবনাচর্যের পবিত্রতা এ সবের অভাব থাকে। কম্যুনিজম একটি সুদৃঢ় মানসিক তথা ৰৌদ্ধিক সংরচনা তৈরীর উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে অক্ষম। ফলস্বরূপ কম্যুনিষ্ট সমাজে নৈতিক বল বা নীতিগত শুদ্ধতা বলে কিছু থাকে না। ভারতে বৌদ্ধযুগের পূর্বে চার্বাক দর্শনের প্রভাবে ঠিক এই পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও চার্বাক দর্শন বৈদিক অনুষ্ঠানসর্বস্বতার প্রতিবাদস্বরূপ কিন্তু আদতে তা জড়বাদভিত্তিক। সেই সময়টায় নীতিপরায়ণতার নামগন্ধ ছিল না সমাজে নৈতিক দৃঢ়তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে আজ ঠিক এই অবস্থাই বিরাজ করছে ও ভবিষ্যতে এই রকমটাই থাকবে।

কয়েক দশক আগে পূর্বতন রাশিয়ায় এক কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রনেতা কম্যুনিজমের নামে সেই দেশের পঞ্চাশ লক্ষের অধিক মানুষকে হত্যা করেন ও ততোধিক মানুষকে সাইবেরিয়ায় লেবার কন্সেনট্রেশন ক্যাম্প-এ পাঠান। সংবাদপত্রের সাম্প্রতিক খবর অনুসারে এক কম্যুনিষ্ট দেশে প্রতি বছর দশ লক্ষের অধিক অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়।

এতে প্রমাণিত হয় যে কম্যুনিজমে অনৈতিকতা প্রশ্রয় পায়। Immorality বা নীতিহীনতাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে তা এক সময় মানব সমাজকে গ্রাস করে নেয় আর সমাজব্যবস্থায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ সমগ্র সামাজিক সংরচনাটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ দর্শনকে তাই সহ্য করা যায় না এমনকি এ সম্পর্কে কোন চিন্তা করলেও তা যেন মনে এক বিজাতীয় মনোভাব তৈরী করে দেয়। এই পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত মানবতাবিরোধী আর নরঘাতী তত্ত্ব এসেছে তার মধ্যে কম্যুনিজম সবচেয়ে বর্বরতাপূর্ণ। তাই সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কর্তব্য এ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করা ও এই তত্ত্বকে আকুড়ে নিক্ষেপ করা।

যে সব দেশে একসঙ্গে পরিশ্রমী ও বৌদ্ধিকভাবে উন্নত মানুষের সংখ্যা বেশী তারা কম্যুনিজমকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করেছে। কার্ল মার্ক্সের জন্ম জার্মানীতে কিন্তু সেখানকার জনসাধারণ কম্যুনিজমকে গ্রহণ করেনি। তেমনি ইংল্যান্ড কার্ল মার্ক্সকে আশ্রয় দিলেও তার তত্ত্বকে স্বীকার করেনি। সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত ইংল্যান্ডেই আর বৃটিশ সমাজের বিভিন্ন দিকে এই সমবায়মূলক ভাবধারার প্রতিফলন আছে; তাই বৃটেনে মার্ক্সিজম কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। জাপান দেশটি রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া ও চীনের মত কম্যুনিষ্ট দেশ

দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেও জাপান কম্যুনিজমকে গ্রহণ করে নি। উপরি-উক্ত দেশগুলির মানুষ কঠোর পরিশ্রমী ও বৌদ্ধিক দিক থেকে উন্নত হওয়ায় তারা কম্যুনিজমকে অস্বীকার করেছে।

ভারতে উনিশশো কুড়ি থেকে তিরিশ সালের মধ্যে কিছু মেধাবী ছাত্র মার্ক্সিজমের সংস্পর্শে আসে ও মন্দের ভাল হিসেবে তারা কম্যুনিজমকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেরা ছাত্ররা আর মার্ক্সিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, কেননা তা যে বৌদ্ধিক দিক থেকে একটি অন্তঃসারশূন্য তত্ত্ব তা সকলেই বুঝে গেছেন।

কম্যুনিজমের সঙ্গে বৌদ্ধিকতার সম্পর্ক যেন সাপ-বেজীর সম্পর্কের মত। বেজীর যেমন স্বভাব হচ্ছে সাপকে গিয়ে খাওয়া, সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী মানুষও তেমনি সহজেই কম্যুনিজমের ত্রুটিগুলিকে ধরে ফেলে ও তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেয়।

এটা ঠিক যে কম্যুনিজম কার্ল মার্ক্সের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে আছে – যদিও গান্ধীবাদের দর্শন ভারতের স্বাধীনতালাভের আগেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল অর্থাৎ গান্ধীর পূর্বেই গান্ধীবাদের মৃত্যু হয়েছিল। কম্যুনিজম দু'টি কারণে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে: একটি হচ্ছে

অনবরত মগজ–ধোলাই বা প্রচারের বিভিন্ন কলাকৌশলের আশ্রয় নেওয়া। দ্বিতীয় হচ্ছে পাশবিক শক্তির প্রয়োগ। যদি একই জিনিস নানাভাবে বারংবার প্রচারিত হতে থাকে তাহলে মানুষ ভাবতে শুরু করে যে যা বলা হচ্ছে তাতে বোধহয় কিছুটা সত্যতা আছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি এক নাগাড়ে প্রচার করা হতে থাকে যে গোপাল ছেলেটি খুবই খারাপ তাহলে মানুষের চোখে গোপাল খারাপই হয়ে যাবে। তেমনি কম্যুনিষ্টরা তাদের তত্ত্বের বিরতিহীন booming-এর মধ্য দিয়ে অনেক মানুষের মনে এই ত্রুটিপূর্ণ দর্শনকে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এইভাবে তারা সমর্থক ও ক্যাডার তৈরী করতে পেরেছিল। কিন্তু সেই ক্যাডাররা বুদ্ধির দিক থেকে দেউলিয়া। তাই যখনই কোন শক্তিশালী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে তখনই এই সব ক্যাডারেরা নাকানিচোবানি খেয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত পাশবিক শক্তির আশ্রয় নিয়েছে।

কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে পার্টি নেতারা বিরোধী কণ্ঠকে রুদ্ধ করে রাখতে অত্যাচার, নিপীড়ন, বাকস্বাধীনতার অবদমন, মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখা এই সব পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কিছু পার্টি নেতাদের বিবেক জেগে উঠল ও তারা এই দমননীতির বিরুদ্ধাচারণ করল। এই কারণেই চীনদেশে ছাত্রআন্দোলন বেশী দিন দমিয়ে রাখা যায়নি।

সূচীপত্র

কিছু কিছু নেতারা আবার কম্যুনিজমের অন্য ধরনের রূপ নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করার অসফল প্রয়াস করেছিলেন। যেমন ইয়ুরোপের জাতীয় সমাজবাদীরা (National Socialists) একসময় মেকী–কম্যুনিজমের প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। ইউরো–কম্যুনিজম মেকী ধনতন্ত্রবাদ ও মেকী কম্যুনিজমের মধ্যে একটা সঙ্গতি স্থাপনের প্রয়াস। কিন্তু এদের দুইয়ের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন কি কখনো সম্ভব? লাতিন Pseudo আর ইংরেজী false শব্দ দু'টি সমার্থক নয়। Pseudo কথাটির অর্থ হচ্ছে যা কিছুটা original বা মূল বা আসল জিনিসের মত কিন্তু হুবহু আসলের মত নয়। তাই Pseudo-communism অর্থাৎ মেকী কম্যুনিজম মানে কম্যুনিজমের মত কিন্তু কম্যুনিজম নয়; তেমনি Pseudo-capitalism মানে ওপর ওপর দেখে মনে হচ্ছে ক্যাপিটালিজম কিন্তু আসলে ক্যাপিটালিজম নয়। পুঁজিবাদের কাছে গণতন্ত্র খুব পছন্দসই ব্যবস্থা কেননা গণতন্ত্রে ভোট কিনে নিয়ে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর। অথচ সেখানে দরিদ্র জনসাধারণ ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে পারে না। গণতন্ত্রে উন্নয়ন হয় ঢিমেতালে। দ্রুত উন্নয়ন সেখানে সম্ভব নয়।

যে কোন তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত, ভাবধারা বা প্রতিপাদনের একটি দৃঢ় ভিত্তি থাকা আবশ্যিক। এটা একটা মৌলিক প্রয়োজন। জাগতিক ও মানসিক স্তরে যা কিছু থাকে তাকে দেশ–কাল–

পাত্রের সীমারেখার মধ্যে কাজ করতে হয়। কোন তত্ত্ব বা প্রতিপাদন এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু কম্যুনিজমের কোন মৌলিক ভিত্তিই নেই, আর যদি ভিত্তি বলে কিছু যাকেও তা হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা (oscillating)। তাই এটি প্রকৃতপক্ষে না একটি theory, না সিদ্ধান্ত, না কোন প্রতিপাদন।

আজ কম্যুনিষ্ট দেশগুলিই কম্যুউন ব্যবস্থাকে ত্যাগ করছে কেননা তারা বুঝেছে এই পচাগলা ও ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্ব সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল। এই সব দেশে কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থায় নৈতিক অধঃপতন, দুর্নীতি ও আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা সৃষ্টি করেছে খাদ্য দ্রব্যের অভাব ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা। আগে কম্যুনিষ্ট নেতারা আদর্শের গালভরা বুলি শুণিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করত, এখন তারা নিজেরাই কম্যুনিজমকে ত্যাগ করেছে। তাত্ত্বিক দিক থেকে মার্ক্সিজম আগেই অসার বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এখন বাস্তবভাবে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে তা চরম ব্যর্থ বলে প্রমাণিত।

কোন কোন কম্যুনিষ্ট দেশে যে তথাকথিত পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে তা আসলে মেকী শোধনবাদ ছাড়া কিছুই নয়। মেকী শোধনবাদ কোন জাগ্রত ভাবোন্মেষের বিরুদ্ধে এক ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া, তাই তা বৌদ্ধিকতার বিচারে সফল ও সঠিক বলে কখনই বিবেচিত হয় না। মেকী

শোধনবাদের যে কোন নীতি মানুষের আস্তিত্বিক প্রাণধর্মের বিরোধী। এই ধরনের প্রয়াস একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সাময়িক আলোকোদ্ভাস ছাড়া কিছুই নয়। অর্থাৎ তা ক্ষণস্থায়ী আর এর অকালমৃত্যুর পর তা মানব ইতিহাসে কোন স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে পারে না। কম্যুনিজমেরও ভবিতব্য এটাই। তাই কম্যুনিজমের মেকী শোধনবাদকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে।

কম্যুনিজম আজ একটি মৃত তত্ত্ব যদিও তা নামে মাত্র বেঁচে আছে। এই বিপজ্জনক তত্ত্ব সমাজের বুকে অনেক অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালিয়ে এসেছে। যতদিন এর নামমাত্র অস্তিত্বও বজায় থাকবে ততদিন কম্যুনিজম অত্যাচার করে চলবে। আসলে মার্ক্সিজমের পাপের বোঝাই তাদের ধ্বংসকে ডেকে এনেছে। কম্যুনিজমের দ্বারা যত পাপ সংঘটিত হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্তের দায়ভার সকলকেই নিতে হবে – এ ব্যাপারে একজন নিরপরাধ মানুষও বাদ যাবে না। তাই তত্ত্বগত ভাবে তো বটেই, কম্যুনিজমের নামটাই মুছে দিতে হবে। প্রাউটিষ্টদের এটা কর্তব্য যে কম্যুনিজমের নামও যেন যথাশীঘ্র সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেননা এর অব্যাহত থাকাটা মানবীয় অস্তিত্বের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক।

যখন দীর্ঘকাল ধরে চলা কোন ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয় তখন তা স্বল্পস্থায়ী হলেও সেটা ভয়ংকর হ্যারিকেন ঝড়ের মত বিধ্বংসী রূপ নেয়। কম্যুনিজম নিজের

ব্যর্থতার আগুনে নিজেই জ্বলে মরছে। প্রাউটিষ্টদের কাজ হচ্ছে সেই দহনক্রিয়াকে আরও তীব্রতর করা।

১৪ই জুলাই ১৯৮৮, কলিকাতা

আদর্শের আস্তিত্বিক মূল্য

যখন কোন জনগোষ্ঠী বা জনসমুদায় ত্রুটিপূর্ণ পথ অনুসরণ করে' চলে, আর পরে যখন বুঝতে পারে যে তাদের অনুসৃত পথ যথার্থ ছিল না, তখন তারা নিজেদের মধ্যে কোন্দল শুরু করে' দেয়, আর বিভিন্ন গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠীতে বিভাজিত হয়ে যায়। তারা তখন ভাল লোকেরও ক্ষতি করতে থাকে। এটা হয় এই জন্যে যে এরা এদের পুরনো সেই ত্রুটিপূর্ণ পথকে ত্যাগ করতে চায় না। চার্বাকের অনুগামীদের এই দশাই হয়েছিল।

বিভিন্ন ধর্মমতের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। কোন ত্রুটিযুক্ত ধর্মমত দ্বারা নিচুজাতের মানুষদের শোষণ চলতে থাকলে শোষিত মানুষেরা সেই ধর্মমত ত্যাগ করে' অন্য ধর্মমতকে গ্রহণ করে' নেয়। যখন মানুষ যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছাড়াই অন্য ধর্মমত গ্রহণ করে যে ধর্মমত আদর্শগত

শূন্যতার দোষে দুষ্ট, বা যা তাদের পূর্বে অনুসৃত ধর্মমতের থেকেও নিকৃষ্ট– তখন তারা এক ধরনের উদগ্র আচরণ শুরু করে' দেয়। সে সময় যে সব কাজ তাদের নিষিদ্ধ ছিল, সেগুলি তারা আরও বেশী করে' করতে থাকে। অবশ্য যারা কিছুটা আদর্শগত কারণে অন্য ধর্মমতকে গ্রহণ করে তাদের মধ্যে এই ধরনের আচরণ বড় একটা দেখা যায় না।

মহাভারতের যুগে যদুবংশীয়দের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। বলরাম ছিলেন কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আর তিনি ছিলেন যদুবংশের একজন গোষ্ঠীপতি। কিন্তু তিনি মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। ধর্মশাস্ত্রে আছে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর তা কখনই খোলখুলিভাবে করা উচিত নয়। সেই অনুযায়ী প্রকাশ্যে মদ্যপান করা, বা অন্য কোন নেশায় গ্রস্ত হওয়া অনুচিত। সাধারণ যদুবংশীয়রা বলরামকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করত। তাই তারা যখন তাকে প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে দেখল, তখন তারা অধিক থেকে অধিকতর মদ্যপান শুরু করে' দিল। ফলস্বরূপ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তারা নিজেদের মধ্যে শুরু করল হানাহানি। শেষ পর্যন্ত প্রভাসতীর্থে তারা একে অন্যকে হত্যা করল, আর যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল।

মানুষ আদর্শবিহীন পথ অনুসরণ করে' চললে এই পরিণতিই হয়। নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়। ঠিক তেমনি কোনো তত্ত্ব, যা এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ

পথের কথা বলে, তাদেরও বিনাশ একই ভাবে হয়। এটিপূর্ণ পথ অনুসরণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ সেই অবস্থায় বলে থাকে, "আমি তো বলেছিলুম যে পথটা ত্রুটিপূর্ণ" বা "পথ তো ত্রুটিপূর্ণ নয়, কিন্তু এরকমটা হ'ল কিছু নেতাদের কুপ্রভাবে।" এইভাবে তাদের মধ্যে তৈরী হয় নানা দল, উপদল। আমরা দেখব আজ ঠিক এই অবস্থাটাই বিরাজ করছে।

আজকের পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহ থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, আজকে এক সর্ব ব্যাপক আদর্শগত শূন্যতা বিদ্যমান। কোনো আদর্শের কারণে সৃষ্ট, বিশাল উথালপাথাল জনিত পরিস্থিতি এটা নয়। এই শূন্যতা সৃষ্ট হয়েছে এই কারণে যে আদর্শগত লক্ষ্যটাই মানুষের সামনে থেকে সরে গেছে। আমরা অবশ্য এটা বলতে পারি যে শূন্যতা বলে আসলে কিছু ছিলনা। কেননা যথার্থ আদর্শ না থাকলেও শূন্যস্থান দখল করেছিল নানা নোংরা আবর্জনা। মানুষ এখন নৈতিক ও ৰৌদ্ধিক শক্তিতে (আমি এখানে প্রাউটের কথা বলছি না, কিন্তু অন্যেরা তা বলতে পারেন) বলীয়ান হয়ে আদর্শগত লক্ষ্যের ক্ষেত্রে সেই আবর্জনা দূর করে' দিয়েছে। এক্ষেত্রে যা কর্তব্য ছিল তাই করা হয়েছে শারীরিক শক্তিতে নয়, নৈতিক ও ৰৌদ্ধিক শক্তিতে। আমরা এইসব আবর্জনা নির্মূল করে আমাদের যথাযথ কর্তব্য

সম্পাদন করেছি। এখন আমাদের দেখতে হবে যেন মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে যা অস্বাস্থ্যকর তা আবার লক্ষ্য হয়ে না দাঁড়ায়। আমাদের এখন থেকে সতর্ক থাকতে হবে যে মানুষের লক্ষ্যের ব্যাপারে কোন রকমের অবাঞ্ছনীয় ভাবধারা বা তত্ত্ব যেন আবার প্রশ্রয় না পায়।

যেহেতু আজ এক আদর্শগত শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তাই ত্রুটিপূর্ণ পথ অনুসরণকারীদের মধ্যে যারা ভাল মানুষ তাদের কাছে যেতে হবে। যাদের মধ্যে বিচারপূর্ণ মানসিকতা আছে তারা অবশ্যই ভ্রান্ত পথ বর্জন করবেন। সেই সঙ্গে কোনো ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্বের যে অবশিষ্ট অংশটুকুও আছে তাকেও সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। আর যারা এখনও সাধারণ মানুষকে জেনে বুঝে বিপথে পরিচালিত করছে জনসমক্ষে তাদেরও মুখোশ খুলে দিতে হবে, যাতে তারা নিরীহ জনসাধারণকে আর শোষণ করতে না পারে। মূলতঃ যা করতে হবে তা হচ্ছে, আদর্শগত লক্ষ্য বলে' যে ভ্রান্ত ধারণাটা তুলে ধরা হয়েছিল, তা যেন কোনভাবেই আর ফিরে আসতে না পারে। তাকে বিশ্বের বুক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিতে হবে। কেননা তা মানবসমাজে শ্রেণীসংগ্রাম আর শ্রেণী ঐক্যের নামে নানা রকমের বিভাজন ও ভেদাভেদ সৃষ্টি করে' এসেছে।

প্রকৃত অর্থে "আদর্শ" বা Ideology কথাটার তাৎপর্য হ'ল সঠিক দিশায় অগ্রসর হওয়ার জন্যে যার কাছ থেকে আমরা

নিরন্তর নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা লাভ করি। কোনো জড়বাদী তত্ত্ব বা দর্শন ব্যষ্টি, রাজনৈতিক দল, নেশন বা শ্রেণী, যে নামেই তা প্রচারিত হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে আদর্শ নয়। আদর্শের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবধারা (spiritual sense) ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধিত, অর্থাৎ আদর্শগত উদ্দীপনা পরমতত্ত্বের সঙ্গে সমান্তরলতা রক্ষা করে চলে। যেখানে আদর্শ এই সুমহান ভাবধারায় সমুজ্জ্বল সেখানেই তার অস্তিত্বগত মূল্য পূর্ণভাবে অনুভূত হয়।

মানুষের ওপর সমস্ত জড়বাদী তত্ত্বেরই প্রভাব ধ্বংসাত্মক। এই জড়বাদী চিন্তাভাবনার শেষ পরিণতি কী? তোমরা জান, মানুষের মন যা চিন্তা করে মন তাই- ই হয়ে যায়। যদি কেউ দিনরাত রসগোল্লার কথা চিন্তা করে তবে তার মানসধাতু এক সময় সেই রসগোল্লারই রূপ পরিগ্রহ করবে। যদি কেউ সর্বদা টাকাপয়সার কথা ভাবে তবে তার মন টাকাপয়সাতেই পর্যবসিত হবে। তেমনি মন যদি পরমপুরুষের ধ্যান করে তবে তা শেষ পর্যন্ত পরমপুরুষই হয়ে যাবে। জড়বাদের ক্ষেত্রে জড়ই যেখানে 'ধ্যান-জ্ঞান, সেখানে মন নিশ্চিতরূপে জড়ে পরিণত হবে। মন যখন জড়ের রূপ নেয়, তখন সেই স্থানে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। আত্মার বিষয় হচ্ছে মন। তাই মানসিক ক্ষেত্রে যখন শূন্যতার সৃষ্টি হয়, আত্মা বা অণুচৈতন্য সেই জড়ায়িত শূন্যতার (thick vacuum) রূপ

পরিগ্রহ করে। ঠিক তেমনি যখন জীবাত্মা জড়ের রূপ পরিগ্রহ করে তখন অণু'র আত্মিক স্তরে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তখন চিতিশক্তিও (cognitive principle) সেই শূন্যতার [জড়ায়িত শূন্যতা] রূপ নিয়ে নেয়। এইভাবে মানুষের সমগ্র অস্তিত্বটাই জড়ে পরিণত হয়ে যায়। জড়বাদের এই হ'ল অন্তিম পরিণতি।

কোথাও কি কোনো শূন্যতা শেষপর্যন্ত থাকতে পারে? না, তা থাকতে পারেনা। কেননা সবকিছুই চৈতন্যময় অস্তিত্বে পরিপূর্ণ। এমনকি সমস্ত inter- atomic বা intra-atomic space-এও পরমচৈতন্য সত্তা বিরাজমান। যেহেতু তার অস্তিত্ব সর্বব্যাপক, তাই তিনি সবকিছুই দেখছেন, কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। বলা হয়েছে–

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণত্বো কর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।"

কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থায় জড়বাদই জীবনের একমাত্র সত্য। তাই এই ব্যবস্থার সঙ্গে যে যুক্ত থাকবে সেও জড়ের সঙ্গে একাত্ম

হয়ে যাবে। কম্যুনিজম এক অন্তঃসারশূন্য "ইজম্” বা মতবাদ। এর কোন দৃঢ় ভিত্তি নেই। কম্যুনিজম মানুষের শারীরিক, মানসিক ও মানসোত্তর অস্তিত্বকে চরম অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, নীতিগত বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর যে ঋণাত্মক প্রভাব তা এক সর্বগ্রাসী শোষণ ও দমনের রূপ নেয়। পূর্বতন কম্যুনিষ্ট নেতাদের নিজস্ব স্বীকারোক্তি এই ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

এখন জড়বাদকে যদি বর্জন করা হয় তাহলে মানুষের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? সূক্ষ্মতম পরম সত্তাই হচ্ছেন মানুষের পরম লক্ষ্য। মানুষকে সেই মহত্তম লক্ষ্যের পানে এগিয়ে চলতে হবে। তোমার approach হবে অন্তর্মুখী, পরমাগতির অনুসারী (subjective), কিন্তু এই জগতের বিভিন্ন বৈষয়িক অস্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়েই (objective adjustment) তোমাকে চলতে হবে। সামঞ্জস্য বিধানের এই যে প্রক্রিয়া তাতে থাকে বিষয়ী (subject) আর বিষয় (object)। পরবর্তী স্তরে বিষয়ী বিষয়ে পরিণত হয়, ও আর একটি নোতুন বিষয়ীর উদয় হয়। আবার তত্‌পরবর্তী স্তরে নোতুন বিষয়ী বিষয়ে পরিণত হয়। একটি বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার উদাহরণ নেওয়া যাক। বিদ্যালয়ে তোমার শিক্ষক হলেন তোমার বিষয়ী, তুমি হলে তার বিষয় কেননা তুমি সবসময়

ভাব যে, তোমার স্কুলশিক্ষক তোমার সবকিছু দেখছেন। আবার স্কুলশিক্ষক ভাবেন যে স্কুল পরিদর্শক সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন, নজরে রাখছেন। তাই স্কুল পরিদর্শক সেক্ষেত্রে বিষয়ী আর শিক্ষক হলেন বিষয়। আবার স্কুল পরিদর্শক জানেন যে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা সব কিছু দেখছেন। সেক্ষেত্রে তিনি হয়ে গেলেন বিষয়ী আর স্কুল পরিদর্শক হলেন তাঁর বিষয়। এইভাবে চলতে চলতে দেখা যাবে চরম স্তরে পরম বিষয়ীসত্তা (Supreme subjectivity) একজন আছেন। কে তিনি? তিনি হলেন পরমপুরুষ। পরমপুরুষই হলেন সব সত্তার সারসত্তা, সব বিষয়ের পরম বিষয়ী (Supreme subject)। রাজার রাজা সেই পরমবিষয়ী সত্তাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু তার পানে অগ্রসর হতে গেলে বৈষয়িক জগতে সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলতে হবে।

এইভাবে চলতে চলতে মানুষ একদিন Supreme Subjective Proposition বা পরমপদ প্রাপ্ত হবে। প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ গতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে সেই পরমাগতির পানে। বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে এ এক নোতুনভাবে প্রতিপাদিত বিচারধারা। আমরা একে বলতে পারি – Supreme Synthetic Subjective Proposition পরম সংশ্লেষণাত্মক বিষয়ীগত বিচারধারা বা প্রতিপাদন।

সূচীপত্র

Spiritual dialectics বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ববাদের ধারণাটাই অবাস্তব ও ভ্রান্ত। আমাদের দর্শনে এর কোন স্থান নেই। তোমরা Supreme Synthetic Subjective Proposition-এর বদলে Supreme Synthetic Subjective Appropriation শব্দগুলিও ব্যবহার করতে পার।

ধনতন্ত্র ও কম্যুনিজম দুইই মানুষের যথোপযুক্ত আদর্শগত অণুপ্রেরণা দিতে বা দিশানির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে এই দু'টি ব্যবস্থাকেই বর্জন করতে হবে। প্রাউট ধনতান্ত্রিক শোষণ, ও কম্যুনিষ্ট ডগমা বা ভাবজড়তা - দুই–এরই বিরুদ্ধাচরণ করে। কেননা এরা মানুষের সার্বিক প্রগতির পরিপন্থী।

তুমি পরমপুরুষকে সর্বোচ্চ লক্ষ্য রেখে সব রকমের শোষণ, নীচতা ও তথাকথিত secularism-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে এগিয়ে চলবে। তবেই তুমি বৈষয়িক ক্ষেত্রে উপযুক্ত সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবে।

কেউ কেউ বলে থাকে অসাম্যই প্রকৃতির বিধান—সেজন্যে একের সঙ্গে অন্যের, ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের পার্থক্য থাকবেই ইত্যাদি... ইত্যাদি। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। বরঞ্চ এ কথা বলাই সঙ্গত যে বৈচিত্র্যই ঈশ্বরের বিধান।

সকলের এটা মনে রাখা উচাৎ যে প্রকৃতির জগতে সাম্যের (identicality) কোন স্থান নেই। কোন স্থান নেই। কেননা প্রকৃতি তা সমর্থন করে না। যখনই কোথায় এই সাম্যের সৃষ্টি হয় সেখানেই জড়স্ফোট বা সংরচনাগত বিস্ফোরণ (structural explosion) বা বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর সমগ্র সংরচনাই তখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। তাই বৈচিত্র্যই জগতের বিধান, সাম্য নয়। বৈচিত্র্য আর অসাম্যকে এক ভাবলে চলবে না। ভেদ-বিভেদের মাধ্যমে অসাম্য শোষণকে উৎসাহিত করে, অপরদিকে বৈচিত্র্য স্বীকৃতি দেয় বহুত্বকে, আর তারই মাঝে বিচ্ছুরিত হয় ঐক্যের দ্যুতি।

যা সংশ্লেষণাত্মক, যা পূর্ণ, তাই মানুষকে যথার্থ অনুপ্রেরণা দিতে পারে। মনে রাখতে হবে যে জাগতিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোন কিছু লুকিয়ে করা যায় না। সেই পরম বিষয়ীসত্তার কাছে কোন কিছু গোপন রাখা বা চেপে রাখার জো নেই।

এই সত্য পূর্ব দিগন্তে নবোদিত অরুণরাঙ্গা সূর্যের মতই প্রোজ্জ্বল, মহিমময় ও আকর্ষণীয়। যখন আমাদের চোখমুখ সেই অরুণিমাতেই উদ্ভাসিত তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে দিনটা আমাদের। জয় আমাদের হবেই।

১৪ আগষ্ট ১৯৮৮, কলিকাতা

সূচীপত্র

ইজম্ ও মানবপ্রগতি

ইজম্ (মতবাদ) কথাটার অর্থ কী? যখন জাগতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে [কোনো বিষয়কে নিয়ে] দেশ–কাল–পাত্রের মধ্যে সমান্তরলতা স্থাপিত হয় তখনই ইজমের জন্ম হয়। এই সমান্তরলতা না থাকার কারণে কোনো দেশ বা কোনো জনগোষ্ঠীর কাছে একটি নির্দিষ্ট ইজম্ অনুকূল হলেও তা সর্বকালে সব মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয় না।

এই বিশ্বে কোন কিছুই স্থির নয়, সব কিছুই চলছে, এগিয়ে চলেছে। নির্দিষ্ট দেশ–কাল–পাত্রের পরিভূতে বিভিন্ন পরিবর্তনশীল তত্ত্বসমূহের মধ্যে কোন একটি তত্ত্ব আমাদের কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। আপেক্ষিকতার স্বভাবযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা এই ধরনের তত্ত্বকে সত্য বলে মনে করি। জড়–জাগতিক ক্ষেত্রে গতি ও অগতি দু'টিই ভূমা মনের সৃষ্টির এষণা–সঞ্জাত, যদিও পরিদৃশ্যমান বিশ্বে চরম অগতি বা স্থিরতা বলে কোনো কিছুই থাকতে পারে না। যদি স্থির বা গতিহীন বলে কিছু থাকে মনে করি তবে তার অর্থ হবে ভূমামনের কল্পনাধারার গতিরোধ হওয়া – যা সৃষ্টির

মূলতত্ত্বের বিরোধী। সেক্ষেত্রে সেটাই হবে চরম অগতির অবস্থা যা অসম্ভব। সব কিছুর মধ্যেই গতিশীলতা রয়েছে ও তা বহুধাপ্রবাহিত। গতি যে কোনো দিকেই প্রধাবিত হতে পারে, ভূমা মনের ইচ্ছায় এই বিশ্ব যে কোনো দিকে সম্প্রসারিত হতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ভূমা মনের কল্পনাধারা স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে না, কেননা ভূমা মনে স্থির বলে কিছু নেই।

গতি সর্বদাই দেশ–কাল–পাত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই কোন বিশেষ দেশ–কাল– পাত্রের পরিধিতে উদ্ভূত যে গতি তা অন্য দেশ–কাল–পাত্রের গতিশীলতার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হতে পারে না। কোন বিশেষ স্থানে ও কালে, বিশেষ আধারে সৃষ্ট গতি যখন নির্দিষ্ট জাগতিক–মানসিক তরঙ্গের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যায় তখনই ইজমের জন্ম হয়। তাই যে বিশেষ দেশ–কাল–পাত্রের পরিধিতে একটি ইজম্ স্বীকৃত হয়েছিল তা যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে সংশ্লিষ্ট জাগতিক অথবা মানসিক তরঙ্গ বা দুই–এরই পরিবর্তনের দরুণ সেই ইজম্ তার যথার্থতা হারিয়ে ফেলে। যে বিশেষ মানসিক অবস্থায় একটা ইজম্ গ্রহণীয় হয়, তৎসংক্রান্ত জাগতিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলে মানসিক তরঙ্গ আর তার সঙ্গে সমান্তরলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয় না। ফলস্বরূপ, সেই নির্দিষ্ট ইজম্ বাতিল বলে' গণ্য হয়। দু'হাজার বছরের

পুরোনো কোন রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা ধর্মীয় সম্প্রদায়গত মতবাদ (বা অতীতের বিশেষ দেশ–কাল–পাত্রের ভিত্তিতে সৃষ্ট ইজম্ বা তত্ত্ব) যদি কেউ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে তা নিয়ে যত রকমের সেন্টিমেন্ট, মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি বা প্রচারের যত সূক্ষ্ম কলা কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হোক না কেন, বর্তমানের জাগতিক অবস্থার সঙ্গে সেটা আর কোনমতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে না।

পুরোনো কালের মানসিক পরিবেশ যদি কোনভাবে ফিরিয়ে আনা যায়ও তবুও ইজম্ তথা জাগতিক তরঙ্গের মধ্যে সমান্তরলতা আর পুনঃস্থাপিত হতে পারবে না। আবার শুধু জাগতিক তরঙ্গই বলি কেন, আমরা দেখি যে মানসিক তরঙ্গও পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে যত বিজ্ঞানসম্মত প্রয়াসই হোক না কেন, অতীতের মানসিক তরঙ্গকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। একটা সময় ছিল যখন রাজা ঈশ্বর হিসেবে পূজিত হতেন। কিন্তু আজকের দিনে সেই বস্তা–পচা তত্ত্ব কেউ যদি পুনঃ প্রবর্তন করতে চায় তাহলে সে উন্নত মানসিক পদ্ধতির সাহায্যে তা নিয়ে হাজার প্রচার করলেও মানুষ তা কখনই মেনে নেবে না।

যে কোন গতি বিকশিত হয় [সংকোচ–বিকাশাত্মক] তরঙ্গের মাধ্যমে। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গকে যদি অত্যধিক বাড়িয়ে দেওয়া হয় যার ফলে

তত্পরবর্তী আরোহণ স্তর (crest) আর প্রায় অনুভূত হয় না, তাহলে আমরা দ্রুত সঙ্কোচ–বিকাশমুখী গতিধারা [যাতে বক্রতা বেশী। পাই। মানসিক বা জাগতিক তরঙ্গের গতিকে যদি সত্যিকারের বাড়াতে হয় তাহলে প্রয়োজন হচ্ছে তাকে সরলরেখাকার অবস্থায় নিয়ে আসা। কিন্তু যদি এই সরলরেখাভিমুখী গতি (straightness of movement) তার চরম সীমায় পৌঁছে যায় তাহলে সেটাও এক ধরনের অগতিরই নামান্তর। যাই হোক, সঙ্কোচ–বিকাশাত্মক গতিতে দ্রুতি (velocity বা acceleration) কীভাবে কতখানি বাড়ানো যায় তা নির্ভর করে তরঙ্গের বক্রতার (curvature) ওপর যার ভিত্তিতে আমরা গতিধারার speed- pause-এর তারতম্য বা সরলরৈখিক অবস্থানকে নির্ধারণ করতে পারি।

দেখা যাবে তারঙ্গিক বক্রতার তারতম্য অনুযায়ী [সঙ্কোচন–প্রসারণের সংখ্যা] গতিবেগ (speed) বিপরীতভাবে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ যখন গতিবেগ বাড়ে [contraction বা সঙ্কোচন তথা বক্রতা বাড়ে], দ্রুতি অর্থাৎ velocity কমে যায়, কিন্তু বক্রতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে গতিধারা যত সরলরৈখিক হয় তত তাতে দ্রুতি বেড়ে যায়। তাই মানসিক তরঙ্গের দ্রুতির অবস্থায় ইজম্ বা কুসংস্কার বাসা বাঁধতে পারে না। বরং মানস–সংবেগের সঙ্কোচনের অবস্থাতেই এই ইজম্ বা কুসংস্কার অনুপ্রবিষ্ট হয়। কোন স্থিতাবস্থাকে আঁকড়ে থাকা

খুবই সহজ কিন্তু যেখানে গতির অস্তিত্ব আছে সেখানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। তাই কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে গেলে মানুষকে অনবরত এগিয়ে চলতে হবে, না হলে প্রগতি সম্ভব হবে না। এই জন্যে উচিত হচ্ছে মনের গতিবেগ (দ্রুতি) নিরন্তর বাড়িয়ে চলা।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে শহরের মানুষদের তুলনামূলক ভাবে বেশী মানসিক সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয় বলে তাদের মধ্যে হয় কুসংস্কার একেবারেই থাকে না বা অন্যদের থেকে কম থাকে। তাই তারা বৌদ্ধিক দিক থেকে অধিক সজাগ। যেখানে গতিহীনতা সেখানে কুসংস্কার মনের গভীরে ঢুকে যায়, কিন্তু যারা বিজ্ঞানমনস্ক তাদের মনে কুসংস্কারের সূচীকাভরণ করে' দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। এর কারণ হচ্ছে তারা জীবনে অধিকতর দ্রুতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

গতির সঙ্কোচাত্মক (contraction) আর বিকাশাত্মক (expansion) অবস্থার মধ্যে সত্ত্ব–রজ–তম এই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি সমভাবে ক্রিয়াশীল। তরঙ্গের উহাভিমুখী গতি (ascent) রজ প্রধান। আর অবোহ (descent) তম প্রধান। বিকাশাত্মক ও সঙ্কোচাত্মক অবস্থার সর্বোচ্চ স্তর যথাক্রমে সত্ত্ব ও তমগুণ প্রধান। উহ–অবোহের এই দুই শীর্ষাবস্থায় ফলশ্রুতি কিন্তু একই। বস্তুতঃ সত্ত্বপ্রধান বিরামাবস্থা (sentient pause) কোন বিরতিই নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বাইরে থাকার জন্যে এখানে

চরমগতি বিরতি বলে প্রতীয়মান হয়। বিকাশাত্মক গতি সাত্ত্বিকতার পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল। তাই এটি বিদ্যাশক্তি (knowledge) দ্বারা প্রভাবিত। অনুরূপভাবে সঙ্কোচাত্মক গতি অবিদ্যা দ্বারা (ignorance) প্রভাবিত আর এর চরমাবস্থা তামসিকতার শেষ বিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সঙ্কোচাত্মক চরমাবস্থা বা আপাত বিরামাবস্থা (apparent pause) অভিব্যক্ত হয় অষ্টপাশ অর্থাৎ আটটি মানসিক বন্ধনের মাধ্যমে–এরা হ'ল ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কূল, মান, শীল। মনের তমভাবাত্মক অবস্থা থেকে এই অষ্টপাশের উৎপত্তি; তাই মন ক্রমশঃ এদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই আটটি বন্ধনই কুসংস্কার আর ইজম্কে প্রাণরস যুগিয়ে চলে। যত রকমের ইজম্ আছে যেমন জাতীয়তাবাদ, জাতিবাদ, প্রাদেশিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, তারা সবই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে আর মনুষ্যত্বের অবমূল্যায়ন ঘটাতে থাকে। এই আটটি ৰন্ধন মানুষের মনের সূক্ষ্ম স্তরে অনৈক্য আর অবিশ্বাসের বীজ বপন করে' দেয় যদিও তা সব সময় বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে হয়তো প্রকাশিত হয় না।

ইজমের কারণে মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক বিপর্যস্ত হয়। একজন তথাকথিত হিন্দু মুসলমানকে বিশ্বাস করে না, তেমনি

একজন তথাকথিত মুসলমান হিন্দুকে বিশ্বাস করে না কেননা তারা দু'জনেই নিজ নিজ ইজমে পরম বিশ্বাসী। ইজমের সঙ্গে লজ্জাবোধের (shamefulness) ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। যখনই কোন একটি জাতি বা শ্রেণী বা প্রদেশ বা গোষ্ঠী তাদের আত্ম সম্মান খোয়াবার আশঙ্কা করে, তখনই তারা লজ্জাবোধের দ্বারা প্রেষিত হয়ে তাদের আত্ম সম্মান বাঁচানোর জন্যে যে কোন নীচ কাজ করতে পিছপা হয় না। ইজমের সম্মান রক্ষার খাতিরে অনেকে আবার নানারকম কৃত্রিম ও লোক দেখানো আচার আচরণের আশ্রয় নেয়, যদিও তাদের মনের ভিতরে তখন অন্য ধরনের ভাবনা কাজ করে। ইজম্ মানুষের বুদ্ধিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে' দেয় যে, যুক্তি–বিচারের কাছে একজন ইজম্–বিশ্বাসী পরাজিত হলেও সেই পরাজয় সে স্বীকার করতে চায় না। তাই মানুষকে তার মনের ভিতর থেকে ইজমের নাগপাশকে উৎপাটিত করতে হবে।

জুগুপ্সা বা কপটতা এমন একটি পাশ যে তার কবলে পড়ে মানুষ নিজের অন্তরের ভাবনাকে বাইরে প্রকাশিত হতে দেয় না। একজন ধর্মমতাবলম্বীর যদি মনে প্রবল ইচ্ছা জাগে মাছ–মাংস খাবার তাহলে সে তার ইজমের সম্মান রক্ষার খাতিরেই মনের সেই ইচ্ছাকে জোর করে' দাবিয়ে রাখে। এই জন্যে সে বাইরে হাবেভাবে দেখানোর চেষ্টা করে যে মাংসের

প্রতি তার বিন্দুমাত্র দুর্বলতা নেই। কূলগৌরবের সঙ্গেও ইজমের সম্পর্ক আছে। ব্রাহ্মণ, সৈয়দ, পাঠানদের জাত্যাভিমানের বহিঃপ্রকাশ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শীল–এর ব্যাপারেও একই কথা, অর্থাৎ নিজের কালচার সম্পর্কে মহামন্যতাৰোধ (superiorty complex) ইজমের থেকেই জন্ম নেয়। যদিও মানুষের সংস্কৃতি এক ও অবিভাজ্য তবু ইজমের অনুসরণকারীরা সেকথা বুঝতে চায় না। ইজমের অনুসরণকারীরা নিজেদের ভাষা, আদব–কায়দা, অভ্যাস, বিভিন্ন অভিব্যক্তির স্থানিক বিভিন্নতা এগুলি প্রকৃত পক্ষে সামগ্রিকভাবে মানব সংস্কৃতিরই অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি সম্পর্কে শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস নিয়ে থাকতেই বেশী পছন্দ করে। রাজনৈতিক ইজমের ধ্বজাধারীরা আবার ইজমের স্বার্থে জঘন্য কাজ করতেও দ্বিধা করে' না। মধ্যযুগে এইভাবে সম্প্রদায়বাদ মানবতাকে পথের ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। লজ্জার কথা যে এই বিংশ শতাব্দীতেও অনেকে সেই মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতার জিগির চাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট। আবার যারা মুখে বড় বড় কথা বলতে অভ্যস্ত তারা নিজেদের ইজমের স্বার্থে অসামাজিক তত্ত্বের সঙ্গেও মিতালি পাতাতে দ্বিধা করে' না। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে তারা সকলেই তামসিক শক্তির কবলে পড়ে প্রমাদগ্রস্ত।

তাহলে মানুষের কর্তব্য কী? শারীরিক অস্তিত্ব সীমিত কেন না তা পঞ্চভূত দিয়ে তৈরী। শরীরের অসংখ্য প্রোটোপ্লাজমিক কোষের প্রতিমুহূর্তে জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে। তাই এই দেহ কোন স্থায়ী আধার হতে পারে না। এই জড় জগতের অস্তিত্বও আপেক্ষিক। মানুষের কাছে একমাত্র পরমসত্য হলেন পরমপুরুষ। কিন্তু মানুষকে এই জাগতিকতার সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করেই সেই পথে চলতে হবে। স্থূল জাগতিক সুখভোগই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। যদি সেটাই লক্ষ্য হয় তবে তা মানবীয় মূল্যবোধকে ব্যাহত করবেই। তেমনি উল্কা বা ধূমকেতুকে কেউ জীবনের লক্ষ্য বলে গণ্য করতে পারে না। যদি কেউ ভুলবশতঃ তা করেও তবে তার জানা উচিত যে উল্কা বা ধূমকেতু মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর নাগালের বাইরে চলে যাবে কেননা তার আপেক্ষিক গতি পৃথিবীর গতির থেকে অনেক গুণ বেশী। এর অর্থ সেই অবস্থায় তা আর লক্ষ্য থাকতে পারবে না। যদি কেউ তোমাকে দেখায় যে গোরু যে দিকটায় চরছে সেটা অবশ্যই উত্তর দিক, তাহলে কী হবে যদি গোরুগুলো ইতোমধ্যে ঘাস খেতে খেতে পূর্বদিকে চলে গিয়ে থাকে? তখন কি পূর্বদিককেই উত্তর বলে মেনে নিতে হবে? তাই কোন পরিবর্তনশীল সত্তাকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্বীকার করা যায় না। উত্তর দিকটা কোন দিকে তা নির্দিষ্ট ভাবে জানতে হলে ধ্রুবতারার

অবস্থানকে জানতে হবে। কেন না ধ্রুবতারা যদিও স্থান পরিবর্তন করে তবুও পৃথিবী থেকে তাকে সবসময় উত্তর দিকেই দেখা যায়।

তাই কোন পরিবর্তনশীল তত্ত্ব জীবনের আদর্শ হতে পারে না, কেন না তা দেশ- কাল-পাত্রের আপেক্ষিকতায় আৰদ্ধ। সুতরাং মানুষের জীবনের চরম ও পরম আদর্শ হবে তাইই যা সর্বব্যাপক ও দেশ-কাল-পাত্রের অধিক্ষেত্রের বাইরে। তিনি রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মত সাধারণ বৈয়ষ্টিক সত্তা নন। তিনি হলেন পরম বিষয়ী সত্তা। যদি মানুষ এই পরম তত্ত্বকে তার ধ্যেয়-জ্ঞেয় করে' নিতে পারে তবেই অবনমনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে পারবে। অনির্দিষ্ট কাল ধরে' কোন একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক থিয়োরী (ইজম্) মানুষের মঙ্গল করতে পারে না, কেননা একই পরিধিতে অথচ ভিন্নতর কালে বা পাত্রে অন্য একটি ইজম্ তার বিরোধী তত্ত্ব হিসেবে এসে যায়। তা ছাড়া এটা ভাবা সঙ্গত হবে না যে, একটি ইজম্ কোন দেশে এক সময় যে রকম প্রভাবশালী ছিল পরবর্তী সময়ে সেই দেশে তা একই ভাবে অনুসৃত হবে। তাই ইজম্ কখনও মানুষের আদর্শ (Ideology) হতে পারে না। অণুমনও পরিবর্ত্তনীয় সত্তা তাই অণুমনও মানুষের উদ্দিষ্ট বিষয় হতে পারে না। এটা নিশ্চিত

যে পরমচৈতন্য সত্তা ছাড়া অন্য যে কোন সত্তাকে জীবনের ধ্যেয় হিসেবে গ্রহণ করলে ইজমেরই প্রতিষ্ঠা হবে।

অনেকেই মাতৃভূমিকে দেবী জ্ঞানে পূজো করে', এমন কী তার মূর্তিও তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু এটা সকলেরই বোঝা উচিত যে মাতৃভূমির সেবা করাটাও চরম তথা পরম লক্ষ্য হতে পারে না, কারণ মাতৃভূমির ধারণাটাই পরিবর্তনশীল। আজকের মাতৃভূমি একদিন জলের তলায় তলিয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাগৈতিহাসিক যুগের গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড আজকের ভারত মহাসাগরে পরিণত হয়েছে। তাই কোন একটি দেশ, রাজ্য বা জেলার ভৌগোলিক পরিসীমা নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়াটা বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়, তাতে সমগ্র মানব সমাজেরই শান্তি বিঘ্নিত হয়। এই ধরনের ভৌগোলিক সীমাসংক্রান্ত বিরোধ নিজেদের মধ্যে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অধিবাসীরা ভালভাবেই মিটিয়ে নিতে পারবে। তাই প্রকৃত মানবিক প্রয়াসই হবে পরম আদর্শের প্রাপ্তি। পরমসত্তাই জীবনের সত্যিকারের আদর্শ বা লক্ষ্য।

ব্রহ্মসাধনাকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার ভাবনা নিয়েই দেশসেবা করা উচিত। যে দেশে যে মানুষেরা বসবাস করছে সেই দেশের সেবা তো অবশ্যই করতে হবে, কেন না সেই দেশের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। আর সেই সূত্রে

সেখানকার মানুষের জন্যে সর্বাধিক সেবা করার অমূল্য সুযোগ তারা পেয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে নিজের মাতৃভূমিরই শুধু সেবা করতে হবে, অন্য দেশের নয়। কেউ যদি অন্য দেশে যায় তবে সে সেই দেশের সেবার মাধ্যমেও সামগ্রিক ভাবে আগের চেয়ে অধিক সেবা করার সুযোগ পেয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে আমি আবার বলছি যে, ব্রহ্মভাবনাই প্রকৃত আদর্শ, আর মানবতার সেবা ব্রহ্মসাধনারই একটা অংশ।

তাই আমার সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে কোন ইজমই মানবতার ত্রাতা হতে পারে না। বিজ্ঞ লোকেরা পরমসত্তাকে একমাত্র আদর্শ মেনে নিয়ে দেশ–কাল–পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করতে করতে এগিয়ে চলেন। তাঁরা সর্বদা এটাই মনে রাখেন

যে "পরমপুরুষ আমার পিতা, পরমা প্রকৃতি আমার মাতা আর সমগ্র বিশ্ব আমার দেশ"। যে দেশে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেই দেশকে ভালবাসা বা সেই দেশের জন্যে গর্ব বোধ করা অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু ইজমের বশীভূত হয়ে অন্য দেশের প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণজাত দেশপ্রেম অবশ্যই ক্ষতিকর।

পরম চৈতন্যই হচ্ছেন পরম বিষয়ী সত্তা (fundamental subjectivity) | তিনি মানুষের মনের বিষয় (object) হতে পারেন না। তিনি সমস্ত বহুত্বের মধ্যে এককতম, সব সমূহের

এক 'সমূহ'। পরমপুরুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অর্থ হ'ল নিজেকে তাঁর বিষয়ে (object) পরিণত করা, নিজের বিষয়ী ভাবকে (unit subjectivity) তাঁর পরম বিষয়ীভাবে সর্মপণ করে' দেওয়া। এই পথে চলতে গেলে প্রথমে নিজের পঞ্চভূতাত্মক অস্তিত্বকে মিলিয়ে দিতে হবে বিষয় মনের সঙ্গে (objective mind)। তারপর বিষয় মনকে নিজের বিষয়ী মনে (unit subjective mind) মিলিয়ে দিতে হবে, আর সেই বিষয়ী মনকে সমাহিত করে' দিতে হবে পরম চৈতন্য সত্তায়।

ইজমের সমর্থকেরা সর্বব্যাপক ও অনাদি–অনন্ত ভূমাচৈতন্য সত্তায় বিশ্বাস করে না। সেই দিক দিয়ে তারাও প্রকৃত ধর্মভাবনার বিরোধী। নিজেদের অজ্ঞতার কারণেই তারা এরকম করে' থাকে। তারা বোঝে না যে, এই বিশ্ব সেই চৈতন্য সত্তারই স্থূল বিকাশ। উত্তর প্রদেশ, লক্ষ্ণৌ, তথাকথিত অস্পৃশ্য বা চণ্ডাল, পিপীলিকা বা মানুষ সবই তাঁর এক একটি রূপ। ইজমে বিশ্বাসীরা সঙ্কীর্ণ মানসিকতার বশবর্তী হয়ে নিজেদেরকে ঈশ্বরের বরপুত্র মনে করে, কিন্তু অন্যদের অনার্য, কাফের বা নাস্তিক প্রতিপন্ন করতে দ্বিধা করে না। তারা ভাবে বিশ্বপিতা শুধু তাদের ওপরই কৃপা বর্ষণ করে' চলেছেন, সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি অস্তিত্ব যেন তাঁর কৃপাধন্য নয়। তারা এটা বুঝতে চায় না যে, তথাকথিত অনার্য, ম্লেচ্ছ বা

অসভ্য– বর্বর বলে' যাদের ঘৃণা করছি তারা প্রত্যেকেই পরমপুরুষের সন্তান।

পরমপুরুষকে যারা নিজেদের অভীষ্ট বলে' স্বীকার করে' নিয়েছে তাদের কাছে এই বিশ্বের সবকিছু তাঁরই বিকাশ। তারা জানে যে, সমস্ত মানুষকে নিজের ভাই– বোন বলে স্বীকার না করে নিলে বিশ্বপিতাকেই অবজ্ঞা করা হয়। আর বিশ্বপরিবারের যিনি প্রধান সেই পরমপিতাকে অসম্মান করা হলে পারিবারিক সৌহার্দ্য বজায় থাকতে পারে না। তাই পরমচৈতন্য সত্তাকে পুরোপুরি স্বীকার কারে নেওয়ার আগে মানুষকে প্রথমে বিশ্বজনীন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতেই হবে।

লক্ষ্ণৌ, ১৯৬৮

উদ্ভিদ, পশু ও মানব

প্রাচীন কালের দার্শনিকরা বলতেন, মানুষ এক বিচারশীল জীব (Man is a rational animal)। মানুষ ও পশুর মধ্যে তফাৎ এতটুকুই যে মানুষের মধ্যে বিচারক্ষমতা রয়েছে, বিবেচনা–শক্তি রয়েছে, পশুর তা নেই। মানুষ বিচারশীল প্রাণী–কথাটা ঠিক, তবে পশুর মধ্যে বিচারশক্তি একেবারে

নেই একথা বলতে পারি না। তোমরা লক্ষ্য করবে, গৃহপালিত কুকুরের মধ্যেও কিছুটা বিচারশক্তি অবশ্যই রয়েছে, শুধু সহজাত সংস্কারের (instinct) বশবর্তী হয়েই সে কাজ করে তা তো নয়। মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার দরুণ কুকুর বেশ কিছুটা শিখে ফেলে। কোথায় কী করতে হবে এই সাধারণ জ্ঞানটা তার এসে যায়। এটাও এক ধরনের বিচারশীলতা। এই কারণেই, মানুষ বিচারশীল জীব এমন বলাটা ঠিক হবে না। এ ধরনের উক্তিতে মানুষের প্রতি সুবিচার করা হয় না। কিন্তু অতীতের দার্শনিকরা এই রকমই বলতেন।

এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন হ'ল–তাহলে উদ্ভিদ ও পশুর মধ্যে মূল পার্থক্যটা কোথায়? উদ্ভিদ হ'ল মূলতঃ স্থাবর, পশু হ'ল জঙ্গম। উদ্ভিদের প্রজ্ঞার বিকাশ হতে হতে এমন একটা পর্যায় আসে, এমন একটা বিন্দু আসে যাকে বলতে পারি উদ্ভিদের চরম উৎকর্ষ–বিন্দু, কিন্তু পশুর পক্ষে সেটা হ'ল সর্বনিম্ন বিন্দু, অর্থাৎ যেখান থেকে পশুর উন্নতি শুরু হ'ল। আমাদের চেনা–জানা এমন কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যারা শিকার ধরে' তাদের মেরে ফেলে, যারা তাদের শাখা–প্রশাখাকে প্রসারিত করে' তাদের নিকটবর্তী শিকার ধরে, ও তাদের খেয়ে ফেলে। এমন কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যাদের আচার–আচরণ অনেকটা পশুর আচরণের সঙ্গে মেলে। কিছু উদ্ভিদের আবার ফুল

ফোটে, আর সেই ফুলের মধ্যে মধুর মতো এক ধরনের রস থাকে। এই রস পান করার জন্যে কত শত কীট পতঙ্গ আসে ও ফুলে মুখ ঢুকিয়ে সেই রস পান করে' নেয়। এর পরেই ফুলের মুখের দিকটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসে। তারপর সেই কীট বা পতঙ্গটাকে ধরে' চুষে খেয়ে ফেলে। এ ধরনের ফুলকে তো সাধারণ উদ্ভিদ বলতে পারি না কারণ এদের আচরণ, কার্যকলাপ তো অনেকাংশে পশুর মতো। কেবল চলমান নয় এতটুকুই যা তফাৎ।

কিছু আগাছা (weeds) বা ঘাস বা জলজ উদ্ভিদ রয়েছে যাদের চলমানতা গুণটাও রয়েছে। সমুদ্রে স্থান থেকে স্থানান্তরে ওরা ভাসতে থাকে ও ভাসতে ভাসতে ওরা এমন এক জায়গায় থেমে যায় যেখানে ওরা সবচেয়ে অধিক খাবার পেয়ে যায়। তাই ওদের স্থাবর না বলে জঙ্গম বলাটাই শ্রেয়। "জলকুম্ভী” নামক জলজ উদ্ভিদটা এই ধরনের জিনিস। তোমরা হয়তো জান যে এই (কচুরীপানা) উদ্ভিদটা জলেই জন্মায়, পালং শাকের মত বড় বড় পাতা, প্রায় সারা ভারতবর্ষে এটা ছড়িয়ে পড়েছে। এটাকে আধা–জঙ্গম তো অবশ্যই বলা যেতে পারে। আজ থেকে প্রায় আশি সাল আগে ঢাকার তৎকালীন কমিশনার একবার দক্ষিণ আমেরিকা বেড়াতে গিয়ে সেখানে একটা বড় পুকুরে কিছু নীল ফুল দেখতে পান। মিসেস্ লী ফুলগুলি দেখে খুবই খুশী হন। তিনি

কিছু চারা নিয়ে এসে তাঁর সরকারী বাসভবনের চারপাশে লাগিয়ে দেন। সেখান থেকে সারা ভারতে এই উদ্ভিদ ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধরনের ভ্রাম্যমাণ উদ্ভিদকে জঙ্গম বলাই তো সমীচীন। হিন্দিতে এই উদ্ভিদকে কোথাও শোষ বলে, কোথাও জলকুন্তী বলে। এইভাবে উন্নতির পথে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে উদ্ভিদ জীবনের সমাপ্তি ঘটে, তারপর শুরু হয় জীবজন্তুর জীবন। জীবজন্তুর মধ্যেও প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটতে ঘটতে এমন এক বিন্দুতে এসে পৌঁছায় যাকে বলতে পারি পশু ভাবের শেষ বিন্দু আর মানব ভাবের প্রারম্ভিক বিন্দু। ইতিহাসের গবেষণা করেও মানুষ আজও ঠিক সেই প্রত্যন্ত বিন্দুটাকে খুঁজে পায়নি, যে প্রত্যন্ত বিন্দু হ'ল পশু ভাবের পরিসমাপ্তি আর মানব ভাবের সূত্রপাত। অবশ্য গবেষণা করতে করতে একদিন মানুষ সেই বিন্দুর খোঁজ পেয়ে যাবে। ওই missing link-টা একদিন সে পেয়েই যাবে। সেই অজানা সূত্রটা জানা হয়ে গেলে genetic-এর ক্ষেত্রে এক বড় রকমের পরিবর্তন এসে যাবে। আর সেই পরিবর্তনের দরুণ চিকিৎসা জগতেও এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে যাবে।

মানুষ ও পশুর মধ্যে আর একটা বড় পার্থক্য হ'ল মানুষ অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু, মানুষ সবকিছু জানতে চায়, বুঝতে চায়, শিখতে চায়। কথাটা তো ঠিক। তোমরা উদ্ভিদ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ দেখাতে গিয়ে একথা তো বলবে না যে

পশু হ'ল চলমান উদ্ভিদ (Animal is a moving plant)- না, তা বলতে পারি না। তেমনি মানুষকেও বিবেকশীল পশু বলতে পারি না। মানুষ মানুষই, তাই মানুষকে বিবেকশীল পশু বলে' তার মানুষ ভাবের ওপর আঘাত দেবে কেন? আর আজ যে মানুষ হয়ে জন্মালো, এমন কী যে মানুষটা আজ পাপ কর্মে লিপ্ত রয়েছে সেও ক্রমাগত অভ্যাসের অনুবর্তন করতে করতে একদিন ভাল মানুষ হবে, মহাপুরুষে পরিণত হবে। তাই মানুষ বিচারশীল জন্তু একথা কেন বলবো? কাজেই মানুষ সম্বন্ধে প্রাচীন দার্শনিকদের অভিমত যুক্তিসম্মত নয় বলে আমরা তা' মানতে পারি না।

শুধু বিচারশীলতাই মানুষের একমাত্র বৈশিষ্ট্য তা তো নয়। উদ্ভিদ, পশু ও মানুষের মধ্যে কতকগুলো গুণ অবশ্যই আছে যেগুলো আমরা প্রাণধর্ম ও জীবনধর্ম নামে অভিহিত করতে পারি।

প্রাণধর্মের চেয়ে জীবন ধর্ম শব্দটা অধিক অর্থবহ। যেমন অন্ন–জলের ওপর নির্ভরশীল দেহের পক্ষে অকর্মন্যতা, অক্ষমতা, মৃত্যু, বিশ্রাম, প্রজনন, বৃদ্ধি, প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষার তাগিদ এইসব সাধারণ গুণ উদ্ভিদ, পশু ও মানুষ তিনেতেই সমানভাবে রয়েছে। কারণ এগুলো হ'ল জৈব ধর্ম। যেখানে জীবন সেখানে এই গুণগুলো রয়েছে। উদ্ভিদে এর অতিরিক্ত কয়েকটি গুণ রয়েছে। যেমন মাটির নীচে থেকে

প্রাণ রস আহরণ করা –যা মানুষ করতে পারে না, পশুও পারে না। কিন্তু উদ্ভিদ মাটির নীচে থেকে এই ধরনের খাদ্যরস সংগ্রহ করে' থাকে। এমন কী হাওয়া থেকেও সে খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার হাওয়াতেই কিছুটা খাদ্য ছেড়ে দেয়। উদ্ভিদরা এই ধরনের কাজ করে, পশু ও মানুষেরাও এ ধরনের কাজ করে' থাকে, তবে অতটা নয়। আমরা এর নাম দিতে পারি উদ্ভিদ ধর্ম। উদ্ভিদের পক্ষে এটাই বৈশিষ্ট্য। তারপর আর একটা উদ্ভিদ ধর্ম হ'ল পা দিয়ে পান করা। যার জন্যে বৃক্ষকে সংস্কৃতে বলে 'পাদপ'। উদ্ভিদ মানে যা মাটি ভেদ করে' ওপর দিকে ওঠে। মহীরুহ মানে যা মাটির থেকে ওপরের দিকে ওঠে।

ঠিক তেমনি পশু জগতে কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। তার ভিত্তিতেই শ্রেণী বিভাজন করা হয়ে থাকে। কিছু জীব হ'ল মাংসাহারী, কিছু জীব নিরামিষাশী। মাংসাশী যারা তারা মাছ–মাংস–ডিম খায়। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মাংস কাটবার জন্যে বিশেষ ধরনের দাঁতের প্রয়োজন হয় যাকে বলি শ্বাদন্ত (canine teeth)। বিড়াল, কুকুর, বাঘ, সিংহ–এরা সব মাংসাশী জন্তু তাই এদের শ্বাদন্ত রয়েছে। আর গোরু, বানর, চমরী, হাতী–এদের শ্বাদন্ত নেই অর্থাৎ প্রকৃতির ইচ্ছা নয় যে এরা মাংসাহার করে। কিন্তু লোভী মানুষ কী করে? শ্বাদন্ত না থাকা সত্ত্বেও সে সেদ্ধ করে' বা অন্য কোনও

উপায়ে মাংস খেতে প্রবৃত্ত হয়। এটা লোভের বশে খাওয়া। প্রকৃতির নিয়মানুসারে মানুষ মাংসাশী নয়। মাংসাহারী মানুষের কত শত রোগ হয়ে থাকে। নিরামিষাশী মানুষের রোগ কম হয়। কারণ সে তো স্বাভাবিক নিয়ম কানুন মেনে চলতেই অভ্যস্ত। তোমরা দেখবে, মানুষ যদি তার স্বভাবসিদ্ধতার বাইরে গিয়ে মাংসাহারী হলে তার শ্বাদন্ত না থাকায় সে যখন মাংস খায় তখন কী বিশ্রীভাবে খায়? দেখে মনে হয় যেন একটা কুকুর মাংস খাচ্ছে। শ্বাদন্ত না থাকায় চিবোতে কষ্ট হচ্ছে।

শুধু তাই নয়। পশু জগতে আরও বিভাজন আছে। যেমন কোন কোন পশু সমাজৰদ্ধভাবে বাস করে, আবার কিছু পশু বিচ্ছিন্নভাবে। যেমন বাঘ সমাজৰদ্ধ জন্তু নয়, সে একা একা ঘুরে বেড়ায়। ছাগল, সমাজবর্জিত, কিন্তু ভেড়া, হাতী, সিংহ – এরা সমাজবদ্ধ জীব। মানুষ সমাজৰদ্ধ জীব, সে একলা থাকে না। আবার পশুরা সর্বদাই সহজাত বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। আমি কোনো এক সময় বলেছিলাম, জলের নীচে অক্টোপাশ নামে এক পশু থাকে। আটটা পা আছে এই অর্থে তার নাম রাখা হয়েছিল অক্টোপাশ। ল্যাটিন ভাষায় octo মানে আট। এই অক্টোপাশের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হ'ল কাঁকড়া, সংস্কৃতে বলা হয় কর্কট, ল্যাটিনে বলা হয় ক্যানসার। কাঁকড়া কামড়ালে যে ধরনের জ্বলন হয়, তেমনি

যে রোগের প্রকোপে ওই একই ধরনের জ্বলুনি হয় সেই রোগের নাম কর্কট রোগ। অক্টোপাশ জলে থাকে, আর সেখান থেকে সে দেখে নেয় যে ওপরে অন্যে কী করছে। [নড়াচড়া] দেখে সে বুঝে নেয় যে ওটা তার খাদ্য। তাই সে দ্রুত ওপরে উঠে সেটাকে খেয়ে ফেলে। ওরা বুঝতে পারে না, ওই ওপরের প্রাণীটার নামই কাঁকড়া। ওরা শুধু এইটুকুই জানে যে কেবলমাত্র আট–দশটা পা–ওয়ালা জানোয়ার কিছুটা জলকেলি করতে পারে। সেটাই তার খাবার, এইটাই সে জানে। কোন একটা কাঁকড়াকে তুমি অচেতন করে' জলের তলায় বেঁধে ফেলে দাও। অক্টোপাশ সেটা দেখবে কিন্তু যেহেতু কাঁকড়াটা নড়াচড়া করবে না, তাই অক্টোপাশ বুঝতে পারবে না যে, সেটা তার ভক্ষ্য। তাই তার ওপর সে হামলাও করবে না, ধরে গিলে খাবেও না। এইসব সহজাত বৃত্তির প্রকাশ। সংস্কৃত ভাষাতেও instinct-কে সহজাত বৃত্তিই বলতে পারো।

মানুষ সহজাত বৃত্তির বশে ততদিনই থাকে যতদিন তার স্বভাব ঠিকমত তৈরী হয়নি। শৈশবকালে, বাল্যাবস্থায় সে সহজাত বৃত্তির তাগিদেই সব কিছু করে। যেমন, ক্ষিদে পেলে সে কান্না জুড়ে দেয়, যাতে তার মা বুঝতেপারেন যে খোকার ক্ষিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে। এই রকম বেশ কতকগুলো কাজ সে সহজাত বৃত্তির বশেই করে' থাকে। যেমন, দুধ

খাওয়া। সহজাত বৃত্তির বশেই মাতৃস্তন্য পান করে, এই জন্যে তাকে শিক্ষা দেবার দরকার পড়ে না।

মানুষের প্রথম সূত্রপাত হ'ল। তারপর ধীরে ধীরে তার বিকাশ হ'ল, এম্যান এলো। প্রোটো-এপ্ল্যান এলো। অ্যালোপেথিসিন এলো, অতঃপর শাখা-প্রশাখা ৰাড়তে বাড়তে প্রোটোম্যান এলো। তার একটা শাখা হ'ল মানুষের পূর্বপুরুষেরা, আর একটা শাখা শিম্পাঞ্জী, গেরিলা, ওরাং-ওটাংয়ের পূর্বপুরুষ। বাইরে কারো কোনো ন্যাজ নেই, ন্যাজটা থাকে ভেতরের দিকে। মাতৃগর্ভে শিশু যখন ভ্রূণাবস্থায় থাকে তখন তার ন্যাজটা থাকে বেশ বড়। পরে সেটা আর না ৰেড়ে ক্রমশঃ ছোট হয়ে যায়। সুপ্রাচীনকালে একদিন মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জী ও ওরাং-ওটাংয়ের সম্পর্ক ছিল। পরে ওদের আর বুদ্ধির বিকাশ হ'ল না, মানুষের তা হ'ল। আর তাই মানুষ মানুষ হ'ল। শিম্পাঞ্জী-ওরাং-ওটাং জন্তু-জানোয়ারের স্তরেই রয়ে গেলো। তবুও মানুষের পুরোনো সহজাত বৃত্তি এখনও একেবারেই লুপ্ত হয়নি। বানরের লড়াই দেখেছো? দেখবে, ওরা খ্যাঁক খ্যাঁক করে ও দাঁত দেখায়। মানুষও যখন রাগের বশে পরস্পর ঝগড়া করে, তখন সেও এই রকমই আচরণ করে। বানরের মধ্যে সহজাত বৃত্তি পুরোমাত্রায় রয়ে গেছে। সুপ্রাচীন এপ্ল্যান কী করতো? তারা গাছেই বাস

করতো। এই কারণে সংস্কৃত ভাষায় বানরের একটা নাম হ'ল 'শাখামৃগ'। মারাঠী ভাষায় মৃগ শব্দের উষ্চারণ হবে 'মৃগ'।

মৃগ শব্দের সাধারণ অর্থ হ'ল যে কোনো বন্য জন্তু। তাই মৃগচর্ম মানে যে কোনো জন্তু–জানোয়ারের চামড়া, কেবল হরিণের চামড়া নয়। অবশ্য হরিণও মৃগ। এই যে এম্যান, এরা হাত দিয়ে গাছের মোটামোটা ডালকে ধরতো, যেমন আজও বানররা করে' থাকে। এখন মানুষের এই যে সমগোত্রীয় সংস্কার, সহজাত সংস্কারের ফলে এখনও দেখবে ছোট শিশুরা সেই কারণে হাতটা বন্ধ রাখে। বানরেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে বা অপরের সাথে লড়াইয়ের সময় প্রাণপণে গাছের ডালপালা আঁকড়ে ধরে থাকে যাতে পড়ে না যায়। মানুষের ক্ষেত্রে দেখবে, সে যখন ভয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে অথবা শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্যত হয় তখন হাতটা মুষ্টিৰদ্ধ করে' রাখে। এসবই সহজাত বৃত্তির প্রকাশ। তবে বৈবহারিক ক্ষেত্রে পশুর চেয়ে মানুষের মধ্যে সহজাত বৃত্তির প্রভাব কম। এই জন্যে মানুষ এক পৃথক জীব হয়ে গেল সে 'জানোয়ার' নয়, সে 'জানদার'। ফারসী ভাষায় মালিকানা বোঝালে দার, গর প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। 'জান' আছে এই অর্থে 'জানদার'। তেমনি 'জান' আছে এই অর্থে 'বর' লাগালে জানবার (জানোয়ার)। জানোয়ার ও জানদার এক নয়। কোথাও কোথাও 'গর' প্রত্যয়ও ব্যবহৃত হয়। যেমন জাদুগর,

সওদাগর ইত্যাদি। তাহলে মানুষের বিশেষত্ব হ'ল প্রথমত সে হচ্ছে বিবেকপূর্ণ, যুক্তিবাদী আর সেই সঙ্গে রয়েছে মানবধর্ম। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেমন উদ্ভিদ ধর্ম। আর অতিরিক্ত 'ধর্মজীবন' তো সকলের জন্যেই। আর পশুর জন্যে অতিরিক্ত হ'ল পশু ধর্ম। পশু পশুধর্ম পালন করবে, তাতে কোনো দোষ নেই। বাঘ মানুষের ওপর হামলা করবে, তাকে মেরে ফেলবে এটা তো দোষাবহ নয়। আবার মানুষ যদি গো–মাংস খায় তো সেটা হয়ে যাবে পশুধর্ম। মানুষকে মানব ধর্ম মেনেই চলতে হবে। মানব ধর্মের বৈশিষ্ট্য হ'ল বিচারশীলতা, আর এই বিচারশীলতার জন্যে মানুষের জীবনে চারটে মুখ্য স্তর। এই চারটে স্তরের ভেতর দিয়ে যে মানুষ চলে আমরা বলি সে মানবতার পথই অনুবর্তন করছে, মানব ধর্মের পথেই চলছে।

প্রাণী ভেদে ধর্ম তিন ধরনের উদ্ভিদ ধর্ম, পশু ধর্ম ও মানব ধর্ম। এই মানবধর্মের অপর নাম ভাগবৎ ধর্ম। এতে হিন্দু–মুসলমান শ্রেণী বিভাজন নেই – এই ধর্ম মানুষ মাত্রেরই ধর্ম। এতে মতবাদগত বিভিন্নতা নেই। সকল মানুষের জন্যেই এই ধর্ম। এইজন্যে আমরা বলি "মানব মানব এক হ্যায়”, “মানব কা ধর্ম এক হ্যায়।” এই ধর্মই আদি ধর্ম, সনাতন ধর্ম। এই ধর্ম চতুষ্পাদ বিস্তার, রস, সেবা ও তস্থিতি।

ভাগবত ধর্মের মূল লক্ষ্য হ'ল বিস্তার, মানসিক বিস্তার। মানুষকে অনুভব করতে হবে– এই অলৌকিক ঐশ্বরীয় ধারাপ্রবাহ থেকে আমি অভিন্ন এক সত্তা। এই বিশ্ব–প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থেকে আমাকে এগিয়ে চলতে হবে, আমার হাসি–কান্না, আশা–আকাঙ্ক্ষাকে এই বিশ্ব–প্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। এই যে পরমপুরুষের রসপ্রবাহ, যার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে মানুষকে এগিয়ে চলতে হয়, একেই বলা হয় পরমপুরুষের 'রাসলীলা'। এই রাসলীলায় অংশভাগী হয়ে জীবকে আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলতে হবে। এক অখণ্ড রস–প্রবাহ অনাদি থেকে উৎসারিত হয়ে অনন্তের পানে এগিয়ে চলেছে। কোনো জীবই এই অখণ্ড রস প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না।

তৃতীয় তত্ত্ব হ'ল সেবা। পশু জীবনে সেবার সুযোগ নেই। আছে কেবল পারস্পরিক বিনিময় যাকে কথ্য ভাষায় বলি ব্যবসা, ইংরেজীতে বলি transac- tion; 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' এই হ'ল নীতি। তোমরা ৰোধ হয় কুমীরের ব্যাপারটা জান। সংস্কৃতে কুমীরকে বলে মকর, ইংরেজীতে crocodile। হিন্দীতে মগরমচ্ছ। এখন কুমীর হ'ল মাংসাশী জীব। কুমীর যদিও জলে থাকে কিন্তু সে জলজ প্রাণী নয়। সে জলে যায় শিকার ধরতে। শিকার ধরে খেয়ে ফেলার পর সে আর জলে থাকে না, ডাঙ্গায় উঠে আসে। আর মুখ হাঁ করে' নির্জীবের

মত পড়ে থাকে। ছোটো ছোটো পাখীরা এসে তার মুখের ভিতর ঢুকে যায়। আর কুমীরের দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে যে মাংসের টুকরো লেগে থাকে পাখীরা সেগুলোকে খুঁটে খুঁটে খায়। এতে হ'ল কী? পাখীর আহার মিললো, আবার কুমীরের দাঁতও সাফ হ'ল। তাহলে তো পাখীরা মারা পড়বে। সেই সময়টায় কুমীর কিছুতেই মুখ বন্ধ করে না – এই হ'ল ব্যবসায়িক ব্যাপার।

মানুষের ক্ষেত্রে একটা অতিরিক্ত গুণ হ'ল সেবা। সেবার ভাবটা হ'ল– আমি দেব, বিনিময়ে নোব না কিছুই। জিনিসটা একতরফা। মানুষ যখন কিছু দান করে, বিনিময়ে সে তো কিছু আশা করে না। ধর, কোনো ভিখারিকে তুমি কিছু দান করলে। প্রতিদানে তুমি তো কিছু প্রত্যাশা করো না। আবার তুমি যে দান করেছো এই কথাটাই তো ভুলে যাও। এইটাই মানুষের বিশেষত্ব। কিছু লোক এই দান ব্যাপারটাকে অন্যভাবে গ্রহণ করে। যেমন, কেউ হয়তো আজ কোথাও এক লক্ষ টাকা দান করল। রাত্রে তার চোখে ঘুম নেই এই চিন্তায় কখন সকাল হবে, কখন প্রাতঃরাশের টেবিলে বসে দেখবে যে অমুক চোট্টামল, ডাকুরাম, বাটপাড়িয়া জনহিতকর কাজে এত টাকা দান করেছেন। তোমরা এমনটা করো না। দান করো, তার পরে সেটা বেমালুম ভুলে যাও। দান হবে একতরফা। না, পরমপুরুষকে একদিকে 'এতানি

পুষ্পানি', 'ওঁং ওঁং' করে' পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছো আবার মনে মনে বলছো – "পরমপুরুষ, আমার খোকাটা পরীক্ষা দিয়েছে, দেখো যেন ভালভাবে পাশ করে' যায়; মেয়েটি যেন ভাল ঘর–বর পায়, খুড়তুতো ভাইয়ের সাথে যে মোকদ্দমা চলছে, তাতে যেন আমার জয় হয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব চলবে না। দিতে হবে নিজেকে। পাবার কিছুমাত্র প্রত্যাশা না রেখেই। নিজেকে যখন দিয়ে দিলে, তখন সবচেয়ে বড় লাভ হ'ল–তুমি তো তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেলে, তুমি পরমপুরুষ হয়ে গেলে। কিন্তু যদি এক আনাও হাতে রেখে পনেরো আনা পরমপুরুষকে দাও, তা হলে এই এক আনার জন্যেই তুমি পরমপুরুষের সঙ্গে একাত্মতা অর্জন করতে পারবে না। এইজন্যে দিতে চাও তো ষোলো আনাই দাও। মানব ধর্মের চতুর্থ পাদ হ'ল তস্থিতি। শেষ পর্যন্ত মানুষকে পরমপুরুষের সাথে মিশে যেতে হবে। এই সব গুণ পশুতে নেই। এইজন্যে গীতায় বলা হয়েছে–

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

অর্থাৎ মানুষ, মনে রেখো, তুমি মানুষের শরীর–মন পেয়েছ, তাই তোমাকে করতে হবে মানব–ধর্মের অনুশীলন। তাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। এই ধর্মের অনুশীলন করতে গিয়ে যদি তোমার মৃত্যুও হয়, তবুও ভাল। কিন্তু পরধর্মের

সূচীপত্র

অনুবর্তন কখনও করো না। সেটা হবে বড় ভয়াবহ, বড় ভয়ঙ্কর। এখানে পরধর্ম মানে উদ্ভিদের ধর্ম, পশুর ধর্ম। মনুষ্যদেহধারী জীব কখনও এই ধর্মের পথ অনুসরণ করবেনা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন– এই মানব ধর্মের অনুশীলন যদি কষ্টদায়কও হয়, বিঘ্নসংকূলও হয় ও পরধর্মের পথ যদি কুসুমাস্তীর্ণ হয়, অনায়াসসাধ্যও হয়, তথাপি স্বধর্মের অনুশীলনই বাঞ্ছনীয়, শ্রেয়স্কর। তাই সর্বাবস্থায় মানুষ পরধর্মের পথ কঠোরভাবে বর্জন করে' চলবে।

১৫ অক্টোবর ১৯৭৯, বিকালবেলা, নাগপুর

আমাদের সমাজশাস্ত্র

"নীতিবাদের স্ফুরণ থেকে বিশ্বমানবত্বে প্রতিষ্ঠা– এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে যেটুকু অবকাশ তাকে অতিক্রম করবার যে মিলিত প্রয়াস তারই নাম সামাজিক প্রগতি, আর যারা মিলেমিশে চেষ্টা করে এই অবকাশটুকু জয় করবার প্রয়াসে রত হয়েছে, তাদেরই নাম একটা সমাজ"। সুতরাং 'সমাজ' শব্দটার ভাবগত অর্থ হ'ল একসঙ্গে চলা। এই চলার প্রাথমিক

স্তর হ'ল নীতি। মনের যে বিশেষ ভাবগত আদর্শ মানুষকে ভূমাভাবে পৌঁছবার প্রেরণা যোগায় তাকেই বলা হয় নীতিবাদ। সমাজ জীবনকে এই নীতিবাদ থেকেই যাত্রা আরম্ভ করতে হয়। এই যাত্রার গন্তব্যস্থল ভূমামানবত্বে প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ মানুষের মনের ততখানি বেশী বিকাশ ও বিস্তার যেখানে বিশ্বের প্রতিটি মানুষই তার আওতায় এসে যায়। এই যাত্রার পাথেয় হ'ল সাধনা। তাই বলা হয়েছে–নীতি হ'ল জীবনের মূল ভিত্তি, সাধনা হ'ল উপায় ও দিব্য জীবনলাভ হ'ল লক্ষ্য।

আনন্দমার্গ এই ধরনের এক আদর্শ সমাজ গড়ে' তুলতে চায়। তাই আনন্দমার্গীদের জন্যে এমন এক সুষ্ঠু পরিবেশের প্রয়োজন যেখানে মানুষ তার দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সুযোগ পায়, ও এক ছন্দে একসঙ্গে পরমপুরুষের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সেই সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই আনন্দমার্গের সমাজশাস্ত্র।

মনুর স্মৃতিশাস্ত্র হিন্দু সমাজব্যবস্থা গড়ে' তুলতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সেই স্মৃতিশাস্ত্রই আবার হিন্দু সমাজের অধঃপতনের কারণ। তার কারণ হ'ল, মনু জীবনের বিভিন্ন দিকগুলোকে কঠোর নিয়ম কানুনের বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন। সেই নিয়ম–কানুনের কঠোরতার জন্যে অনেকেই তা অনুসরণ করতে পারত না যার ফলে মানুষেরা নিয়মকানুনের কঠোরতা হ্রাসের জন্যে পুরোহিতের শরণাপন্ন

হত। সেই কারণে হিন্দুসমাজের নিয়মকানুনের মধ্যে দেখা দিয়েছিল শৈথিল্য। দ্বিতীয়ত মনুর স্মৃতিশাস্ত্রে শাস্তির বিধান এত কঠিন ছিল যে, মানুষ তাতে সর্বদাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকত, যার ফলে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের মুক্ত পরিবেশ ছিল না। মনু নীতি ও ধর্মকে এক করে' নিয়েছিলেন, তাই সামাজিক অপরাধেও অপরাধীদের ধর্মীয় শাস্তি দেওয়া হত, তার ফলে প্রতি পদে মানুষের ধর্মীয় প্রগতিতে বাধা আসত। এই সমস্ত কারণবশতঃ **আনন্দমার্গ যে ধরনের সমাজ গড়ে' তুলতে চায়, তাতে মনুর স্মৃতিশাস্ত্র আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না।** আনন্দমার্গের সমাজব্যবস্থার বিশেষত্ব হ'ল:–

(ক) মানুষের প্রয়োজন বুঝে তাদের মনের কথা ভেবে সমাজের বিধিনিষেধ তৈরী করা হয়েছে;

(খ) মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ যাতে হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে;

(গ) যা সত্য তাকেই গ্রহণ করা হয়েছে, মেকী ভদ্রতার খাতিরে সমাজের পুঁতিগন্ধময় দিকগুলোকে মেনে নেওয়া হয় নি।

একটা আদর্শ সমাজব্যবস্থা গড়ে' তুলতে গেলে নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয়সমূহ একান্ত আবশ্যক (ক) **একতা**, (খ) **সামাজিক নিরাপত্তা**, (গ) **শান্তি**।

(ক) **একতা**— যে কোন সমাজে বা সামাজিক কাঠামোতেই সদস্যদের মধ্যে একতা একান্ত অপরিহার্য। অন্যথা কাঠামোয় ভাঙ্গন ধরে। ব্যষ্টিস্বার্থ–কেন্দ্রিক সামাজিক অনৈক্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধানুসারে দলবাজী, অন্যের কার্য বা মনোভাব বোঝার মত মানসিক উদারতার অভাব এগুলো শুধু সমাজের অধঃপতনেরই সূচনা করে না, এগুলো সমাজকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র পরিচিত ইতিহাসে বহু দল ও সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অতএব সমস্যা হ'ল সমাজে একতা সংরক্ষণ। সমাজের সভ্যদের নিম্নোক্ত ভাবধারায় উদ্বুদ্ধকরতে পারলে সামাজিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব – (১) **সাধারণ আদর্শ,** (২) **জাতিভেদহীন সমাজ**, (৩) **সামূহিক সামাজিক উৎসব,** (৪) **চরম দণ্ডপ্রথারাহিত্য।** আনন্দমার্গ সমাজব্যবস্থায় এর সবগুলোই বর্তমান।

(১) **সাধারণ আদর্শ**–আনন্দমার্গে শিশুজীবনের প্রারম্ভেই সাধারণ আদর্শের ৰীজ বপন করা হয়। ৫ বৎসর বয়সে শিশু যখন তার পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে অতি সামান্য জ্ঞান আহরণ করতে থাকে, তখনই তাকে ব্রহ্মভাবনা দেওয়া হয়। তাই আনন্দমার্গের সমাজ এক সাধারণ আদর্শের ওপর ব্রহ্মসম্প্রাপ্তির লক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম এক শাশ্বত সত্তা।

তাই তাঁকেই কেবল আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে' শাশ্বতী একতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

আমাদের আনন্দমার্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও "পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ সকলের সাধারণ সম্পদ, আর সমাজের সকলেই এর ন্যায্য অংশীদার"– এই সাধারণ আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে। আনন্দমার্গের যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে "সংগচ্ছধ্বং" মন্ত্রের আবৃত্তির দ্বারা ওই ভাবধারাকেই দৃঢ় করা হয়। এক সাধারণ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গোটা মানবজাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, বিশ্বের যাবতীয় সম্পদকে সকলের সাধারণ সম্পদ মনে করে তার যথাযথ ব্যবহার করা, শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যষ্টিদের সমবেতভাবে শিশুর সামাজিক, মানসিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি নিঃসন্দেহে এক অমর সাধারণ আদর্শের সূচনা করে।

(২) **জাতিভেদবিহীন সমাজব্যবস্থা**– যে সমাজে বিশেষ জাতি বা শ্রেণীর প্রাধান্যকে মেনে নেওয়া হয়েছে সে সমাজে ভাঙন ধরবেই। জাতি–ব্যবস্থার অভিশাপ ভারতের মত পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখা যায় না। সামাজিক একতার জন্যে সমাজে অর্থনৈতিক ও বিবিধ সামাজিক সুবিধান্বেষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সৃষ্টি হতে দেওয়া উচিৎ নয়। আমাদের আনন্দমার্গে গোটা মানবজাতিকে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মনে করে'

অকৃত্রিম ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ করা হয়, ও এখানে ব্যষ্টিবিশেষ নিজেকে জীবমাত্র বলে' পরিচয় দেয়। তাই এখানে জাতিভেদ বিহীন সমাজ–ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আনন্দমার্গের যাবতীয় অনুষ্ঠানের প্রমুখ, পরিচালক ও কর্মীগণ প্রচলিত রীতির মত জাতিভাই নয়, সকলেই পরস্পর গুরুভাই। তারা যে কোন শ্রেণীর বা বর্ণের হতে পারেন। এই সঙ্গে সাধারণ লক্ষ্য হিসাবে ব্রহ্মকে গ্রহণ করে' এখানে জাতি–বর্ণহীন এমন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে যেখানে ব্যষ্টিবিশেষ নিজেকে জীবমাত্র বলে পরিচয় দেয়। এখানে ব্যষ্টিবিশেষের দোষের জন্যে কোন পরিবারকে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয় না। এতে সমাজচ্যুত পরিবারসমূহের একটা পৃথক সমাজ ঘটনের আশঙ্কা থাকে না। এরূপ সমাজে বিবাহ, ধর্মশাস্ত্র–অধ্যয়ন বা যে কোন প্রকার উন্নতির জন্যে কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীগত বিচার নেই, সেখানে জাত–ভেদের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের আনন্দমার্গে প্রতিটি শিশুর পালন–পোষণকে সামাজিক দায়িত্ব বলে' মনে করা হয়। বিশ্বের যাবতীয় সম্পদকে সকলের সাধারণ সম্পদরূপে গণ্য করা হয়, ও ধর্মীয় অনুশীলনের জন্যে এখানে কোন জাতি–বর্ণগত প্রতিবন্ধকতা নেই।

(৩) **সামূহিক সামাজিক অনুষ্ঠান**– পরস্পরকে না বোঝার মত তথা অন্যের মতামতকে উপযুক্ত সম্মান না দেওয়ার মত মানসিক অনুদারতার জন্যেই বহু সামাজিক অনর্থের সূত্রপাত হয়। এতে সমাজের সভ্যরা শুধু একে অন্যের ব্যাপারে অজ্ঞই থাকে না, উপরন্তু তারা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। সামাজিক উৎসব–অনুষ্ঠানাদিতে সমাজের বিভিন্ন সভ্যরা সম্মিলিত হয় আর তাই এ সকল অনুষ্ঠান হ'ল একতার বড় একটা বাহন। মিলিতভাবে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে' সকলেই কিছুক্ষণের জন্যে একই ক্রিয়ায় রত থাকে বলে' সাময়িকভাবে তাদের মনে একটা একতাভাবের সৃষ্টি হয়। আনন্দমার্গে এরূপ সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হয়। মিলিত স্নান, ধর্মচক্র, দৈহিক, মানসিক তথা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠানেরই ভূমিকা গ্রহণ করে। আনন্দমার্গে কোন উৎসবই তাই শুধু আচার্যের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় না, কমপক্ষে পাঁচ জন মার্গীকে উপস্থিত থাকতেই হবে।

(৪) **চরম দণ্ডরাহিত্য**– চরম শাস্তি ব্যবস্থায় সমাজের নৈতিক মান আরও অবনত হয়। আর তার ফলে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যষ্টির অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। এ সকল ব্যষ্টিরা সমাজের অপরাধীদের নিয়ে এক গোষ্ঠী বা দল তৈরী করে'

অপরাধপ্রবণতা ও বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে তোলে। আমাদের আনন্দমার্গে কোথাও দৈহিক বা সামাজিক চরম শাস্তি অনুমোদিত নয়। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এখানে অপরাধীকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত করা হয়। শাস্তির নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে আবার সে যথারীতি যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারে। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় তার পরিবার পরিজনবর্গকে কোন প্রকার ক্লেশই ভোগ করতে হয় না। এ ব্যবস্থায় সমাজচ্যুত তথা কারামুক্ত ব্যষ্টির ন্যায় শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যষ্টির নৈতিক মানের ওপর কোন বিশেষ ছাপ দিয়ে দেওয়া হয় না। অপর শাস্তিটা হ'ল– তাকে দশজন লোককে আধ্যাত্মিক শুভ বুদ্ধির পথে আনতে হবে; তবেই সে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের অনুমতি পাবে। এ ধরনের শাস্তি হ'ল একটা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা। এতে অপরাধীর অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে' না দিয়ে তাকে শোধরাবার সুযোগই বেশী দেওয়া হয়। এ সকল শাস্তিতে অপরাধী তথা তার পরিবারের ওপর কোন স্থায়ী কলঙ্ক আরোপ করা হয় না বলে তারা সমাজদেহে অপরাধপ্রবণতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বসে না। পক্ষান্তরে, শাস্তিকালে অপরাধী দশজন ব্যষ্টিকে সৎপথ দেখানোর কাজে চেষ্টিত থাকায় তার সাধারণ জীবনযাত্রা অপেক্ষা সে ভাল কাজেই জীবন অতিবাহিত করে। কাজেই সে শুধু তার নিজের

উন্নতিই করে না, সৎ আদর্শের প্রচার করে' সমাজেরও উন্নতি করে। শাস্তি দেওয়ার সময়েও হঠাৎ কাউকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। প্রথমে তাকে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। "চর্যাচর্য, দ্বিতীয় খণ্ডে" বলা হয়েছে– "(ক) অপরাধীকে প্রথমে মিষ্ট কথায় বোঝাবে; (খ) দ্বিতীয় পর্যাযে তাকে কঠোরভাবে বোঝাবে, (গ) তৃতীয় পর্যায়ে তাকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা বলবে; (ঘ) চতুর্থ পর্যায়ে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে"। এর ফলে আনন্দমার্গের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ শাস্তির ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকবে না।

(খ) **সামাজিক নিরাপত্তা:** সামাজিক নিরাপত্তার অভাবেও সমাজে ভাঙ্গন ধরতে দেখা যায়। যে সমাজে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সদস্যদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই সেই সমাজ বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে না। শৃঙ্খলার অভাবেও সামাজিক নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হয়। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ একান্ত প্রয়োজনীয়:– (১) সুবিচার ও (২) শৃঙ্খলাবোধ।

সুবিচার: সামাজিক নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ব্যষ্টিবিশেষের অর্থনৈতিক, জাতিগত তথা স্ত্রী–পুরুষগত কারণে কোন অবিচার থাকতে দেওয়া উচিত নয়। অর্থনৈতিক অবিচার মুখ্যতঃ শ্রমের মূল্য না বোঝারই ফল। সমাজে বৃত্তিগত ভেদাভেদ থেকেই অর্থনৈতিক অবিচারের সৃষ্টি হয়।

আনন্দমার্গে পরপিণ্ডভোজীর চেয়ে মলাকর্ষীর জীবনকে শ্রেয় মনে করা হয়। জীবিকা অর্জনকে যে সমাজে এতটা বড় করে দেখা হয় সেই সমাজ থেকে বহু প্রকারের অর্থনৈতিক অবিচারই দূর হয়ে যেতে বাধ্য। অর্থনৈতিক অবিচার ব্যষ্টিবিশেষের স্বাভাবিকী সঞ্চয় বৃত্তি থেকেও এসে যেতে পারে। মানুষ যাবতীয় সম্পদ নিজেই ভোগ করতে চায় কিন্তু যদি তারা এ কথা বুঝতে শেখে যে যাবতীয় সম্পদের ওপর সকলেরই অধিকার আছে তাহলে অর্থনৈতিক অবিচার বহুলাংশে কমে যাবে। **আনন্দমার্গে বিশ্বের যাবতীয় সম্পদকে সকলের সাধারণ সম্পদ মনে করা হয়।** এ রকম ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সমাজে অর্থনৈতিক অবিচারের বিশেষ অবকাশ থাকে না।

স্ত্রী ও পুরুষগত ভেদবুদ্ধিও সামাজিক অবিচারকে প্রশ্রয় দেয়। মানুষের সমাজে স্ত্রী–পুরুষের এককে অপরের চেয়ে হীন মনে করার বেশ একটা প্রবণতা রয়েছে। এই পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই স্ত্রী জাতিকে পুরুষের ভোগোপাদান বলে মনে করা হয়। কোথাও কোথাও তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয়। আমাদের আনন্দমার্গে স্ত্রী–পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার বা দায়িত্ব। আনন্দমার্গের বিবাহ পদ্ধতিতে পুরুষ ও নারী উভয়কেই সমান দায়িত্ব গ্রহন করতে হয়। এখানে নারী জাতিকে অধ্যাত্ম অনুশীলনে অনুপযুক্ত বিবেচনা

করা হয় না। পুরুষ তথা নারীকে এখানে সমদৃষ্টিতে দেখা হয়। তাই পুরুষের নিজেকে নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষেরা অপর শ্রেণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করার ফলেও প্রায়ই সামাজিক অবিচার প্রশ্রয় পায়। ভারতবর্ষে হরিজন সম্প্রদায়ের ওপর তথাকথিত উষ্চ বর্ণের লোকেদের অবিচারের ফলে সমাজে অভাবনীয় ভাঙন ধরেছে। এ সকল সামাজিক অবিচার নির্মূল করার জন্যে প্রথমেই সমাজে জাতিগত এই অনৈক্যের মূলোৎপাটন প্রয়োজন। আমাদের আনন্দমার্গে প্রাথমিক পর্যায়েই যে কোন মানুষকে তার জাতি–বর্ণের কথা ভুলে যেতে শিক্ষা দেওয়া হয়। জাতিভেদযুক্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে জাতিগত সংস্কারের প্রভাব যথেষ্ট। আমাদের সামূহিক অনুষ্ঠানে যে কোন জাতি, বর্ণ বা শ্রেণীর লোক সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। সমাজে বিবাহাদির ব্যাপারে জাতি–বর্ণাদির প্রশ্ন বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আমাদের মার্গে এই ধরনের সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

শৃঙ্খলা: ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় যে শৃঙ্খলাবোধের অভাবে বহু সমাজ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সমাজের কিছু সংখ্যক সদস্যের বিশৃঙ্খল আচরণ বাকীদর শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে। এই সামাজিক

নিরাপত্তার খাতিরেই শৃঙ্খলার প্রয়োজন। সামাজিক নিয়ম–কানুনকে কিছুসংখ্যক সদস্যের দ্বারা ভুল মনে করা থেকেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাদের সেই মনে করাটা যদি সামাজিক আইন ভঙ্গ করার কারণ না হয়, শুধু মনে করা বা তর্ক–বিতর্কের স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় না। শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে সামাজিক নিয়মকানুন যুক্তিপূর্ণ তথা পরিবর্তনশীল হওয়া দরকার। আমাদের আনন্দমার্গে অযৌক্তিক কোন কিছুর স্থান নেই। যেখানে যুক্তিকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় ও যুক্তির খাতিরে পরিবর্তনকেও মেনে নেওয়া হয়, সেখানে অসন্তোষ তথা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে না। আনন্দমার্গে আনুগত্যের পরেই যুক্তি–তর্কের স্থান। প্রচলিত সামাজিক বিধানের বাছে প্রথমে আনুগত্য জানিয়ে পরে যদি সে ত্রুটিপূর্ণ কিছু দেখে সে ক্ষেত্রে যুক্তি তর্কের দ্বারা ত্রুটি সংশোধনের অধিকার তার অবশ্যই আছে। কিন্তু আনুগত্যের আগেই তর্ক করলে কেবল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আনন্দমার্গীয় সমাজব্যবস্থায় গতানুগতিক অন্ধ অনুকরণপ্রবণতার চেয়ে যুক্তির মূল্য অনেক বেশী। তাই এখানে শৃঙ্খলা তথা ব্যষ্টি বিশেষের সামাজিক নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হওয়ার কোন অবকাশই নেই।

(গ) **শান্তি:** মনের সাম্যব্যবস্থাকেই শান্তি বলে। কাজেই মনের এই সাম্যাবস্থা কিসে আসে আর কী কী কারণে তা

বিপর্যস্ত হয় তা জানা দরকার। আধ্যাত্মিক অনুশীলনে মনের সাম্যাবস্থা আসে, আর কুসংস্কারে বিশ্বাস থেকে তা বিপর্যস্ত হয়। শান্তিরক্ষার জন্যে আধ্যাত্মিক অনুশীলন তথা কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজন।

দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি লাভই মানুষের জীবনে পরম লক্ষ্য- এ ছাড়া শান্তি আসতে পারে না। এই অব্যাহতিই নিবৃত্তি। নিবৃত্তি দু-ধরনের (১) সাময়িক নিবৃত্তি, (২) আত্যন্তিকী নিবৃত্তি। যে বস্তু এই নিবৃত্তি লাভে সাহায্য করে তাকে বলা হয় অর্থ। কিন্তু এই অর্থ সম্পূর্ণতই একটা স্থূল জিনিস আর তাই এ থেকে। কেবল স্থূল তথা সাময়িক তৃপ্তিই হতে পারে। দুঃখের হাত থেকে শাশ্বতী অব্যাহতি পাবার জন্যে পরমার্থই একমাত্র উপায়। সুতরাং সর্বপ্রকার ক্লেশের আত্যন্তিকী নিবৃত্তির জন্যে পরমার্থই একমাত্র অবলম্বন। এই পরমার্থ প্রাপ্তি কেবল আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারাই সম্ভব। আনন্দমার্গে তাই পাঁচ বৎসর বয়স থেকেই অধ্যাত্ম সাধনা শুরু হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক অনুশীলন পরিপক্কতা লাভ করে, ও তার প্রভাব অভ্যাসকারীর দৈহিক স্তরে ও মানসস্তরে ব্যাপ্ত হতে থাকে। আনন্দমার্গের সাধনা বা আধ্যাত্মিক অনুশীলন মানুষকে সংসার ত্যাগের শিক্ষা দেয় না, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ যাবতীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারেরই শিক্ষা দেয়। দৈহিক মানসিক তথা আধ্যাত্মিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে

স্থায়ী মনঃসাম্য অর্জন তথা শাশ্বতী শান্তি পাবার জন্যে আনন্দমার্গের সাধনাক্রম হ'ল একটা সুশৃঙ্খল তথা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় নির্দেশ– আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে আমাদের কীভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, সেই বিষয়েও আমাদের সমাজশাস্ত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। অতীতের ১০০০ বৎসরের মধ্যে পূর্বের ৮০০ বৎসরের তুলনায় বিগত ২০০ বৎসরে পৃথিবীতে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে, পোষাক–পরিচ্ছদে, আহারে–বিহারে অভাবনীয় পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছে। পুরোনো আমলের খড়ম, ফতুয়া, পাগড়ী ছেড়ে আধুনিক ডিজাইনের টেরিলিন, টেরিকটন, হ্যাট, কোট, প্যান্ট, জুতো পরতে সুরু করেছে। সেকেলে গোরুরগাড়ী, এক্কা, টমটম ছেড়ে দ্রুতগামী মোটরগাড়ী, ট্রেন, এরোপ্লেন, রকেটে ভ্রমণ করতে শিখেছে; আগেকার লোকেরা হাতীর হাওদায় চড়ে নিরাপদে ভ্রমণ করত; এখনকার মানুষকে চন্দ্র, মঙ্গল, বুধে পাড়ি দেবার সময় রীতিমত সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কাজেই বর্হির্জগতের দ্রুতির সঙ্গে তাল রাখতে গেলে দেহ ও মনের পরস্পর সামঞ্জস্য থাকা উচিত। আনন্দমার্গ সাধনা পদ্ধতিতে এই জন্যে আসন– প্রাণায়ামের বিধান রয়েছে।

এক কথায় জগতের পরিবর্তনশীলতাকে সামনে রেখে এক চলমান সামাজিক কাঠামোর অস্তিত্ব তথা বিকাশের জন্যে যে ধরনের সার্বজনীন, যুক্তিনিষ্ঠ ও মনোবিজ্ঞানসম্মত সমাজশাস্ত্র দরকার আনন্দমার্গের সমাজ শাস্ত্র সেই সকল গুণে অন্বিত। যেহেতু মানুষের ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন বুঝে এই সমাজশাস্ত্র রচিত হয়েছে, তাই সর্বস্তরের মানুষ এর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন ও সেই সঙ্গে বাস্তবীকরণের প্রচেষ্টাও শুরু করে' দিয়েছেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, রাঁচী জাগৃতি

বিশ্বের ভূ-তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

প্রায় ৮০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর কোথাও কঠিন পদার্থ বলে কিছু ছিল না। গ্রহটি তখন ছিল এক জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড। পৃথিবীর স্থলভাগ সৃষ্টি হয়েছে মাত্র ২৩০ কোটি বছর আগে। টারসিয়ারি যুগের শেষাশেষি ও ক্রেটারিয়ান

যুগের গোড়ার দিকে পৃথিবীর বুকে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল। সে সময় পৃথিবীর মধ্যভাগ ছিল জলময়।

সেদিন আরব সাগর বলে' কিছু ছিল না। ছিল না বঙ্গোপসাগর বা অন্য কোন দ্বীপ। উত্তর ভারতের অস্তিত্বও তখন ছিল না। আজকের তিব্বত দেশটির অথবা হিমালয়ের কোন হদিশ সেদিন ছিল না। একটি মাত্র অবিচ্ছিন্ন ভূমিখণ্ড সেদিন পরিব্যপ্ত হয়ে ছিল যার অংশ বিশেষ ছিল আজকের আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বাংশ, ভারত উপমহাদেশ [যা ছিল উত্তর গোলার্ধের অংশ বিশেষ], মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া। প্রাচীনতম এই দ্বীপপুঞ্জ সদৃশ দীর্ঘ ভূমিখণ্ডের অংশবিশেষে ছিল সেদিন আজকের কানাডা ও আর্জেন্টিনা দেশের ভূ-ভাগও। এই যে বিশাল ভূমিখণ্ড যা একদিন বিস্তৃত ছিল আজকের আরবসাগর, বঙ্গোপসাগর, ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ ভারতের মালভূমি, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা ও ওশিয়ানিয়া অবধি, ভূতত্ত্ববিদগণ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার নামকরণ করেছিলেন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। তাঁরা এই ভূমিখণ্ডের এরূপ নামকরণ করেছিলেন এই কারণে যে অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত 'গোণ্ড' জনজাতি একদিন ওই বিশাল ভূমিখণ্ডের মধ্যভাগে বসবাস করতেন। এই মধ্যাঞ্চলের ভূমি অবশ্য গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের প্রাচীনতম মৃত্তিকা বলে গণ্য হয় না। আজও

৩০ কোটি বছরের প্রাচীন ভারতের ছত্রিশগড়ী অঞ্চলে সেই গোণ্ডদেরই উত্তর–পুরুষেরা বসবাস করে' চলেছেন।

রাঢ় হ'ল সমুদ্রের জলস্তরের ঊর্ধ্বভাগে অবস্থিত গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের প্রাচীনতম ভূমিখণ্ড। রাঢ়ের বুকে অবস্থিত আমাদের আনন্দনগরের পাহাড়গুলো কমপক্ষে ৩০ কোটি বছরের প্রাচীন। তখন হিমালয়েরও জন্ম হয়নি।

প্রাচীনযুগের সেই ভূমিকম্প

তারপর আজ থেকে কম করেও তিন কোটি বছর পূর্বে ঘটেছিল প্লুটোনিক ভূমিকম্প। আজ যেখানে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর, সেই সুবিস্তৃত অংশের ভূমিখণ্ড সেদিনের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছল। সেই ভূমিকম্পের ফলেই উদ্ভূত হয়েছিল আজকের উত্তর ভারত। সেই ভূমিকম্পের পরে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে সেদিন যে সব পাহাড় ছিল সেগুলো পরিণত হ'ল দ্বীপভূমিতে। এভাবেই ৫০৩টি সাগর–দ্বীপ জেগে উঠেছিল যাদের মধ্যে আজকের মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ ও দ্বীপময় অঞ্চলগুলিও ছিল। এগুলি তো বটেই, এ ছাড়া হিমালয়েরও উদ্ভূতি ঘটেছিল অনুমান দু/তিন কোটি বছর পূর্বে। তাই **হিমালয় তিন কোটি বছরের পুরনো** কিন্তু গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ও রাঢ় ৩০ কোটি বছরের চেয়েও প্রাচীন।

শিবালিক পর্বতমালার মৃত্তিকা স্তরে আজও সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া যায়। হিমালয় পর্বতও যে একদিন সমুদ্রের তলায় ছিল তার প্রমাণ রয়ে গেছে। সর–সমুদ্রগুলোতে (sargasso sea) জলস্রোতবাহিত জীবজন্তুদের গলিত মৃতদেহগুলো পরবর্তীকালে জ্বালানি তেলে রূপান্তরিত হয়েছে। আজকের ভারতের সুবিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় সমতল অঞ্চল হিমালয় বিধৌত পাললিক মৃত্তিকার দ্বারা তৈরী।

আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি, সিন্ধু ও রাজস্থানের থর মরু অঞ্চল একদিন সমুদ্রগর্ভে ছিল। তাদের বালিয়াড়ীগুলোও সমুদ্র সঞ্জাত। এই বালিয়াড়ীগুলোই প্রমাণ করে' দেয়' যে এই দুই সুবিস্তীর্ণ মরু–অঞ্চল এককালে সমুদ্রের তলায় অবস্থিত ছিল।

রাঢ়ের ভূ–তত্ত্ব

পৃথিবীতে পাঁচ ধরনের প্রস্তর রয়েছে কঠিন প্রস্তর (hard rock), আগ্নেয় প্রস্তর (igneous rock), খনিজ প্রস্তর (metallic rock), রূপান্তরিত প্রস্তর (metamorphosed rock) ও পাললিক প্রস্তর (sedimentary rock)। এ ধরনের প্রস্তরগুলোর নিদর্শন আজও ছড়িয়ে রয়েছে আনন্দনগরের আশপাশ অঞ্চলে ও মরাপাহাড়ী এলাকায়। 'মরা' মানে মৃত, আর 'পাহাড়ী' অর্থাৎ 'পাহাড়'। তাই 'মরাপাহাড়ী' শব্দের অর্থ হ'ল মৃত–পর্বত বা

মৃত–পাহাড়। স্থানীয় মানুষেরা তাদের কথ্য ভাষায় এই স্থানটাকে বলে মারাফাড়ী। এই অঞ্চলেরই সরকারী নাম হয়েছে আজ বোকারো ইস্পাত নগরী।

কী করে' আমরা মৃত প্রস্তরকে চিনতে পারব? কেউ যদি একখণ্ড মৃত প্রস্তর হাতে তুলে নেয় ও তাকে চূর্ণ করতে চেষ্টা করে তবে সে দেখবে যে সঙ্গে সঙ্গে সেটি ঝুরঝুরে মাটিতে পরিণত হয়ে গেছে।

পৃথিবীতে তিন প্রকারের আগ্নেয় বিস্ফোরণ ঘটে থাকে। সেগুলো হ'ল (১) ভলকানিক (volcanic), (২) প্লুটোনিক (plutonic) ও (৩) টার্শিয়ারী (ter- tiary)। ভল্কানিক ধরনের ভূমিকম্পের ফলে ভূ–গর্ভস্থ প্রাচীন কঠিন শিলা বিপুল পরিমাণে ভূ–পৃষ্ঠের ওপরে উঠে আসে। আমরা আজ যা কিছু খনিজ পদার্থ পাচ্ছি সেগুলো এ ধরনের প্রাচীন শিলার সঙ্গেই মিশে থাকা উপাদান। এই ধরনের প্রাচীন শিলাস্তর যেখানে রয়েছে, সেখানে কিন্তু জ্বালানি তেল খুঁজে পাওয়া যাবে না, জ্বালানি তেল অথবা খনিজ তেল পাওয়া যাবে কেবলমাত্র পাললিক শিলা স্তরে অথবা সর–সমুদ্রের (sargasso sea) বুকে। যেখানে সর–সমুদ্র রয়েছে সেখানে কোন নদী তার বিপরীত স্রোতধারার বাধা ভেদ করে' সর–সমুদ্রের তলদেশে লম্বা খাদ তৈরী করে' সমুদ্র গর্ভে পতিত হয়। সর–সমুদ্রের তলাকার এই খাদের ভিতরে দীর্ঘকাল ধরে এসে জড় হয়

অসংখ্য মৃত জীবজন্তুর গলিত মরদেহ। পরবর্তীকালে এই সব মৃত জীবজন্তুর গলিত দেহের চর্বি থেকেই পেট্রোল বা জ্বালানি তেল সৃষ্ট হয়।

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার প্রাচীন কঠিন শিলা থেকে আমরা পাচ্ছি লোহা, সোণা, টাংষ্টন, ম্যাঙ্গানীজ ও মার্কিউরিক সালফেট জাতীয় অনেক ধরনের মূল্যবান খনিজ পদার্থ। পশ্চিম রাঢ়ে জ্বালানি তেল লাভের সম্ভাবনা কিন্তু খুব কমই রয়েছে।

বিশেষ কয়েক ধরনের নদী–উপত্যকা থেকেই জ্বালানি তেল পাওয়া যেতে পারে। যেখানে নদীবক্ষ বেশ প্রসারিত সেই ধরনের এলাকায় পেট্রোল পাবার সম্ভাবনা রয়েছে বেশী। দুর্গাপুর অবধি দামোদরের নদীবক্ষ ততটা বিস্তৃত নয়। তাই ওই অঞ্চলে পেট্রোল খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। 'দাম' শব্দের অর্থ হ'ল 'শক্তি' (energy) ও 'উদর' শব্দের অর্থ পেট। তাই দামোদর শব্দের অর্থ হ'ল যে নদী তার উদরে পর্যাপ্ত 'শক্তি' ধারণ করে রয়েছে। দুর্গাপুর ও বর্ধমানের মধ্যবর্তী স্থান গলসি থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগর অবধি দামোদরের ভাটিতে পেট্রোল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পেট্রোলের সন্ধান মিলতে পারে হুগলী, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলাতেও। বর্ধমান জেলার পূর্বাংশের মৃত্তিকা পশ্চিম রাঢ়ের মাটির মত অতটা প্রাচীন নয়। এই পূর্বাংশে পেট্রোল পাওয়া

যেতে পারে। বাংলাদেশের খুলনা ও বরিশাল জেলাতেও পেট্রোল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন অংশেও পেট্রোল পাওয়া যাবে। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার সমুদ্র- উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে পেট্রোল পাওয়া যেতে পারে। ভূতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে বলতে হয় পশ্চিম রাঢ় হ'ল ঠিক কোশল অঞ্চলের মত, আর পূর্ব রাঢ় উৎকল অঞ্চলের মত (কোশল ও উৎকল অঞ্চল বর্তমান ভারতের ওড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত)।

অতএব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিচারে বলতে হচ্ছে রাঢ় হ'ল বিপুল পুরাতাত্ত্বিক সম্পদে সমৃদ্ধ এক অতি প্রাচীন দেশ।

মানব-সভ্যতার সূত্রপাত

পুরাতত্ত্ব অনুসারে এই পৃথিবীতে একের পর এক বহু যুগ এসেছে ও গেছে। অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রেও তেমনি অনেক যুগের আসা-যাওয়া ঘটেছে যেমন ক্রেটাসিয়াস, প্যালিওসিন, ইওসিন, মাইওসিন, প্লাইওসিন, প্লেস্টোসিন [বা হলোসিন] প্রভৃতি। বর্তমানে পৃথিবীর বুকে চলেছে প্লেষ্টোসিনের যুগ। প্রতি যুগেরই রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, রয়েছে তাদের নিজের নিজের বিশেষ ধরনের জীবজন্তু (fauna) ও গাছপালা (flora)। তাই যাবার

আগে এক একটি যুগ তাদের পেছনে রেখে যায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পদচিহ্নগুলো।

একথা মনে রাখতে হবে যে, বিকাশ সংঘটিত হয় ভৌতিক স্তর অপেক্ষা মানসিক স্তরেই অধিক। মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্যে দৈহিক স্তরেও ঘটে চলে পরিবর্তন। সংরচনাগত জটিলতার প্রশ্নেও পুরুষ ও নারীর শরীরের মধ্যে নানা পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। মানুষের মানস-দেহের বিকাশ অনুযায়ী চিন্তা ও ভাবজগতেও পরিবর্তন এসে যায়। আজ থেকে এক লক্ষ বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে মানব জাতির মানস-ভূমিতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। যদিও এই পৃথিবীতে দশ লক্ষ বছর পূর্বে মানব জাতির আবির্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু আধুনিক মানবের উদ্ভব ঘটেছিল মাত্র ১ লক্ষ বছর ধরে। তারপরেও তারা সভ্য হয়ে ওঠবার আগে আরও অনেক দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সভ্যতার রাজপথে মানবতার পদযাত্রা মাত্র ১৫,০০০ বছর পূর্বে সুরু হয়েছে। এটা আমরা অনুমান করতে পারি এই সত্য থেকে যে মানুষ তখন থেকে তার ভাষার ব্যবহার শুরু করে' দিয়েছিল। বেদের প্রাচীনতম অংশ এই সময়েই সৃষ্ট হয়েছিল। আমরা এই তথ্যটা জানতে পারি বেদের প্রাচীনতম অংশের ভাষা, ও ১৫,০০০ হাজার বছর পূর্বেকার মানুষের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে নিবিড় সাদৃশ্যটুকু লক্ষ্য করে। **বৈদিক**

সভ্যতা হ'ল পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। প্রগতির চারটি স্মারক–কৃষি, চাকা, পোষাক ও অক্ষর সহ পূর্ণাঙ্গ মানব সভ্যতার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল ৭০০০ বছর পূর্বে। প্রথম যে মানুষ চিত্রধর্মী বর্ণমালার আবিষ্কার করেছিলেন সেটাও ৭০০০ বছরের পরবর্তী কালে। **প্রথম দর্শন মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন আজ থেকে ৪০০০ বছর আগে। পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক ছিলেন মহর্ষি কপিল।** তিনি সর্বকালের জন্যে মানুষের কাছে স্মরণীয় ও শ্রদ্ধাস্পদ হয়ে থাকবেন।

স্থান–কাল–পাত্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বিবর্তনও সংঘটিত হয়ে থাকে। আর এই পরিবর্তনের সঙ্গে সন্তুলন রক্ষার জন্যে মানসিক পরিবর্তনও ঘটে থাকে। মৌলিক মানবিক মূল্যবোধগুলি যেখানে যুগে যুগে খুব কমই পরিবর্তিত হয়, সামাজিক মূল্যবোধগুলো কিন্তু সেখানে বিশেষ বিশেষ সময়ের প্রভাবশালী সামাজিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্যে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

চারটি মুখ্য জাতি:

পৃথিবীতে চারটি মুখ্য জাতি (race) হ'ল অস্ট্রিক, আর্য, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো। এই জাতি চতুষ্টয়ের মধ্যে ও অন্যান্য মানব–প্রজাতির (sub-races) মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেগুলো

দু'টি পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা অনায়াসে নিদ্ধারণ করা যায়। পদ্ধতিদ্বয়ের একটি হ'ল নাসিকা-সূচক ও অপরটি করোটি-সূচক। করোটি-সূচক পদ্ধতিতে নাসিকাক্ষেত্র থেকে সুরু করে দুই কর্ণ-কুহর স্পর্শ করে' করোটিকে পূর্ণ- ভাবে বেষ্টন করে' পুনরায় নাসিকাক্ষেত্র অবধি পরিমাপ করা হয়। আর নাসিকা- সূচক হ'ল কোন নাসিকার সর্বনিম্ন ভূমি থেকে তার নাসিকাগ্র অবধি পরিমাপের একটি ভিন্ন পদ্ধতি। উদাহরণ স্বরূপ, আর্যদের নাসিকা-সূচকের আয়তন ক্ষুদ্র, কিন্তু তাদের করোটি-সূচকের আয়তন বড়। সে তুলনায় নিগ্রোদের নাসিকা-সূচকের আয়তন বড়, কিন্তু করোটি-সূচকের আয়তন সাধারণ পরিমাপের। নিগ্রোদের মাথার চুলগুলো হয় কোঁকড়ান, কারণ তাঁদের চুলের গোড়ায় সঞ্চিত চর্বিতে অধিক মাত্রায় পারদ (মার্কারি) জমে থাকে।

অস্ট্রিকদের বৈশিষ্ট্য:

অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী হলেন গণ্ডোয়ানাল্যান্ডের আদিম ও অকৃত্রিম অধিবাসী। তাঁরা 'গণ্ড' উপজাতি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন দীর্ঘকায় ও তাঁদের গাত্রবর্ণ ছিল কৃষ্ণবর্ণ। অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী দু'টি প্রধান উপশাখায় বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের একটি শাখার নাম রাজ-গোণ্ডা বা সর্দার, অপরটির নাম ধ্রুবা-গোণ্ডা বা সাধারণ গোণ্ডা।

'অষ্ট্রিক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত রূপ হ'ল অস্ত্র ইকক্স = অষ্ট্রিক। শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় যে মানুষটি অস্ত্র বহন করেন। অস্ট্রেলিয়া ও অস্ট্রিয়া দেশ দু'টির নাম এই 'অস্ট্রিক' শব্দ থেকেই এসেছে। অষ্ট্রিকদের শরীর হয় মাঝারি আকৃতির, নাক তীক্ষ্ণ ও গায়ের রঙ কৃষ্ণ–মৃত্তিকার মত (mud-black skin)।

আর্যদের বৈশিষ্ট্যঃ

আর্য বা ককেশীয় জাতির রয়েছে তিনটি উপশাখা এ্যালপাইন, ভূমধ্যসাগরীয় ও নর্ডিক। এদের মধ্যে নর্ডিক শ্রেণীভুক্ত আর্যরা বাস করে উত্তর মেরুর নিকটবর্তী স্থানসমূহে। তাদের দেহ বিশালকায়, গাত্রবর্ণ লালাভা–যুক্ত শ্বেত চোখ বিড়ালের চোখের মণির মত ধূসর রঙের (brown colour); চুলের রঙ সোণালী। ফিনল্যাণ্ড, উত্তর–রাশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এদের বসবাস। এ্যালপাইন গোষ্ঠীর আর্যদের দেহাকৃতি মাঝারি ধরনের, চুল ও চোখের রঙ নীল ও গাত্রবর্ণ দুধের মত শাদা। এই এ্যালপাইন গোষ্ঠীদের বসবাস ফ্রান্স, জার্মানী, পশ্চিম ইয়ুরোপ ও এশিয়ার কিয়দংশে। ভূমধ্যসাগরীয় আর্য জনগোষ্ঠীর চুলের রঙ কালো, চোখের মণিও কালো। তারা বাস করেন ককেশীয় অঞ্চলের দক্ষিণাংশে, স্পেন, পর্তুগাল ও

ইটালী প্রভৃতি দেশগুলোতে। ভারতের কশ্মিরী জনগণ ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

মঙ্গোলীয়দের বৈশিষ্ট্যঃ

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীতে রয়েছে মুখ্যতঃ পাঁচটি উপশাখা নিপ্পনীজ (জাপানী), চীনা, মালয়ী, ইন্দো-বর্মী ও ইন্দো-তিব্বতী। নিপ্পনীদের মুখাবয়বের আকার বড়, কিন্তু নাক চ্যাপ্টা, শরীর বড় ধরনের। চীনাদের নাকের আকার চ্যাপ্টা, চোখের পাতা ঢালু (slanting eyes), কিন্তু শরীরের আকার পেশীবহুল। অন্যান্য মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর শাখাগুলোর মত এঁদেরও গাত্রবর্ণ হরিদ্রাবর্ণের হয়ে থাকে। শরীরে অবশ্য লোম খুব কম। মালয় শাখার মানুষের বসবাস মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশসমূহে। দেহ শীর্ণকায়, ক্ষুদ্রাকৃতি ও নাক চ্যাপ্টা। ফিলিপীন প্রজাতির মানুষদের মুখের আকার ছোট। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে' রাখি - তাই, ইন্দোনেশীয় ও মালয় ভাষার উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত ভাষা থেকে।

ইন্দো-বর্মী শাখার মানুষেরা তুলনামূলকভাবে চেহারায় বড়সড়, নাক চ্যাপ্টা। আবাসস্থল ত্রিপুরা, মণিপুর, মিথেই, মিজোরাম, বর্মা ও তাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে।

ইন্দো-তিববতীয় শাখার লোকের বসবাস তিব্বত, লাদাখ, কিন্নর, নেপাল ও উত্তর বাংলায়। বোরো, থারু, গুরুং, নেওয়ারী, শেরপা, ভুটিয়া, লেপচা, খাসিয়া প্রভৃতি উপজাতি ইন্দো-তিব্বতীয় গোষ্ঠীভুক্ত। এদের দেহাকৃতি আর্যদের। মত। নাকের গড়ন চ্যাপ্টা, দেখতে সুশ্রী। এদের ভাষা একদিন তৈরী হয়েছিল সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণে। এদের কথা বলার মধ্যে নাসিকা ধ্বনির প্রাধান্য থাকে। লিপির নাম টেংড়ি। ইন্দো-তিব্বতীর ধ্বনিবিজ্ঞানে 'র' ধ্বনির ব্যবহার হয় কদাচিৎ। এই শাখার পুরুষদের মুখে থাকে হাল্কা শ্মশ্রু ও গুম্ফ। ইন্দো-তিব্বতীয় শাখার মহিলারা বেশী পরিশ্রমী, দীর্ঘ সময় ধরে' এক নাগাড়ে দৈহিক শ্রম করে' যেতে পারেন। এমনভাবে একটানা অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁরা করতে পারেন এই কারণে যে দেহের লিম্ফ্যাটিক গ্রন্থিগুলো (lymphatic glands) অধিক মাত্রায় সক্রিয়। তাই পুরুষদের তুলনায় পাহাড়ী রাস্তায় ওঠা-নামার কাজে তাঁদের দৈহিক সামর্থ্য বেশী।

নিগ্রোদের বৈশিষ্ট্যঃ

নিগ্রো জাতিতে রয়েছে তিনটি শাখা। সাধারণতঃ তাঁদের দৈহিক উচ্চতা সাড়ে ৫ থেকে ৬ ফুট পর্যন্ত। জুলু উপজাতিদের গড় উচ্চতা ছয় ফুট বা তারও অধিক। কিন্তু

পিগমীদের উষ্চতা পাঁচ ফুটেরও কম। এই পিগমী ও জুলু উপজাতিদের রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

বিমিশ্র জাতিগুলো:

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি (races) ও প্রজাতির (sub-races) মধ্যে আজ রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে যথেষ্ট পরিমাণে। যেমন বাঙালী জনগোষ্ঠীর রক্তে মিশেছে অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো রক্ত। দ্রাবিড়দের দেহে প্রবাহিত হচ্ছে অষ্ট্রিক ও নিগ্রো শোণিতধারা। বাঙালীদের মধ্যে যাদের গাত্রবর্ণ ফর্সা তাদের দেহে রয়েছে আর্য রক্ত। আমাদের রাঢ় অঞ্চলে মঙ্গোলীয় রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে কম। যদিও আজ যে জনগোষ্ঠীকে আমরা বাঙালী বলে জানি ও মানি তাদের শরীরে বইছে অস্ট্রিক, মোঙ্গলীয় ও নিগ্রোদের মিশ্র শোণিতধারা, কিন্তু ৰাঙলার ভূমিখণ্ডের যত দক্ষিণ– পশ্চিম দিকে এগোতে থাকব ততই ৰাঙালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব কমতে থাকবে। আবার বাঙলার উত্তর–পূর্ব কোণের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে দেখব মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব বাড়ছে। মিথিলার মানুষেরা অস্ট্রিক, নিগ্রো ও মঙ্গোলীয়দের মিশ্রণে গড়ে' উঠেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা দীর্ঘকায় তাদের ওপর মঙ্গোলীয় প্রভাব বেশী। বাঙলার যত পূর্বদিকে এগিয়ে যাবে

ততই দেখবে ৰাঙালীর দৈহিক উষ্চতা হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু পশ্চিম দিকে যদি যাও তবে দেখবে দৈহিক উষ্চতা বাড়ছে, মানুষেরা দীর্ঘদেহী। আরামবাগ, কিষাণগঞ্জ ও অঙ্গারার মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে যদি একটা কাল্পনিক সীমারেখা টানা যায় তবে দেখতে পাবে এই অঞ্চলের মানুষেরা তুলনামূলক ভাবে দীর্ঘকায়। শোণ নদীর ওপারে বসবাসকারী মানুষদের দেহ বড়সড়। ওই অঞ্চলের জন্তু–জানোয়ারদের শরীরও দীর্ঘ। ভোজপুরের মানুষদের দীর্ঘ দেহের তুলনায় গয়া ও ঔরঙ্গাবাদ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা কিছুটা খর্বকায়। এই অঞ্চলের জন্তু–জানোয়ারদের শরীরের আকৃতিও ছোটছোট। স্থানীয় 'জেবু' জাতীয় প্রাণীরা এখানে 'পাত্রী–গাই' (এক ধরনের গোরু) নামে পরিচিত। এই পানী গাই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের 'জেবু'– দের চেয়ে দীর্ঘকায়, কিন্তু পশ্চিমী দেশের গোরুদের তুলনায় আকারে ছোট।

দক্ষিণ ভারতে রয়েছে আর এক মিশ্র জাতি। ওই অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের গাত্রবর্ণ ফর্সা, তার কারণ তাঁরা সে অঞ্চলে এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে। মাদ্রাজের মানুষদের মধ্যে যাদের গাত্রবর্ণ কালো তাদের উদ্ভব ঘটেছে অস্ট্রিক ও নিগ্রোদের মিশ্রণে। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণদের দু'টো ভাগ রয়েছে আয়ার ও আয়েঙ্গার। আইয়ার ব্রাহ্মণরা শৈব, আর আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণব।

সূচীপত্র

ভারতে তৃতীয় বিমিশ্র জনগোষ্ঠীর উদাহরণ হ'ল হিমাচল প্রদেশের শিরমৌর অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা। এদের রক্তে মিশে আছে অষ্ট্রিক জাতির শোণিতস্রোত ও ভূমধ্যসাগরীয় আর্য শাখার রক্তধারা। গাত্রবর্ণ কালো। এককালে এই শিরমৌরের ভৌগোলিক আয়তন ছড়িয়ে পড়েছিল কুমায়ূন অঞ্চল থেকে সিমলা অবধি। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রাজস্থানের রাজপুতরা এই অঞ্চলে অনুপ্রেবশ করেছিল।

কিন্নর অঞ্চলের মানুষদের গাত্রবর্ণ হলুদ অথবা বাদামী। নাক চ্যাপ্টা ধরনের। কিন্তু দেখতে স্বর্গের অপ্সরাদের মতই সুন্দর। কিম্ + নরঃ = কিন্নর। কিম্ 'নর'? অর্থাৎ এরা কী মানুষ না অপ্সরা? যেহেতু দেখতে খুব সুন্দর তাই ওই অঞ্চলের নাম রাখা হয়েছিল কিন্নর। অনুরূপভাবে তিব্বত দেশটাকে প্রাচীনকালে বলা হত কিম্পুরুষবর্ষ। সে দেশের পুরুষের মুখে কদাচিৎ দাড়ি গোঁফ দেখা যেত। মেয়েরাও ঢিলেঢালা পোষাক ব্যবহার করতেন। ফলে সে দেশের মানুষদের মধ্যে কে পুরুষ আর কে মহিলা তার পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ত। দেশটাকে তাই বলা হত কিম্–পুরুষ–বর্ষ।

ভারতের বসবাসকারী বর্তমান মানুষদের মধ্যে রয়েছে ভূমধ্যসাগরীয় আর্যদের দু'টি গোষ্ঠী। একটি হ'ল সীদিও ভূমধ্যসাগরীয় শাখাভুক্ত মানুষ (Cytheo- Mediterranean)।

এরা আজ আমাদের কাছে গুজরাতী নামে পরিচিত। তোমরা লক্ষ্য করে' দেখবে গুজরাতীদের মুখের আদলটা অনেকটা ত্রিভুজাকৃতি। অন্য আর্য শাখাটির নাম প্রাম–সীদিও ভূমধ্যসাগরীয় (Pro-Cytheo-Mediterra- nean) জনগোষ্ঠী; আজ এরা ভারতে 'মারাঠী' নামে সুপরিচিত। এদের বংশগত উদ্ধৃতি ঘটেছিল শক্, হূণ, কুষাণ ও ইউচী প্রভৃতি উপজাতিদের রক্তের মিশ্রণে।

সেমিটিক প্রজাতি (Sub-race):

সেমিটিক গোষ্ঠীর লোকেরা এক গুরুত্বপূর্ণ মিশ্র প্রজাতির মানুষ। এদের শোণিতধারায় মিশে রয়েছে আলপাইন শ্রেণীর আর্য–রক্ত, ভূমধ্যসাগরীয় আর্য– রক্ত, নিগ্রো ও মধ্যাঞ্চলের মঙ্গোল রক্ত। আজ থেকে ১৫,০০০ বছর আগে এদের মধ্যে এই রক্তের মিশ্রণ ঘটেছিল। এই বিমিশ্র জনগোষ্ঠীকেই আজ সেমিটিক বলা হয়। সেমিটিক প্রজাতির মানুষদের কয়েকটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে– যেমন ৰৌদ্ধিক প্রবণতা, ও কোন একটা কাজ শুরু করলে তাকে সুচারু রূপে সম্পন্ন করবার তীব্র মানসিক সংকল্প ও ধৈর্য। এদের আদি বাসভূমি ছিল পারস্য ব্যাতিরেকে পশ্চিম এশিয়ার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল আজ যা মধ্য প্রাচ্য নামে পরিচিত।

সেমিটিক জনগোষ্ঠীর মূল ভাষা হিব্রু আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণের দু'টি ভাষায় বিভক্ত হয়ে যায়। পরিবর্তিত দক্ষিণী ভাষার নাম হয় আরবী ও উত্তরী ভাষার নাম হয় হিব্রু। উত্তরাংশের সেমিটিকদের গায়ের রঙ কিছুটা ফর্সা হলেও ভূমধ্যসাগরীয় আর্যদের তুলনায় কম ফর্সা। কিন্তু দক্ষিণাংশের সেমিটিক মানুষদের গায়ের রঙ কালচে ধূসর (darkish brown)। পুরাতন হিব্রু ভাষা ও আরবী লেখা হয় ডান দিক থেকে বাম দিকে। উভয় ভাষার মধ্যে রয়েছে নিকট সম্পর্ক। নিম্নোক্ত শব্দগুলোকে তুলনা করলেই সেই সম্পর্কটা আরও ভালভাবে ধরা পড়বে–

প্রাচীন হিব্রু	আরবী
জোসেফ	ইউসুফ
জ্যাকব	ইয়াকুব
সোলোমন	সুলেমন
অদম	আদম
ঈশা	জেসাস
শুক্রাত	সক্রেটীশ
মিরিয়ান	মেরী

অলিফ্	অলফা
সিকান্দ্রিয়া	আলেকজান্দ্রিয়া
ফিলিস্তান	প্যালেষ্টাইন

হিব্রু ও আরবী ভাষাভাষী উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'শুন্যৎ' (circumcission) প্রথা চালু রয়েছে। জাতি–বর্ণ–ধর্ম নির্বিশেষে প্রাচীনকাল থেকে সেমিটিক প্রজাতিভুক্ত সকল মানুষের মধ্যে এ প্রথা চলে আসছে। এই দুই ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের নগরনির্মাণ পদ্ধতি এমন ছিল যে শহরের প্রধান প্রধান পথগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছড়ান থাকত সরু সরু অসংখ্য অলিগলির পথজাল। সামাজিক আচার– আচরণের দিকটা লক্ষ্য করলে দেখা যায় লোকেরা রেঁস্তোরা বা খাবারের দোকানে খেতে বেশী পছন্দ করে। ইসলাম, ইহুদী ও খ্রীশ্চান ধর্মমত সেমিটিক প্রজাতির মানুষদেরই উপধর্ম। পূজা–প্রার্থনার নির্দিষ্ট দিনগুলো যথাক্রমে শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার। সংস্কৃত ভাষায় 'সেমিটিক'–কে বলে সমিতি।

ভাষা

তিব্বতী, লাদাখী, কিন্নরী ও পাহাড়ী–পাঞ্জাবী ভাষাগুলোতে ক্রিয়াপদের ব্যবহারের চেয়ে ক্রিয়া বিশেষণ বা জিরাণ্ডের ব্যবহারই অধিক। উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদের। ধর, বলা হচ্ছে

Ram is going বা রাম যাচ্ছে। কিন্তু ইন্দো–তীব্বতীয় গোষ্ঠীর ওই ভাষাগুলোতে তার অভিব্যক্তির রূপটা হবে–'Ram is in a moving stage': রাম চলমানতার অবস্থায় রয়েছে। সংস্কৃত ভাষা ও ইন্দো– তীব্বতীয় জনগোষ্ঠীর ভাষায় অনুস্বার ধ্বনির একটা প্রবণতা রয়ে গেছে। বাংলা বর্ণ ও তদ্ভব বর্ণ প্রায় একই ধরনের। বাংলা ভাষার ওপরেও ইন্দো–তিব্বতীয় ভাষার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

'খশ' শব্দের অর্থ দমন করা। যারা অন্যকে কষ্ট প্রদান করে বা দমন করে তাদের বলা হয় খশ। খশ রাজপুতরা স্থানীয় লোকেদের এককালে যথেষ্ট দমন–পীড়ন করেছিল। মুণ্ডারি ভাষায় 'ডিক্কা' শব্দের অর্থ দমন–পীড়ন করা বা কষ্ট দেওয়া। তাই এই ভাষাগুলোতে বহিরাগতদের বলা হয় 'ডিক্কু'। 'খশ্' মেরু খশ্মীর বা কশ্মীর। কশ্মীর দেশ থেকে ছুতোররা এককালে হিমাচল প্রদেশে গেছলেন। তাই তাঁদের বলা হয় কশমেরু (বাংলার তাদের বলে সূত্রধর)।

'আর্য শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে 'ঋ'–ধাতুর সঙ্গে 'যৎ'–প্রত্যয় যুক্ত করে। 'ঋ' ধাতুর অর্থ দ্রুত গতিতে এগিয়ো চলা।

সামাজিক রীতি:

শিব জন্ম নিয়েছিলেন ইন্দো–তিববতীয় জনগোষ্ঠীতে। তাঁর তিন স্ত্রী ছিলেন

পার্বতী, গঙ্গা ও কালী। পার্বতী ছিলেন আর্য কন্যা। তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল গৌরবর্ণ। গঙ্গা ছিলেন মঙ্গোল কন্যা। তাঁর গায়ের রঙ ছিল পীতবর্ণ, আর কালীর জন্ম হয়েছিল নিগ্রো গোষ্ঠীতে। শিব যাতায়াত করতেন ইয়াক বা চমরী গোরুর পিঠে চড়ে।

আজও লাদাখ, তিব্বত ও কিন্নর অঞ্চলে বিবাহিতা নারীদের একাধিক স্বামী রয়েছে (polyandry)। দ্রুপদ রাজ্য তিব্বত বা কিন্নর অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীও এই দ্রুপদ রাজ্যেরই কন্যা ছিলেন।

এই সব অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলার সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক পদ্ধতিকে আংশিকভাবে মেনে চলে। এ ব্যবস্থায় নারীরা যথাযোগ্য গুরুত্ব পেয়ে থাকেন।

আনন্দনগর:

দূর অতীতে, নয় থেকে দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে আনন্দনগরের নিকটবর্তী ডিমডিহা পাহাড়ের চূড়া এক আগ্নেয় বিস্ফোরণের ফলে উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেছল। এই অগ্ন্যুৎপাতের

ফলে পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল ডিমডিহার পার্শ্ববর্তী প্রায় দু'মাইল ব্যাসার্ধযুক্ত এলাকায়। হঠাৎ এ ধরনের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সেদিন ওই এলাকার সকল হতভাগ্য পশু ও মানুষেরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। ওই অঞ্চলের তাপমাত্রায় হঠাৎ অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায় সকল প্রাণীই মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও পরবর্তীকালে তাদের দেহ জীবশ্মে পরিণত হয়। সেই সুদূর অতীতের অশিক্ষিত মানুষেরা ভেবেছিল সেদিনের এই আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের পেছনে দেবী চণ্ডীর হাত আছে। অগ্ন্যুৎপাতের মুখগহ্বরকে বলা হয় জ্বালামুখী।

এই পৃথিবীতে প্রথম সাধনা অভ্যাস শুরু করেছিলেন ভূমধ্যসাগরীয় ককেশীয়ান গোষ্ঠীর ও ইন্দো–তিব্বতীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা। তার পরবর্তীকালে সাধনা শেখেন মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর মানুষ ও এ্যালপাইন শ্রেণীর আর্যরা। তাঁদেরও পরে সাধনা শেখেন নর্ডিক, ককেশীয় ও অস্ট্রিকগণ। নিগ্রো জনসাধারণের মধ্যে আনন্দমার্গই প্রথম আধ্যাত্মিক সাধনা শেখানো শুরু করেছে। ঋগ্বেদীয় উপাসনা পদ্ধতি শুরু করেছিলেন আর্যরা, কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার অভ্যাস প্রথম শুরু হয়েছিল এই ভারত ভূখণ্ড থেকে।

মানব সমাজের সকল জাতি (race) ও প্রজাতির (sub-race) ভিতরে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভাববিগ্রহ হলেন

পরমপুরুষ। তিনি মহাবিশ্বের সমগ্র সত্তার শীর্ষেন্দু। পরমপুরুষই হলেন চরম ও পরম সত্তা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর যত সত্তা আছে সেগুলো সবই সগুণাশ্রিত, কেবলমাত্র পরমপুরুষই হলেন নির্গুণ সত্তা। তিনিই সবার পিতা ও সকল পিতার পরম ও চরম পিতা।

২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮৭, আনন্দনগর

সুসংবদ্ধ কৃষি

কৃষিকাজের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিক স্বনির্ভরতা। তাই তা উৎপাদনমুখী হওয়া উচিত। সেই ধরনের কৃষিকাজের অর্থই হচ্ছে বহিঃপণ্যের ওপর [নিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে উৎপন্ন] নির্ভরশীল না থাকা। তাই সুসংবদ্ধ কৃষি (integrated farming) বলতে বোঝায় বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উৎপাদন, ফলোদ্যান চর্চা বা ফলের চাষ (Horticulture), পুষ্পচাষ, রেশম চাষ, লাক্ষা চাষ, মউমাছি পালন, গোষ্ঠপালন ও পশুপালন, মৎস্যচাষ, কীটঘ্নের ব্যবহার, উপযুক্ত সারের প্রয়োগ, কুটির শিল্প, শক্তি উৎপাদন, কৃষি

গবেষণাগার, জল–সম্পদের সংরক্ষণ। কৃষি সম্পর্কে এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে তবেই কৃষিক্ষেত্রে স্বয়ংনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব। আর এই নীতিই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

■ **কৃষি কাজ** (Farming)

কৃষি (Agriculture) বলতে বোঝায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে জমি চাষ, পশুপালন ইত্যাদি। মুখ্য ফসলের উৎপাদন এর অন্তর্ভুক্ত যেমন, বিভিন্ন রকমের ডালশস্য, খাদ্যশস্য, মোটাদানার শস্য, তৈলৰীজ, ইক্ষু ও শাকসব্জী ইত্যাদির উৎপাদন। ডাল থেকে শরীরের জন্যে অত্যাবশ্যক প্রোটিন তো পাওয়া যায়ই, তাছাড়া ডালচাষ জমিতে নাইট্রোজেনের মাত্রা প্রাকৃতিক ভাবে ৰাড়িয়ে দেয়। ডালচাষে অবশ্য ক্যালসিয়াম ফসফেট, পটাশ ইত্যাদি সার প্রয়োগেরও দরকার হয়।

সব রকমের মূল খাদ্য শস্যই (cereals) শ্বেতসার সমৃদ্ধ যেমন ধান, গম, ভুট্টা, যব, ৰার্লি, রাই ইত্যাদি। মোটা দানার খাদ্য শস্য হ'ল বাজরা, জোয়ার, বার্লি, রাই ইত্যাদি।

তৈলৰীজ বলতে বোঝায় সরষে, সোয়াৰীন, তিল, তিসি, সূর্যমুখী, বাদাম ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে ভারত ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে বীজ–বিনিময় হওয়া উচিত।

চাষের চীনী–শস্যের মধ্যে পড়ে ইক্ষু, সুগারবীট, খেজুর, তাল ইত্যাদি। মশলা চাষের মধ্যে পড়ে লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে, জিরা, হলুদ ইত্যাদির চাষ। এছাড়া বিভিন্ন রকমের ঔষধীয় উদ্ভিদের চাষ করা যেতে পারে। আনন্দনগরে ভেষজ–কেন্দ্র বা ভেষজ–উদ্যান স্থাপন করা উচিত। অন্যান্য চাষের মধ্যে পড়ে চা, কফি, কোকো, রবার ইত্যাদি। চা–বাগান ও রবার–বাগান স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থে অর্থকরী ফসল হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে অর্থকরী ফসলের উৎপাদন সহায়কতত্ত্ব হিসেবে কাজ করবে। অর্থকরী ফসলের উৎপাদন সমবায়ের মাধ্যমে হলে দেশের গরীব স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক মান অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষে গ্রীষ্ম, শীত বা সব ঋতুর উপযোগী বিভিন্ন শাকসব্জীর চাষ হয়ে থাকে। তরিতরকারীর উৎপাদন বাড়ানো উচিত। পেঁয়াজ–রসুনের উৎপাদন করা হয় সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রয়ের জন্যে, ও ঔষধ প্রস্তুতের জন্যে, যদিও সাধনা ও যোগাসন–অভ্যাসকারীদের পক্ষে তা উপযোগী নয়।

হলুদ, সর্ষে, বড় দানার মুসূর আর গমের ক্ষেত্রে আশু বা জলদী (early variety), মধ্যম (medium variety) ও বিলম্বিত (late variety) এই তিন প্রজাতিরই চাষ করা যেতে পারে। কিন্তু ধানের ক্ষেত্রে এই রকম বাছাইয়ের সুযোগ নেই [বোরো

ধান ছাড়া]। যদি কোন ফসলের তিন প্রজাতিরই চাষের সুযোগ থাকে, আর তার জন্যে যথেষ্ট সময়ও পাওয়া যায় তাহলে জলদী প্রজাতিরই চাষ প্রথমে করা উচিত। এর জন্যে এমনভাবে পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে যে, সামগ্রিকভাবে সেই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যদি কোনও কারণে জলদী প্রজাতির চাষ ব্যর্থ হয় তাহলে মধ্যম প্রজাতির চাষ করা উচিত। যদি সবকিছু ঠিকঠাক চলে তাহলে এই মধ্যম প্রজাতির উৎপাদন আশু অর্থাৎ জলদী প্রজাতির প্রায় সমানই হবে। আর যদি দ্বিতীয়টির চাষ ব্যর্থ হয় তখন বিলম্বিত প্রজাতিকে বেছে নেওয়া উচিত। যদি মরসুমের প্রথমেই নাবী (late) জাতের চাষ করা হয় আর তা ব্যর্থ হয়, তাহলে পরে আর কোনও চাষের সুযোগ থাকবে না, ও চাষীর সেই মরসুমটাই সম্পূর্ণ মার খাবে। জমিতে দ্বিতীয়বার সেচ দেওয়ার সময় আগাছা পরিষ্কার করে' নিয়ে তরল সার প্রয়োগ করা উচিত। জমিতে তরল সার দেওয়ার সময় দেখতে হবে সেই সার যেন বিষাক্ত না হয়, ও তাতে ধানের জমিতে পালিত ক্ষুদ্র মৎস্যের ক্ষতি না হয়।

পাথুরে জমিতেও ভাল মাটি ফেলে চাষের উপযুক্ত করে' তৈরী করা যেতে পারে। ছোট ছোট ডুংরিতে যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে গোষ্ঠ খাদ্য হিসাবে নেপিয়ার ঘাসের চাষ করা যেতে পারে। অবশ্য তার থেকে উঁচু পাহাড়ী এলাকায় জলের

প্রাচুর্য না থাকায় এই ঘাসের চাষ অত্যন্ত কঠিন। তবুও সম্ভবপর হলে সেই চেষ্টা করা উচিত, যাতে উত্তম মানের চাষের জমিকে শুধু ফসল উৎপাদনেই কাজে লাগানো যায়।

যদি চাষের জমির মধ্য দিয়ে রেলের লাইন গিয়ে থাকে তবে লাইনের দু'-পাশে ঠিক্রে মটর ও বিলম্বিত আউশ অথবা কালো ছোলার চাষ করা উচিত।

যদি শীতপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের গাছের বা ফসলের চারা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে লাগানো হয় তাহলে তা লাগানো উচিত উঁচু জমিতে, সম্ভব হলে পাথর বা পাহাড়ের ধারে, যাতে রাতে তারা ঠাণ্ডা আবহাওয়া পায়।

সব চাষের জমির (যেখানে পুষ্পোদ্যান আছে বা পার্ক আছে তা বাদে) সীমানা সংলগ্ন যে জায়গা থাকে তাতে নিম্নোক্ত চাষ করা উচিত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সেই সময়ের উপযোগী শাক, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বীন, শরৎ ও শীতেও বীন। বিউটি স্পটের ক্ষেত্রে (শোভা কানন) বেড়ায় (fencing) লতানে ফুল লাগানো উচিত।

চাষবাসের মধ্যে আরও কিছু বিশেষ ক্ষেত্র আছে যা জরুরী পরিস্থিতিতে মানুষের প্রাণধারণের সহায়ক হতে পারে তা হচ্ছে শাক-সব্জী, ডাল, আলু, এমনকি গোষ্ঠখাদ্যের চাষ, যা দুগ্ধ উৎপাদনের জন্যে অত্যাবশ্যক।

■ ফলোদ্যান চর্চা বা ফলের চাষ (Horticulture)

Horticulture-এর অর্থ হ'ল মূলতঃ ফলের চাষ। বিভিন্ন রকমের ফল চাষ কৃষি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ফল থেকে জ্যাম, মার্মালেড, জেলী, মেওয়াফল ইত্যাদি তৈরী হতে পারে।

■ পুষ্প চাষ (Floriculture)

বিভিন্ন ফুলের চাষ এর মধ্যে পড়ে যেমন, যুঁই, চাঁপা ও গোলাপ ইত্যাদি ফুল থেকে এসেন্স তৈরী হতে পারে, যা থেকে অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যও প্রস্তুত করা যায়। গোলাপের মত রজনীগন্ধার ব্যাপক উৎপাদন করে' সারা পৃথিবীতে তা বিক্রয় করা 'যেতে পারে। গোলাপ লাল মাটিতে ভাল জন্মায়। পদ্ম থেকে পদ্মমধু সংগ্রহ করা যেতে পারে, যা অক্ষিপটের স্থানচ্যুতি সহ সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের মহৌষধ।

পদ্ম, লিলি, কলকে, কটনফুল (কটন গাছের ফুল) ইত্যাদি থেকে ভাল জাতের মধু পাওয়া যায়। শাল গাছের ও কটনফুলের গাছ থেকে প্রচুর মধু পাওয়া যায়। এই সব গাছ থেকে প্রাপ্ত মধু ফুল থেকেই সরাসরি সংগৃহীত হয়, মউমাছির মাধ্যমে নয়। এরা সব পুষ্প চাষের অন্তর্ভুক্ত।

ইনজেশনের সিরিঞ্জ বা ড্রপারের সাহায্যেও পুষ্প মধু সংগৃহীত হয়। আমরা ছোটবেলায় পদ্ম ৰীজ খেতুম। সেই সময়ে সমগ্র বর্দ্ধমানেই পদ্ম পাওয়া যেত।

তখন আমরা ফুল থেকে মধু চুষে বা চেটে খেতুম। যেহেতু পুষ্প মধু থেকে নানা ঔষধ প্রস্তুত হয় তাই বাজারে তা ভালো দামেই বিক্রয় হতে পারে। আগেই বলা হয়েছে চিকিৎসকেরা সিরিঞ্জের সাহায্যে যেভাবে শরীর থেকে রক্ত নিষ্কাশন করেন, সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করে' ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে হয়। এর কারণ হচ্ছে পিঁপড়ে ও নানা রকমের কীট মধু খেতে গিয়ে ওখানেই আটকে যায়। তাই একমাত্র সিরিঞ্জের মাধ্যমেই ৰাধাহীন ভাবে মধু নিষ্কাষণ করা সম্ভব।

ঢেঁড়সের শুকনো গাছ একটি বিশেষ কাজে লাগানো যায়। আনারসের ক্ষেতে কখনও কখনও ফুল–ফল কিছুই আসে না, বা আসতে অনেক দেরী হয়। সেক্ষেত্রে এই ঢেঁড়সের গাছ পুড়িয়ে তার ধোঁয়া ক্ষেতে ছড়িয়ে দিলে তার ছাই–এর প্রভাবে আনারসের ফুল–ফল তাড়াতাড়ি এসে যাবে। এতে আনারসে গাছের কোন ক্ষতি হবে না, শুধু সতর্ক থাকতে হবে যেন গাছ পুড়ে না যায়।

যাইহোক, এই পুষ্প চাষকে অবহেলা করা হয়েছে, সেভাবে কাজে লাগানো হয়নি। একে ঠিকভাবে বিকশিত করা উচিত।

আনন্দনগরের গোলাপ বাগান থেকে গোলাপের নির্যাস আর গোলাপ জল সহজেই তৈরী হতে পারে।

■ কীট থেকে উপযোগী বস্তুর উৎপাদন (Sericulture)

এর তিনটি শাখা আছে রেশম চাষ, লাক্ষা চাষ আর মউমাছি পালন। চার প্রকারের রেশম কীটের মধ্যে তুঁত রেশমের ক্ষেত্রে লার্ভা বা পলু পোকা তুঁতের পাতা খেয়ে বর্ধিত হতে থাকে। মুঙ্গা রেশমের বেলায় তা শোজনের পাতা ও অসমীয়া সোঁয়ালু ইত্যাদির পাতা খেয়ে প্রতিপালিত হয়। তসরের পোকার খাদ্য হ'ল অর্জুন, কুল, আসন, শাল, শ্বেতশাল ইত্যাদির পাতা। এণ্ডি রেশমের পোকা খায় রেড়ির পাতা।

তুঁত–রেশমের পোকা এক ধরনের গৃহপালিত (domesticated) প্রজাতির কীট। কিন্তু তসরের পোকা প্রাকৃতিক ভাবে জন্মানো কীট। এক্ষেত্রে তসরের রেশম–গুটি গাছের ওপর রেখে দেওয়া হয় আর লার্ভা নিজের থেকেই গাছের পাতা খেয়ে বর্দ্ধিত হতে থাকে। ডিম পাড়ার পরে রেশম গুটি গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। তসরের উৎপাদনে গাছকে সাধারণতঃ ছয় ফুট উচ্চতার মধ্যে রাখতে হয়, যাতে রেশমগুটি সংগ্রহ কষ্টসাধ্য না হয়। [কিন্তু এটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।]

তুঁত রেশমের পোকা (moth) যে ডিম পাড়ে তা সংগ্রহ করা হয়। ডিম থেকে লার্ভা বেরিয়ে পাতা খেতে থাকে [গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে খাওয়ার জন্যে দিতে হয়।] আর তারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেই নিজের চারিপাশে রেশম গুটি (cocoons) 'তৈরী করে' নেয়। জলে সিদ্ধকরলে বা রোদে শুকিয়ে নিলে গুটির মধ্যেকার লার্ভা মরে যায়। তারপর সেই গুটি থেকে রেশমের সূতো প্রস্তুত হয়। রেশম উৎপাদন একটি লাভজনক শিল্প আর রেশমের বস্ত্র এক উৎকৃষ্ট মানের তথা মহার্ঘ বস্ত্র বলে গণ্য করা হয়। তুঁত গাছ আর কুল গাছ থেকে ভাল ফলও পাওয়া যায়। তুঁত- রেশম গাছের (plant mulberry--not cutivable mulberry) চারিপাশে অন্যান্য ফসলের উৎপাদন করা যেতে পারে, তাতে কৃষি জমির সর্বাধিক উপযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। [এখানে চাষ-তুঁতের কথা বলা হচ্ছে না।।

এক্ষেত্রে কলমজাত তুঁতের চারার (grafted) চেয়ে কলম না-করা চারায় পাতা বা ঝাড় (foliage) বেশী হয়। বাংলার মালদহে এই তুঁত রেশমের চাষ ভাল হয়। তুঁতের চারাগাছ এমন ভাবে লাগানো উচিত যে গাছের ছায়া যেন চাষের ক্ষেতের ওপর না পড়ে।

দু'টি তুঁত গাছের মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নোক্ত গাছ লাগানো যেতে পারে- (ক) অত্যন্ত পাথুরে এলাকায় যেখানে মাটি একদমই নেই সেখানে বাইরে থেকে মাটি আনিয়ে জমিতে

ফেলতে হবে। তারপর দু'টি তুঁত গাছের মাঝখানে তালি বর্গীয় গাছ, ভারতীয় প্রজাতির কুল, আতার কচি চারা (বীজ-জাত চারাগাছ নয়) লাগানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে আতা আর কুলের ব্যাপারে ভালভাবে গবেষণা হওয়া উচিত। (খ) অত্যন্ত পাথুরে জমিতে যেখানে পাথরের খাঁজে খাঁজে মাটি আছে সেখানে দু'টি তুঁত গাছের মধ্যবর্তী স্থানে কাঁটাযুক্ত পানিয়ালা আর আতা লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে পানিয়ালার (কন্টকযুক্ত) ওপর গবেষণা হওয়া উচিত। (গ) কম পাথুরে জমিতে দুই তুঁত গাছের মধ্যিখানে অকন্টক পানিয়ালা আর আতা লাগানো যেতে পারে। অকন্টক পানিয়ালার ওপরও গবেষণা হওয়া উচিত। (ঘ) মাটি যেখানে ভালো সেখানে ক্ষীর-খেজুর আর আতা লাগানো যেতে পারে।

যতদূর সম্ভব বিদেশ থেকে, বিশেষ করে ফিলিপিন্‌স্‌ থেকে বৃহৎ প্রজাতির আতা গাছ এনে লাগানো উচিত। তুঁত গাছের কাঠ থেকে নানা ক্রীড়া-সরঞ্জাম তৈরী হতে পারে।

এর পরে আসবে লাক্ষা উৎপাদনের কথা। পলাশ, কুল, কুসুম গাছে লাক্ষাকীট প্রতিপালিত হয়। তবে সব কুল গাছে লাক্ষার চাষ না করাই ভাল, কেননা তাহলে ভাল জাতের কুলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বিভিন্ন আসবাবপত্র কীটের

সংক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যে লাক্ষাকে বার্ণিশ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মউমাছি চাষে মউমাছি বিভিন্ন ফুল থেকে সংগ্রহ করে' পরিশুদ্ধ মধু ও মোম তৈরী করে। তিন প্রজাতির মউমাছির মধ্যে এক্ষেত্রে সব প্রজাতিই কাজে লাগে - বন্য-মউমাছি অর্থাৎ রক-বী যা পোষ মানে না [জঙ্গলে চাক বাঁধে।], বুশ- বী যা পোষ মানে আর এপিস-ইণ্ডিকা। বিশেষ প্রজাতির মউমাছির ব্যবহারকেই প্রোৎসাহন দেওয়া উচিত। তবে রক-ৰীকেও বাগানে চাক বাঁধতে ৰাধা দেওয়া উচিত নয়।

তৈলৰীজ, সব ঋতুর শাকসব্জী, মহুয়া আর আঙুরের খেতের পাশে মউমাছির চাকযুক্ত বাক্স (bee-boxes) রেখে দেওয়া উচিত। তার থেকে নিয়মিতভাবে মধু বের করে' নেওয়া যেতে পারে। বাঙলায় উপরি-উক্ত গাছে ফুল আসার উৎকৃষ্ট সময় হচ্ছে মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন। অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ গাছে যেখানে প্রাকৃতিকভাবে মধু তৈরী হয়, তা থেকেও মধু সংগ্রহ করা যেতে পারে। সব রকমের পুষ্পজাত মধুর ওপরেই গবেষণা বাঞ্ছনীয়।

- গোপালন (Dairy farming)

এর অনেক শাখা আছে– যেমন, গোরু ও মহিষ থেকে দুগ্ধ উৎপাদন, পশম আর দুধের জন্যে ভেড়া প্রতিপালন, ছাগল প্রতিপালন ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে পশু প্রতিপালন শুধু কসাইখানায় পশুকে বিক্রি করার জন্যে নয়। দুধ থেকে গুঁড়ো দুধ তৈরী করে' আর দই কে নির্জলীকরণ করে' সংরক্ষিত রাখা উচিত।

■ জলসেচ

কৃষিকাজে জলসেচের গুরুত্ব অপরিসীম। নীতিগতভাবে মাটির নীচের জল সেচের কাজে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। ভূগর্ভস্থ জলের অধিক ব্যবহার হলে জলের স্তর নীচে নেমে গিয়ে প্রবল জলসঙ্কটের সৃষ্টি করবে। ভূপৃষ্ঠস্থ জলের (surface water) সর্বাধিক ব্যবহারই সবচেয়ে ভাল। বৃষ্টির জল, এমনকি হালকা

বর্ষণ হলেও, ঠিকভাবে তা সংরক্ষিত করে' রাখা উচিত। কোনও কোনও মরুভূমির নীচে জলের ভাণ্ডার থাকে, কিন্তু তার ব্যবহার করলে ভালোর থেকে মন্দই বেশী হবে। সব অবস্থাতেই ভূপৃষ্ঠস্থ জল সংরক্ষণ করে' রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে জল সংরক্ষণ, অরণ্য রচনা আর জলসেচ মরু অঞ্চলের পতিত জমি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। ভারতের থর মরুভূমির মধ্য দিয়ে খাল

তৈরী করে' গঙ্গার জল নিয়ে গিয়ে জমি চাষ করা হচ্ছে। এইভাবে রাজস্থানের গঙ্গানগর এলাকায় মরু জমি উদ্ধার করা হয়েছে, ও তাতে এখন বিপুল পরিমাণে গমের চাষ হচ্ছে। এই খাল থর মরুর আরও অভ্যন্তরে প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। জলসেচের জন্যে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারের চেয়ে ভূপৃষ্ঠস্থ জলের ব্যবহার ও সংরক্ষণ অধিক বাঞ্ছনীয়।

পরিবেশবিদদের মতানুসারে কিছু মরুভূমি অবশ্যই থাকা উচিত, যাতে বিশ্বের আবহাওয়াগত ভারসাম্য রক্ষিত হয়। মরু অঞ্চলে দিনের বেলায় অতি উষ্ণ তাপাঙ্ক আর রাত্রিকালে শীতল আবহাওয়া এই দুইয়ে মিলে এক অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মরু অঞ্চলের শুষ্ক, গরম হাওয়া সহজেই ওপরে উঠে গিয়ে শূন্যতার সৃষ্টি করে' চারিপাশের বায়ুকে আকর্ষণ করে বা টেনে আনে। এর ফলে এক পৌনপৌণিক-প্রতিক্রিয়াধারার (chain reaction) জন্ম হয়, সমুদ্র থেকে আর্দ্র বাতাস আসতে থাকে, আর তা বৃষ্টিপাত ঘটায়। যদি পৃথিবী সম্পূর্ণ মরুশূন্য হয়ে যায় তাহলে স্থলভাগে সামগ্রিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে যাবে।

কোনও কোনও গাছ জলভরা মেঘ আকর্ষণ করে। তারা হচ্ছে-শিরীষ, শিশু, হিমালয়ান শ্বেত ওক, ফার্ণ ইত্যাদি। এই গাছেরা অন্য গাছের জন্যেও এক অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে।

■ মৎস্য চাষ (Pisciculture)

বড় জলাশয়, পুকুর, জলাধার এইসব স্থানে মাছের চাষ হওয়া উচিত, কেননা তাতে জল–সংরক্ষণ ও জল–পরিশোধনের সুবিধা হয়। বর্ষাকালে ধানের ক্ষেতেও মাছের চাষ হতে পারে। মাছ আবার পাখীর স্বাভাবিক খাদ্য। তাই [মৎস্য চাষ] পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য।

■ ক্ষতিকর কীট–পতঙ্গের নিয়ন্ত্রণ (Pest control)

বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসের শেষ সপ্তাহে ধানের ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে জল জমে থাকে। এতে ভালভাবে মাছের চাষ করা যায়। কিন্তু ধানের চারা যতক্ষণ বড় হচ্ছে ততক্ষণ জেলেদের সেই মাছ ধরতে দেওয়া উচিত নয়। এই ধরনের জমিতে ক্ষতিকর কীটয়ের ব্যবহার করা উচিত নয়, কেননা তাতে মাছ মরে যাবে আর তা সেচ–ব্যবস্থাকেও দুষিত করে' দেবে।

বিকল্প কীটনাশক, যেমন নিম থেকে প্রস্তুত কীটনাশকের ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি কপার সালফেটের ব্যবহার করতে হয় তবে তা খুবই কম মাত্রায় করা উচিত, কেননা তা ক্ষতিকর। ধান রোপণের আগে যখন জমিতে শেষ চাষ দেওয়া হয় তখন নিমখোল দিয়ে কর্ষণ করা উচিত। এর অতিরিক্ত যখনই কীটের আক্রমণ হবে তখন সারের সঙ্গে

সূচীপত্র

মিলিয়ে নিম কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত। কপার সালফেটের মিশ্রণও ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাছ হচ্ছে পাখী, শিয়াল, খেঁকশিয়াল, বৃহৎ মাছ বা বৃহৎ কাঁকড়ার খাদ্য। ধানের ক্ষেত থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পুকুর, সরোবর বা নদীতে গিয়ে পড়লে তাতে ছোট মাছ জন্মাবে আর তা বড় মাছ, পাখী বা আমিষাশী পশুর খাদ্য হবে। এইভাবে চাষীও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

কিছু নির্দিষ্ট ফসলের জন্যে বিশেষ কীটনাশক ঔষধ তৈরী করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ফুলকপিকে পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যে সাবান জলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ কেরোসিন মিশিয়ে তা ক্ষেতে স্প্রে করে দেওয়া উচিত। এর ফলে ফুলকপি পরিষ্কৃত হয়ে কীটমুক্ত হয়ে যাবে আর তা মানুষের পক্ষেও অনুপযোগী হবে না। পটোলের ক্ষেত সাধারণতঃ সাপের পছন্দসই জায়গা। তা থেকে বাঁচতে ঈশাণমূলের ব্যবহার করা যেতে পারে, কেননা সাপ ঈশাণমূলের গন্ধকে ভয় পায়। সাপ কপার সালফেটকেও ভয় পায়। যেখানে এই কপার সালফেট পাওয়া যায় যেমন– টাটানগরের কাছে ঘাটশিলা, মউবন্দর– সেই সব স্থানে সাপ দেখতে পাওয়া যাবে না। ব্রোঞ্জের পাত্রে জল রেখে দিলে তা

যে এ্যান্টিসেপটিকে পরিণত হয় তার কারণ হচ্ছে ব্রোঞ্জে কপার থাকে। কপার সালফেট মানুষের পক্ষে বিষাক্ত জিনিস।

■ সারের ব্যবহার

সুদূর অতীতে অতিকায় জানোয়ারেরা মৃত্যু সন্নিকট বুঝলে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে চলে যেত। বন্য হাতীর এখনও এই স্বভাব আছে। এইসব স্থানে সঞ্চিত পশুর হাড় কালের বিবর্তনে ক্যালসিয়াম সালফেট বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে রূপান্তরিত হয়েছে। যেখানে যেখানে ক্রেটাসিয়াস যুগের বৃহৎ জানোয়ারেরা যূথবদ্ধভাবে বাস করত সেখানে চুণাপাথর পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ অসমে চুনাপাথর ও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাবে। এই বিশাল আকৃতির জানোয়ারের দেহের বসা বা চর্বি পেট্রোলিয়ামে আর হাড় চুণাপাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। চুণাপাথর দিয়ে যেমন ভালজাতের সিমেন্ট তৈরী হবে তেমনি জমিতে এর ব্যবহার করলে কমলানেবুর মিষ্টত্ব বেড়ে যাবে। রাঢ়ের ঝালদা, জয়পুর অঞ্চলে এই চুণাপাথর দেখতে পাওয়া যায়।

জৈব–অজৈব এই দুই রকমেরই সার হতে পারে। যখন জমিতে সার প্রয়োগ করা হচ্ছে তখন অপ্রত্যক্ষভাবে ব্যাকটিরিয়ারও ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ব্যাকটিরিয়া ধনাত্মক–ঋণাত্মক দুই ভাবেই কাজ করে। যখন তুমি জৈব

সারযুক্ত ব্যাকটিরিয়ার ব্যবহার করছ তখন তার প্রভাবে ব্যাকটিরিয়ার কার্যকারিতাও ধনাত্মক হবে। তোমাদের জৈব সারের ব্যবহার, তার ধনাত্মক প্রভাব এই সব নিরীক্ষণ করে' ধনাত্মক মাইক্রোবাইটাম সম্বন্ধে বৈবহারিক গবেষণার ব্যবস্থা করা উচিত।

পশুজাত জৈব সারের মধ্যে ভেড়ার মূত্র ও বিষ্ঠা সর্বোত্তম। রাঢ়ভূমিতে যে ভেড়া প্রতিপালিত হবে তা ৰাঙলায় অন্যান্য অঞ্চল, জম্মু, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ থেকে আনানো যেতে পারে। অষ্ট্রেলীয় প্রজাতিরও ব্যবহার করা যেতে পারে। বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্যে ব্যবহৃত উপকরণ হচ্ছে গোরু–মহিষ–ভেড়ার গোবর, সংরক্ষিত কাননের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিষ্ঠা ও বিভিন্ন কানন থেকে সংগৃহীত জৈব বর্জ্য। বায়োগ্যাসের জন্যে কচুরিপানাও একটি ভাল কাঁচামাল। কিন্তু সর্বোত্তম হচ্ছে গোবর। স্বাভাবিক বা শুদ্ধ প্রজাতির পশুদের চেয়ে হাইব্রিড পশুদের মল এ ব্যাপারে অতটা কার্যকরী নয়। কেননা সেই ধরনের পশুরা বেশী রোগাক্রান্ত হয়।

সবুজ তরিতরকারীর উৎপাদনে সবচেয়ে ভাল উপাদান হচ্ছে পচা শাকসব্জী, ঘাস–পাতা ইত্যাদি থেকে তৈরী সার। গোবর সার এক্ষেত্রেও একই রকমের উপকারী। লাউ–পটোল–উচ্ছে–ঝিঙে ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরষের খোল (বা অন্যান্য

তৈলবীজের খোল) সমপরিমাণ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে উৎপাদন ৰাড়বে।

সুসংবদ্ধ কৃষি

এর আগে বলেছিলুম যে কৃষিজমি থেকে সর্বাধিক উপযোগ পাওয়ার জন্যে কর্ষকের সারের প্রয়োজন হয়। তাই উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে পশুজাত সার বা জৈবসার যথেষ্ট নয়, কিছুটা রাসায়নিক সারেরও প্রয়োজন হয়। অবশ্য এটা দেখা গেছে জমিতে যখনই ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়েছে, জমি কিছু সময় পরে অনুর্বর বা ৰন্ধ্যা ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে রাসায়নিক সার জমির মূল প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করে' দিয়ে জমিকে সিমেন্টের মতো নিষ্প্রাণ ও নিরেট করে দেয়। এই কারণে উপযুক্ত গবেষণার মাধ্যমে অনুসন্ধান করতে হবে কী পদ্ধতিতে কৃষিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে জমির কোন ক্ষতি হবে না। ব্যষ্টিগত মালিকানায় চাষের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের প্রয়োগের কুফল থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু সামবায়িক প্রথায় চাষ করলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সামবায়িক ব্যবস্থায় কৃষিতে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। তার ফলে নোতুন নোতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে জমির ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়ে বা তার প্রাণশক্তি

দীর্ঘায়িত করে এর অধিকতর উপযোগ সম্ভব হয়। সমবায় প্রথার সুফল হচ্ছে এই ব্যবস্থায় অনেক ব্যষ্টির সম্পদ ও সঙ্গতিকে একত্রিত করে' তা সম্মিলিত ভাবে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করা যায়।

এক সময় ছিল যখন চাষী কয়েক বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জমি থেকে ফসল উৎপাদন করে' নেওয়ার পর এক বছরের জন্যে জমিকে পতিত বা অব্যবহৃত অবস্থায় রেখে দিত। কিন্তু এখন এটা করা সম্ভবপর নয়। বর্তমানে প্রয়োজন হচ্ছে একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যার ফলে সেই রাসায়নিক সারই প্রয়োগ করা হবে যা জমির উর্বরতা নষ্ট করবে না, অথবা রাসায়নিক সারের প্রয়োগ না করেই জমির উৎপাদন বাড়ানো সম্ভবপর হবে। আমি আশাবাদী যে নিকট ভবিষ্যতে মানুষ এই লক্ষ্যপূরণে সক্ষম হবে।

■ কুটির শিল্প, কৃষিভিত্তিক ও কৃষি আধারিত শিল্প

মাষ্টার ইউনিট বা প্রতিটি কৃষি ও বহুমুখী উন্নয়ন কেন্দ্রে অনেক রকমের কুটির শিল্প থাকা উচিত। অবশ্য এটা নির্ভর করে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতার ওপর। এই ধরনের কয়েকটি কুটির শিল্পের উদাহরণ নিম্নরূপ:–

(ক) এমন ধরনের কুটির শিল্প যার প্রথম স্তরের প্রক্রিয়াকরণ পশু বা কীট জাত কৃষি পণ্যের ওপর আধারিত

যেমন দুধ, পশম, রেশমসূতো, লাক্ষা, মধু, মোম ইত্যাদি। (খ) এমন ধরনের কৃষিপণ্যের উৎপাদন যা সরাসরি বৃক্ষজাত (plant origin) যেমন ডাল থেকে পাঁপড়, চাল থেকে চিড়ে, বিভিন্ন শস্য থেকে কর্ণফ্লেক্স, ফল থেকে জ্যাম-জেলী ইত্যাদি। (গ) ভেষজ শিল্প বা অন্যান্য শিল্প যা প্ল্যান্ট ওরিজিন যেমন বিভিন্ন নির্যাস বা সুগন্ধি, আয়ুর্বেদিক ও প্রাকৃতিক ঔষধ। (ঘ) বৃক্ষজাত তন্তুজের উৎপাদন যেমন পাট, তুলো, লিনেন, শণ, কলাগাছ, আনারসের পাতা, শিসল-ঢেঁড়স-তুলসীর পাতা। এছাড়া ঔষধ ও তন্তুর উৎপাদন, সাবান-শ্যাম্পু-তরল সাবান-ডিটারজেন্ট ইত্যাদির উৎপাদন, বিভিন্ন লৌহ সামগ্রীর (ছোট ছোট) উৎপাদন এ সমস্তই এইসব বহুমুখী কেন্দ্রে থাকতে পারে। যদি কুটির শিল্প ঠিকভাবে বিকশিত হয় তাহলে স্থানীয় লোক আর্থিকভাবে উপকৃত হবে।

- শক্তি উৎপাদন (Energy production)

ক্ষুদ্র উদ্যোগের ভিত্তিতে (small scale) শক্তি উৎপাদন বলতে বোঝায়- সৌরশক্তি, জৈবগ্যাস, বায়ুশক্তি, ক্ষুদ্র জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ক্ষুদ্র তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদির মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন।

সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সৌরশক্তি আহরণ করে' তা দিয়ে আলো জ্বালানো, পাম্প চালানো ইত্যাদি কাজ করা যেতে পারে। জৈব বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস তৈরী করে তা দিয়ে ৰায়োগ্যাস জেনারেটর, রান্না, আলো ইত্যাদি ব্যবহারে লাগানো যায়। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে জৈব বস্তুকে পচিয়ে তা থেকে গ্যাস উৎপন্ন করা হয়, ও তাকে বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়। গোরু–মহিষ–মানুষের মল বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে ব্যবহার করা হয়।

ৰায়োগ্যাস প্লান্টে বায়োগ্যাস উৎপন্ন হবার পরে যে তরল পঙ্ক (slurry) পড়ে থাকে তা অতি উত্তম মানের সার হিসাৰে ব্যবহৃত হতে পারে, কেননা জমিতে প্রয়োগ করলে এর অণুগুলো এক সপ্তাহের মধ্যে ভেঙ্গে যায়, যেখানে অন্যান্য সারের ক্ষেত্রে সময় লাগে ছয় মাস। এই তরল পঙ্ক তিন দিনের মধ্যে গাছের শিকড়ে পৌঁছে যায়, আর অন্যান্য সারের ক্ষেত্রে তা হতে তিন মাস লেগে যায়। তাই তরল পঙ্ক দশ দিনের মধ্যে কোনও একটি গাছে পুষ্টির যোগান দিতে পারে, অথচ সাধারণ গোবর সার তা করতে সময় নেয় নয় মাস।

উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত স্থানে ক্ষুদ্র তাপ–বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে (যেমন ছোট জোড় বা নদী), এর থেকে নয় মাস স্থানীয় এলাকায় বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে।

সূচীপত্র

জলের পাম্প ও জেনারেটর চালানোর জন্যে বায়ুশক্তি হচ্ছে সবচেয়ে সুলভ উৎস। এটি অত্যন্ত কম মূল্যে মানুষ নিজের ব্যবহারে লাগাতে পারে, কারণ এতে উইন্ডমিল বসানোর ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অতি কম। যে সমস্ত স্থানে হাওয়ার বেগ বা হাওয়া চলাচল খুব বেশী সেই সব স্থান এই কেন্দ্রের পক্ষে আদর্শ।

■ কৃষিগবেষণা কেন্দ্র (Research Centre)

সব বৃহৎ কৃষি ক্ষেত্রের সঙ্গে গবেষণার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে কৃষি গবেষণাকে, তারপর জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা (এর মধ্যে আবার প্রথমে জুলজি, দ্বিতীয় বোটানি), তারপর রসায়ন সংক্রান্ত গবেষণা।

কৃষি গবেষণার বিষয়বস্তু হবে ব্যাপক যেমন ৰীজ, ফল, ফুল, রেশম, ভেষজ, ঔষধীয় উদ্ভিদ, গ্রীষ্ম-বর্ষাকালীন সর্ব ঋতুর উপযোগী শাকসব্জী, মশলা, ডাল ও ধান। কয়েকটি বাদামজাতীয় ফল ও অন্যান্য বিশেষ ফল যেমন আখরোট, চেষ্টনাট, কাঠবাদাম, পার্সিমন, চেরী, এ্যাপ্রিকট, আঙ্গুর, ডুমুর, পেস্তা, প্যারাগুয়ে নারিকেল-গবেষণার বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

কয়েকটি আঁশযুক্ত গাছপালার জন্যেও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। যেমন পাট, শিসল, শণ, ঢেঁড়স, চাষ-তুলো ও গাছ-তুলো, তিসি, রেমি, আনারস। বিভিন্ন তৈলবীজ যেমন তিল, তিসি, সূর্যমুখী, সরষে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করা দরকার। তৈল বীজ থেকে অধিকতর পরিমাণে তৈল নিষ্কাশিত করা ও তেলের নির্গন্ধীকরণ সম্পর্কেও নোতুন নোতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

ঢেঁড়সের বীজ থেকে ভোজ্য তেল পাওয়া সম্ভব। এতে চর্বির মাত্রা বেশী থাকে না। ক্যালোরির মাত্রাও কম। এর আঁশ থেকে পরিধেয় বস্ত্র তৈরী হতে পারে। গাছের বাকী অংশ পশুখাদ্য আর সার তৈরীর কাজে লাগতে পারে। ফলন শেষ হয়ে যাবার পর ঢেঁড়সের গাছ প্লাষ্টিক শিল্প ও উৎকৃষ্ট মানের কাগজ তৈরীতে ব্যবহৃত হতে পারে। ঢেঁড়স ফলনশীল হতে মাত্র চল্লিশ দিন সময় নেয় আর এর চাষে খুব বেশী জলসেচের প্রয়োজন হয় না। কন্দ ফসলের সঙ্গে সহায়ক ফসল হিসাবে ঢেঁড়স লাগানো যেতে পারে। কন্দ মাটি খুঁড়ে তোলার আগেই ঢেঁড়সের দু'টি ফলন পাওয়া যাবে।

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে গবেষণার মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতি বা প্রযুক্তিও উদ্ভাবন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ডাল গাছের পাতা বা নরম ডাঁটা মাঝে মধ্যেই ছিঁড়ে নিয়ে তরকারী হিসাবে রান্না করা যেতে পারে। এর ফলে গাছের ওই অংশ

থেকে নোতুন ফেকড়া বের হবে, ও এতে ডালের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য গাছে ফুল আসার আগে এরকম করা বন্ধ করে' দিতে হবে। কমলা-টমেটো, আপেল- টমেটো, আঙ্গুর-টমেটো টমেটোর এইসব নোতুন পদ্ধতি ভারতে বর্তমানে তৈরী করা হয়েছে।

আদা, হলুদ, পান, মিষ্টি আলু ইত্যাদি ফসলের ছায়া প্রয়োজন। বেলফুলের রাই- মগরা-মোতিয়া প্রজাতি, যুঁই, চামেলী, বকুল, কামিনী, ল্যাবেণ্ডার ঘাস, করবী থেকে আতর তৈরী হতে পারে।

বাঁশ, বাঁশের পাতা, দুধিয়া ঘাস, নরম কাঠ, আখের ছিবড়ে আর ভুট্টার ভুতি থেকে কাগজ তৈরী হতে পারে। এক প্রজাতির পাইন থেকে উন্নত মানের কাগজ তৈরী হবে।

যে সমস্ত বীজে মিষ্টত্ব আছে সেগুলিতে ঠিকমত অঙ্কুরোদগম হবার পরে মাটিতে লাগানো উচিত, না হলে পিঁপড়ে সেগুলো খেয়ে যাবে। যে জমিতে মূলো লাগানো হবে সেখান থেকে অন্ততঃ তিন মাইল দূরের কোন জায়গা থেকে মূলোর ৰীজ নিয়ে আসতে হবে, নাহলে বীজ সহজেই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সূর্যমুখীর অধিক ফলনশীল প্রজাতি ব্যবহার করতে হবে; কল বেরোনো আদা, গুজরাতী বা অন্ধ্রপ্রদেশ বা

তামিলনাড়ু প্রজাতির বাদাম আর বিলম্বিত বোরো ধানের প্রজাতিরই ব্যবহার করা উচিত।

যেখানে আবহাওয়া ঠাণ্ডা সেখানে ৰীজ উৎপাদন-কেন্দ্র তৈরী করতে হবে। ভারতের সমতল অঞ্চলে ভাল বীজ তৈরী হবে না। সুগার বীটের বীজ উৎপাদন করার জন্যে সবচেয়ে ভাল স্থান হ'ল উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল-হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল, হিমাচল প্রদেশ ও কশ্মীর উপত্যকা।

ভেষজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য ঔষধীয় উদ্ভিদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কোন কোন গাছ থেকে তো মানসিক রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ওষুধ প্রস্তুত হয় বা হতে পারে। যেমন-ব্রাহ্মী শাক স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের স্নায়ু কোষের জন্যে খুবই উপকারী। মানসিক বিকৃতির জন্যে লাউ অনেকভাবে কাজে লাগে। উন্মাদ রোগের চিকিৎসায় ভৃঙ্গরাজ তৈল অত্যন্ত উপযোগী। তুলসী-নিষ্যন্দ বা তুলসী- বীজের তেল মানসিক রোগের চিকিৎসায় কার্যকরী। অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে কালমেঘ বা চিরতা (শুষ্ক কালমেঘকেই চিরতা বলে) ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক। সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে কুইনাইন প্রস্তুত হয়। পানিফল পেটের কুয়ো, জলাশয় বা জলাধার সংলগ্ন মাটিতে সবুজ শাক, পুদিনা, থানকুনি লাগানো উচিত। সংরক্ষিত স্থানে বড় গাছের ওপর বিভিন্ন রকমের লতানে গাছ তুলে দেওয়া যেতে পারে। যেমন- রেড ওক

গাছের ওপরে গাছ–পান বা পিপুল, সিলভার ওকের ওপরে গোলমরিচ, নারকোল গাছে চই। অন্যান্য লতানে (creeper, climber) ঔষধীয় গাছ যেমন হাড়জোড়া, ঈশানমূল বিভিন্ন তালীবর্গীয় গাছের ওপর তুলে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য পথিপার্শ্বস্থ তালীবর্গীয় গাছের সঙ্গে এই লতানে গাছ লাগানো উচিত নয়।

■ সৌর সময় সারণী (Solor calendar)

ৰাংলা মাস হচ্ছে সৌর মাস আর এতে ঋতু বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি আছে। যেখানে চান্দ্রমাসের হিসেব সেখানে পঞ্জিকা অনুসারে চাষবাসের অনেক অসুবিধা। গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডার যদিও সৌর–পদ্ধতি অনুযায়ী তৈরী, কিন্তু তা সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন, জোডিয়াকে তিরিশ ডিগ্রী কোণের আর্ক যখন শুরু হচ্ছে (অর্থাৎ সূর্য সেই আর্কে প্রবেশ করছে) তখন এপ্রিল মাসের পনেরো তারিখ হয়ে গেছে, যা আসলে মাসের মাঝামাঝি সময়। যদি আর্ক ঠিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ থাকত তবে মাসের শুরু থেকেই আর্কও শুরু হত।

সাধারণতঃ সৌর বৎসর ৩৬৫ দিনে আর চান্দ্র বৎসর ৩৫৫ দিনে ধরা হয়। তার ফলে প্রতি তিন বৎসরে চান্দ্র বৎসর এক মাস এগিয়ে যায়। বাংলা পঞ্জিকা ব্যবহৃত হয় পশ্চিমৰাংলা, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, অসম, ওড়িষ্যা, বিহারের ও

ছোটনাগপুরের বাংলাভাষী অঞ্চলে। এছাড়া চাষবাসের ক্ষেত্রে এই পঞ্জিকা ব্যবহৃত হয় উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, জম্মু, কশ্মীর, পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, তিববত, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও রাজস্থানে। যখন সূর্য ও চন্দ্র দুইই মীনরাশিতে অবস্থান করে তখন খুব ভাল বর্ষা হয়। একে বিহারে বলা হয় 'হাথিয়া'। রাশীচক্রের এই অবস্থান কৃষির পক্ষে আদর্শ কেননা সেই বছর পর্যাপ্ত ফসল পাওয়া যায়।

কিছু গাছ সূর্য–প্রভাবিত ও কিছু গাছ চন্দ্র–প্রভাবিত। যেমন তুলসী চন্দ্র– প্রভাবিত। চন্দ্র–প্রভাবিত ভেষজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পূর্ণিমার সময় এই প্রভাব সবচেয়ে বেশী কার্যকরী থাকে। এই দুই ধরনের গাছ পৃথক পৃথক স্থানে লাগানো উচিত।

সমস্ত রকমের সারণীকেই আরও নিখুঁত করবার জন্যে বিস্তৃতভাবে গবেষণা হওয়া উচিত। এর ফলে চাষবাস বিজ্ঞানভিত্তিক হবে, আর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

■ কৃষি পরিকল্পনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য:

সব সুসংবদ্ধ কৃষিকেন্দ্রে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত। যেমন আটা তৈরীর কল, পাঁউরুটি তৈরীর বেকারী, সুলভ ৰীজ–বিতরণ কেন্দ্র, নিঃশুল্ক গাছের চারা–বিতরণ কেন্দ্র,

ডেয়ারী ফার্মিং, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, সৌরশক্তি কেন্দ্র, মৌমাছি পালন, বিদ্যালয় ও অনাথালয়।

সুলভ ৰীজ–বিতরণ কেন্দ্র উন্নত মানের বীজ সংগ্রহ করে' তা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করবে। প্রতিবার কোন ফসল উঠে যাবার পরে স্থানীয় চাষীর কাছ থেকে ৰীজ কিনে নিয়ে বা বাজার থেকে সস্তা দরে বীজ কিনে নিয়ে বা কৃষিকেন্দ্রে নিজেরা বীজ তৈরী করে' এই বিতরণ–কেন্দ্র সুলভ মূল্যে স্থানীয় মানুষের কাছে সেই ৰীজ. বিক্রয় করবে।

নিঃশুল্ক উদ্ভিদ বিতরণ কেন্দ্র নিজেরা বিভিন্ন গাছের চারা তৈরী করে' বর্ষার আগে তা স্থানীয় মানুষের কাছে বিক্রয় করবে। এজন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত তা হচ্ছেঃ চারা দেড় ফুট পর্যন্ত ৰাড়তে দিতে হবে। তারপর সেগুলি মাটি থেকে তুলে জলে তার শিকড় আধাঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এর পরে প্রধান শিকড় গোড়া থেকে এক ইঞ্চির মতো কেটে ফেলে আবার বাকী শিকড়সহ সেই চারাকে দশ মিনিট মত জলের মধ্যে রেখে দিতে হবে। তারপর সেই চারাকে মাটিতে বা কোন পাত্রে বা প্যাকেটে রাখা মাটিতে লাগিয়ে দিতে হবে। এইভাবে যে গাছ তৈরী হবে তা থেকে বড় ও অধিকতর সুমিষ্ট ফল পাওয়া যাবে। এর ফল ৰীজ–চারা থেকে তৈরী গাছের ফল থেকে উন্নত মানের হবে, অবশ্য কলম–করা গাছের থেকে নিম্নমানের হবে।

২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮, কলিকাতা

ধর্মমতগত ভাবজড়তা

'গড্ড্' একটি সুপ্রাচীন ধাতু। 'গড্ড্' ধাতুর অর্থ হ'ল যুক্তিবর্জিতভাবে পথ চলা বা যুক্তিবর্জিত ভাবে কোন কাজ করা। তোমরা জান, মানব–মনীষা যখন অনগ্রসর ছিল তখন তাদের মধ্যে যে বা যারা বুদ্ধিমান ছিল তারা বাকিদের মনে বিভিন্ন ধরনের ভীতম্মন্যতা, উত্তেজনা, প্রাপ্তির উন্মাদনা (পাইয়ে দেবার খেলা) ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের যৌক্তিকতার পথ থেকে দূরে রাখার অপচেষ্টা করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের যৌক্তিকতার ধারে কাছে ঘেঁসতেই দেয়নি। কখনো কখনো ম্যাজিক দেখিয়ে, কোথাও কোথাও হাত–সাফাইয়ের জাদুবিদ্যা দেখিয়ে, ভোজবাজি বা ভানুমতির খেল দেখিয়ে তাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে' আজে–বাজে কথা শুণিয়ে মানুষকে খেয়ালখুশিমত পুতুল নাচের রঙচঙে পোষাক পরা কাঠের পুতুলের মত নাচিয়ে গেছে। নেপথ্যে থেকে রাশ টেনেছে চালাক মানুষ; সাধারণ মানুষ....... ক্ষুদ্রতাবিজড়িত মানুষ সেই রকমভাবে হাত–পা

নাড়িয়েছে........ সোজাসুজি কোমর দুলিয়ে নেচে গেছে। যুক্তি খোঁজার চেষ্টা তো করেইনি, বরং যুক্তি খোঁজার চেষ্টার মধ্যেও পাপের নির্যাস রয়ে গেছে বলে' ভেবে গেছে। এই যে যুক্তিজ্ঞান বর্জিতভাবে মানুষের চলা একেই বলে 'ডগমা'। এই ডগমাগুলির সমাহারকে বলা হবে 'ইজম' বা 'মতবাদ'।

যেখানে নিজের মুরোদে কুলোয়নি সেখানে ডগমার প্রচারকেরা বা ইজমের তল্পীবাহকেরা পরমেশ্বরের নাম ভাঙ্গিয়েছে; কোথাও বা বলেছে– স্বপ্নে আমি আদেশ পেয়েছি...... দৈবাদেশ মানুষের জন্যে এই ধরনের কথা বলেছে। কোথাও বা ভয় দেখিয়ে বলেছে এর অন্যথা হলে অনন্ত নরকবাস। এই বলে' ভীতম্মন্যতা তৈরী করে' দিয়ে মানুষকে ডগমা মানতে, ভয়ে ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে শিখিয়ে গেছে। ডাহা মিথ্যা বলে' গেছে যখন তারা বলেছে– এটাই পরমপুরুষের আদেশ.... এটা যারা মানবে না তারা নরকাগ্নিতে ভস্মীভূত হবে.... তাদের চোখে ছানি পড়বে.... গলায় গলগণ্ড হবে.....এ প্রসাদ যদি পায়ে লেগে যায়....এই প্রসাদ যদি মাথায় না ছোঁয়ানো হয় তাহলে হাতে কুষ্ঠ হবে.... জাত–পাত, উচ্চ–নীচ বিভাজন পরমপুরুষের ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি।

"ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্যোভবৎ।

সূচীপত্র

মধ্যতদস্য যদ্বৈশ্যঃ প্যাম্ শূদ্র অজায়ত।।”

চকমারি, চমকপ্রদ, চটকদার গাল-গল্প তৈরী করে' শুণিয়েছে এগুলো মানতে হয়... হাতে তাঁবা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে এক মনে নিবিষ্ট চিত্তে এই সব কাহিনী শুণলে স্বর্গসুখ লাভ করা যায়.... নইলে সবংশে ধ্বংস হতে হয়। সাধারণ মানুষ.... ভীতিপ্রেষিত মানুষ উষ্চবাচ্য না করে' নির্বিবাদে মেনেছে ধর্মকথার নামে এই সকল মন-ভোলানো ভয়-জাগানো প্রেত-কথা। যে থিয়োরী বাস্তব জগতে খাটেনি.... খাটছে না..... খাটবেও না.....যার অজস্র অসম্পূর্ণতা জেনেও তারই জয়জয়কার করে' হাত তুলে উষ্চকণ্ঠে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করেও মানুষ বিনিময়ে যখন কিছুই পাইনি তখন তাকে বলা হয়েছে আরও শ্রম....আরও অনেক শ্রম.... আরও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দিতে হবে। এই সব অবাস্তব থিয়োরীকে কার্যরূপ, দিতে গিয়ে মানুষের মনের অন্তর্নিহিত ধর্মগুলিকে (characteristics) উপেক্ষা করে' রঙ-চড়ানো তত্ত্বকথা শুণিয়ে নিপীড়িত মানুষের চোখেমুখে লোভ ছোঁক ছোঁক করিয়ে এরা বোকা মানুষের ততোধিক বোকা মনে রীতিমত আসন গেড়ে নিয়েছে। এ সবই হ'ল ডগমার খেলা....ডগমার প্রত্যন্ত লীলাভিনিবেশ।

তোমাদের বলেছিলুম, যে ইজম্ বিশ্বৈকতাবাদের প্রতিষ্ঠা না করে' মানুষে- মানুষে বস্তুতে-বস্তুতে ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে দিয়ে

ক্ষুদ্রতাকে চাগিয়ে দিয়ে নিজের নিজের কাজ হাসিল করতে চায় সেই ইজম্ ডগমার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। আজকের শিক্ষিত মানুষকে এই ডগমার কুহক থেকে সরে থাকতে হবে..... ক্ষুদ্রতানিষিক্ত ইজকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে..... পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কালকে সরিয়ে দিয়ে নূতন ঊষার সূর্যালোককে খোলা মনে বরণ করে' নিতে হবে....এতেই মানুষের অস্তিত্বসিদ্ধি... এতেই তার সর্বার্থসার্থকতা।

ডগমার প্রচারকেরা চায় না মানুষ যুক্তির পথে আসুক। তাই লক্ষ্য করে' দেখবে ডগমার ধামাধরারা বিজ্ঞান অর্থাৎ সায়েন্সের ব্যাপ্তি চায় না। যদিও সায়েন্সের কিছু কিছু থিয়োরী ডগমার ওপর দাঁড়িয়ে আছে.....যদিও কিছু কিছু সায়েন্টিষ্ট সেই ডগমার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়....একটু দোনা–মনা করে, তবু সায়েন্সে ডগমার প্রভাব অন্যের তুলনায় কিছুটা কম। সেই রকমের ডগমার লোক–ঠকানো রাজারা চায় না মানুষের স্বচ্ছ দৃষ্টি তৈরী হোক..... চায় না ডগমার ভেতর দিয়ে রীবলবিং সার্চলাইটের তীব্র আলোকরশ্মি 'অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তার কুজ্ঝটিকা জাল সরিয়ে দিক মানুষ মুক্ত আকাশের নীচে স্বচ্ছ আলোকধারায় স্নান করবার সুযোগ পাক। তোমরা একটু নজর দিলে দেখবে...... একটু ভাল করে ঠাহর করলে দেখবে আজকালকার উঠতি বয়সের যুবকেরা আগেকার সেই ডগমাশ্রিত মতবাদগুলো বা

ইজমগুলোকে মানতে চাইছে না। নোতুন প্রভাতের একটু আলোকপাতেই যখন এই পরিবর্ত্তন দেখা দিচ্ছে তখন যথাযথ ভাগবৎ ধর্মের জ্ঞান মানুষের মনে অনুপ্রবিষ্ট হলে ডগমা যে এক লহমায় দীর্ণ–বিদীর্ণ হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। ডগমার ধ্বজাধারীরা আজ অল্পস্বল্প বুঝছে যে স্বচ্ছ বিচারধারাতেই লুকিয়ে রয়েছে তাদের মৃত্যুর পদধ্বনি..... লুকিয়ে আছে তাদের সর্বনাশের অশনি সংকেত। এদের আবার কেউ কেউ বলে থাকে অমুক পুস্তক পড়ো না ... অমুক পুস্তক ছুঁয়ো না.... ওতে তোমার বিভ্রান্তি হবে। আসল কথা তা নয়। অমুক ছুঁয়ে হোক বা না হোক, অমুক পুস্তক বুঝে পড়লে ডগমার বেলুন অবশ্যই চুপসে যাবে।

যাইহোক, যুক্তিতর্কবর্জিতভাবে নির্বোধের মত চলার জন্যে 'গড়্' ধাতুর ব্যবহার হয়েছে। গড়্ + অচ্ = গড্ড। 'গড্ড' শব্দটির ভাবারূঢ়ার্থ হ'ল যে যুক্তিবর্জিতভাবে চলে। যোগারূঢ়ার্থে এর একটি মানে হ'ল ভেড়া; অপর অর্থ হচ্ছে কোন মতবাদের অন্ধস্তাবক বা অন্ধ অনুগামী ..... অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ক্যাডার।

৩ এপ্রিল ১৯৮৮, কলিকাতা

(শব্দচয়নিকা ষোড়শ খণ্ড প্রবচন ১০৯)

*   *   *   *   *

সূচীপত্র

সুদূর অতীতে যূথবদ্ধ মানসিকতা ও যূথগত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল। সেই যুগের সমাজব্যবস্থায় গোষ্ঠীনেতারা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আদিম যুগের মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধির খুবই প্রয়োজন ছিল, কেন না তাদের মধ্যে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত, ও ফলে অনেক মানুষের মৃত্যু হত। তখনকার দিনে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংগ্রামের যেন কোন অন্ত ছিল না। গোষ্ঠীমাতা এক এক গোষ্ঠীর কর্ত্রী হতেন, ঠিক যেমন পিঁপড়ের ঢিবিতে রাণী পিঁপড়ে বা মৌচাকে রাণী মৌমাছি। সন্তান ধারণ ও জন্মদানের ক্ষমতা থাকায় নারীরা গোষ্ঠীমাতা হিসেবে পূজিতা হতেন। তাই সে যুগে মাতৃগত কুল ব্যবস্থা (Matrilineal) ও মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Matriarchal) প্রচলিত ছিল।

পরবর্ত্তীকালে শুরু হ'ল লিঙ্গপূজা। সেই যুগের অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গ পূজার সমধিক গুরুত্ব ছিল, কেন না তারা ভাবত যে, লিঙ্গপূজার ফলে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। মায়াসভ্যতার মত অনেক প্রাচীন সভ্যতায় লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। সাত হাজার বছর আগে শিবের আবির্ভাবের পরেও এই লিঙ্গপূজা অনুসৃত হতে থাকল। এমনকি আজও মানুষ একই ধারণার ভিত্তিতে **শিব লিঙ্গের পূজা** করে' থাকে।

ধর্মমতগত ভাবজড়তার মূল কারণ

তারও অনেক পরবর্ত্তীকালে শুরু হ'ল প্রতিকৃতি ও মূর্তিপূজা। তারপর জৈন- বৌদ্ধযুগে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির তৈরী হতে থাকল। জৈন-বৌদ্ধ মতবাদের যখন রমরমা চলছিল তখন লিঙ্গপূজা, শিবপূজা, জৈনমত, ৰৌদ্ধমত - - এ সবের এক সংমিশ্রণ তৈরী হয়ে গেল। আরও পরে পুরোহিততন্ত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। জৈন ও ৰৌদ্ধমতের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার বিচারধারা অনুযায়ী অনেক নোতুন দেবদেবীর সৃষ্টি হ'ল। জন্ম নিল সংকীর্ণ স্বার্থপরতা

(parochial interest)। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ বিভিন্ন ভাবজড়তার উৎপত্তি হ'ল, কেননা যেখানে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি প্রশ্রয় পাবে সেখানে ভাবজড়তা বাসা বাঁধবেই। ভাবজড়তার উৎপত্তির এটাই মৌল কারণ। যেহেতু সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ভাবজড়তার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া শেন উপাযান্তর থাকে না, তাই একে কেন্দ্র করে' অন্যকে তীব্র ভাবে শোনল্প করা চলতে থাকে।

ধর্মমতগত ভাবজড়তা জন্মান্তরবারে এক নোতুন ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রবর্ত্তন করল। মানুষকে শেখানো হ'ল যে তারা পূর্ববর্ত্তী জীবনে পাপ কাজে লিপ্ত ছিল বলেই আজ তারা গরীব হয়ে জন্মেছে। আর পূর্ব জন্মের পূণ্যফলেই অন্যের। বনী হয়ে জন্মেছে। সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের

দাবানলকে প্রতিহত করতেই এই ধরনের কুপ্রচার করা হয়েছিল। তোমরা বুঝতে পারছ যে ধর্মমতগত ভাবজড়তা কত সাংঘাতিক ও বিপজ্জনক ছিল, আজও তাই–ই আছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ধর্মমতগত ভাবজড়তার প্রাবল্যকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, ভাবজড়তার প্রচারকেরা শোষণমূলক মনোভাবের দ্বারা প্রেষিত হয়েই সব কিছু করেছে।

একদিন কোন এক পুরোহিত দেখল যে তথাকথিত একজন নীচুজাতির লোক তার গাছে বেশ বড় ও লোভনীয় বেগুন ফলিয়েছে যা দিয়ে তার আহার বেশ ভালই তৃপ্তিদায়ক হবে। সে তখন সেই লোকটিকে বললে যে এই রকমের পুরুষ্টু বেগুন সত্যনারায়ণের ভোগে দিলে দেবতা খুবই তুষ্ট হবেন। কিন্তু পুরোহিত চাষীকে তা করতে বলবে না কেন না চাষীটির সেই ধরনের ভক্তি নেই। পুরোহিতের কথা শুণে দেবতার ভয়ে সেই সাধারণ চাষী তখন খুব কাকুতি মিনতি করে' পুরোহিতকে সত্যনারায়ণের পূজার কাজে লাগানোর জন্যে ওই বেগুন দিয়ে দিল। পুরোহিত যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় বেগুন গ্রহণ করল। এইভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে পুরোহিত তার কার্যসিদ্ধি করে' নিল।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, এক ভাবজড়তাকে সরিয়ে তার পরিবর্তে আর এক প্রকারের ভাবজড়তা বসিয়ে দিলে কি

সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? আরও স্পষ্ট করে' বললে– এক ধনাত্মক ভাবজড়তার পরিবর্তে আর এক ধনাত্মক বা ঋণাত্মক ভাবজড়তা পুনঃস্থাপন করা সঙ্গত কি না? এর উত্তরে বলব যে সব ভাবজড়তাই অযৌক্তিক, ও তা বিচারশীলতাবর্জিত সেন্টিমেন্ট মাত্র। এক মাত্র ভাবজড়তাবিহীন তত্ত্ব দিয়েই ভাবজড়তার শূন্যস্থান পূরণ করা যায়। গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন– 'মধুরতা দিয়ে ক্রোধকে জয় করতে হয়, তেমনি কৃপণতাকে জয় করতে হয় দানের মাধ্যমে; সত্যবাদিতা দিয়ে মিথ্যাকে, ভালবাসা দিয়ে ঘৃণাকে আর দুঃখ দিয়ে সুখকে জয় করতে হয়।' আমরা যদি এই পদ্ধতি অবলম্বন করি তবে সেটা কি ঋণাত্মক ভাবজড়তাকে ধনাত্মক ভাবজড়তা দিয়ে পুনঃস্থাপন করা বোঝাবে? না, তা নয়, কেননা ক্রোধ, মিথ্যা, ইত্যাদি অবগুণগুলি আসলে মানসিক বৃত্তি, তারা ডগমা নয়। বুদ্ধের মত অনুযায়ী সব ঋণাত্মক বৃত্তিকে ধনাত্মক বা শুভ প্রবৃত্তি দিয়ে সরিয়ে দিতে হবে। এটাই হ'ল উপযুক্ত পন্থা।

শঙ্করাচার্য কিন্তু এই নীতি অনুসরণ করেন নি। বরং তিনি বৌদ্ধ ভাবজড়তা বা ডগমার পরিবর্তে পৌরাণিক ডগমা প্রতিষ্ঠিত করলেন। বৌদ্ধদেবী 'তারা' পরিবর্তিতা হলেন পৌরাণিক 'তারা'য়। সেই সময় যাঁরা ভৈরবী চক্রে বসে'

বৌদ্ধতন্ত্রের সাধনা করতেন তাদের বলা হত চক্রবর্ত্তী। শঙ্করাচার্যের পৌরাণিক ধর্মমতের আমলে এই চক্রবর্ত্তীরা ব্রাহ্মণ বলে' স্বীকৃতি পেলেন। কিন্তু যেহেতু বৌদ্ধমন্ত্র পালি ভাষায় রচিত তাই চক্রবর্ত্তী বামুনেরা সংস্কৃত ঠিকমত জানতেন না, যদিও পালি ভাষার মূল ভিত্তি হচ্ছে সংস্কৃত। তাই পৌরাণিক সমাজে তারা সংস্কৃত–জানা বামুনদের চেয়ে নিচুস্তরের বলে' গণ্য হলেন। ওই পৌরাণিক ধর্মমতের প্রভাবেই উত্তর ও পূর্ব ভারতে প্রচলিত বৌদ্ধ দেবতা লোকেশ্বর বুদ্ধ পরিগণিত হলেন লোকেশ্বর বিষ্ণুতে। এই ভাবে বৌদ্ধ ডগমাকে আর একটি ডগমা অর্থাৎ পৌরাণিক ডগমা দিয়ে অপসারিত করে' শঙ্করাচার্য একটি বড় রকমের ভুল করলেন।

সমস্ত মানুষই একটা সুনিশ্চিত ও সমন্বয়পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে চায়, যে জীবনে তাদের নিজেকে অভিব্যক্ত করার, ও সুমুখে এগিয়ে যাবার পূর্ণ সুযোগ থাকবে। কিন্তু ধর্মমতগত ভাবজড়তা মানুষের এই মৌলিক আশা–আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে। কোন ধর্মীয় মতবাদের পুরোহিতেরা বলেন যে, নারীরা যদি নৃত্য করে তবে তাদের পা খারাপ হয়ে যাবে। তাই তাদের নৃত্য করা উচিত নয়। এটা ভাবজড়তা। অন্যান্যেরা আবার মানুষকে জোর করে' বিশেষ কোন দেবতার পূজো করতে বাধ্য করে। তাদের বলা হয় যদি নির্দিষ্ট দেবী বা দেবতার পূজা না করা হয় তবে পরিবারের

ওপর নেবে আসবে চরম দুর্দৈব, আর দেবী আরও নানা ভাবে প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু কোন দেবী বা দেবতা একজন মন্দ স্বভাবযুক্ত মানুষের মত প্রতিশোধ–স্পৃহ হন কী করে? তা যদি হন তবে তিনি দেবী বা দেবতা বলে' গণ্য হবেন কীভাবে? এগুলো সবই ভাবজড়তা।

প্রত্যেক ধর্মমতেই নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে' গণ্য করা হয়। কেন না তাদের যদি পুরুষের সমান মর্যাদা ও সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তাদের শোষণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। তাই শোষণ যাতে বজায় থাকে সেই জন্যেই নারী জাতিকে অবদমিত রাখা হয়। যুগ যুগ ধরে' নারীর ওপর এই শোষণ চলে আসছে। কোন ধর্মমতে বলা হয় যেহেতু স্বামীর ধর্মাচরণের ফল পত্নী আপনা আপনি পেয়ে যাবে তাই পত্নীকে নিজে থেকে কোন ধর্মীয় অনুশীলন না করলেও চলবে। অন্য কোন ধর্মমতে বলা হয় যে, পুরুষ মৃত্যুর পরে অবশ্যই স্বর্গে যাবে, কিন্তু নারী বড় জোর স্বর্গদ্বার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। এ সমস্তই হচ্ছে ভাবজড়তা। বুদ্ধিমান মানুষ জানে যে কেউ অন্যের পুণ্য বা পাপের অংশভাগী হতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংস্কার দ্বারা আবদ্ধ, ও সেই অনুযায়ী তাদের চলতে হবে।

ইজম্ ও নব্যমানবতা

আমি আগেই বলেছি যে অনেক ডগমার সামূহিক নাম হচ্ছে ইজম্। যে রূপেই হোক না কেন, যেখানে যুক্তি বা বিচারের কোন স্থান নেই সেখানেই ডগমার উদ্ভব হয়। কিন্তু এই ইজই তার ক্ষুদ্রত্বের সীমাকে অতিক্রম করে' নবালোকে উদ্ভাসিত হয় যখন তা সমগ্র মানবতার ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয় শুধু মানবতা নয়, জৈব–অজৈব সমস্ত সত্তার প্রতি সম মনোভাব সম্পন্ন হয়। অতীতের অতিকায় ডাইনোসর আর আজকের এক ক্ষুদ্র পিপীলিকা এদের আস্তিত্বিক মূল্য সমান। মানুষ এই জগতের জন্যে যা কিছু করবে তা করবে সমস্ত জীবের প্রতি সমান মনোভাব রেখে – তা সে বিশাল দেহী কোন জীব হোক বা ক্ষুদ্রতম কীটই হোক।

তোমার যা কিছু শক্তিসামর্থ্য বা দক্ষতা আছে তা দিয়ে তোমার কর্ত্তব্য হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি অস্তিত্বকে সমুন্নত করে' তোলা। পারমার্থিক বিচারে মানুষে মানুষে যেমন কোন তফাৎ নেই তেমনি মানুষে–পশুতে বা জৈব–অজৈব সত্তাতেও কোন পার্থক্য নেই। তুমি এ ব্যাপারে স্থাবর ও জঙ্গম এই রকম কোন ভেদ রেখা টানতে পার না।

কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আৰদ্ধ ইজম্কে বিশ্বৈকতাবাদে পরিণত করা, ও তাকে সর্বজন স্বীকৃত করা যায় তখনই যখন সেই ইজমের মধ্যেকার সব জাগতিক গণ্ডিবদ্ধতা, মানসিক বাধা ও আধ্যাত্মিক ৰন্ধনকে দূর করতে পারা যাবে। এটি সম্পূর্ণ

একটি নোতুন ভাবধারা যা আমি বুদ্ধির মুক্তি ও নব্যমানবতাবাদ পুস্তকে ব্যাখ্যা করেছি। ওই পুস্তকে নব্যমানবতাবাদকে এই নোতুন ভাবধারার আলোকেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গাছের একটা ক্ষুদ্র শাখাও হেলাফেলা করার জিনিস নয়, কেন না তারও সুখদুঃখের অনুভূতি আছে। কোন বৃক্ষের শাখা–প্রশাখাকে আমি তখনই ছেদন করতে পারি যখন তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে' গণ্য হবে। তোমার যেমন বাঁচার অধিকার আছে, প্রতিটি জীবের সেই একই অধিকার আছে। তোমার জীবন তোমার কাছে যতখানি মূল্যবান, অন্য কোন সত্তার কাছে তার জীবন তেমনই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। যখন তুমি অন্যের কথা ভাববে তখন তোমাকে এই কথাটা স্মরণে রাখতে হবে।

তোমার জীবন তোমার কাছে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ একটা ছাগলের কাছেও তার জীবন তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মমতগত অনুষ্ঠানে বা উৎসব উপলক্ষ্যে নিরীহ ছাগলকে হত্যা করে' দেবীদেবতার কাছে উৎসর্গ করা হয়। বাকি ছাগলেরা পাতা চিবুতে চিবুতে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তা দেখতে থাকে। সে ঠিক বোঝে অল্পক্ষণের মধ্যেই তারও একই দশা হবে। এখন তুমি নিজেকে হুবহু সেই অবস্থায় রেখে পরিস্থিতিটা কল্পনা কর তো! ভাব যে তুমি কয়েক জন সঙ্গীসহ কয়েকটি রাক্ষসের

হাতে বন্দী হয়েছ। তখন রাক্ষসটি কেমন করে' তোমাদের ডালভাত খাওয়াতে থাকবে, আর এক এক করে' তোমাদের তার ভোজ্যে পরিণত করবে। এ হেন পরিস্থিতিতে রাক্ষসের হাতে ভক্ষিত হবার আগে অপেক্ষারত অবস্থায় তোমার যে আতংকগ্রস্থ মানসিকতা হবে সেটা কসাই–এর হাতে বন্দী ছাগলগুলোর মানসিকতার অনুরূপ নয় কি? তা সত্ত্বেও, মানুষ এই প্রথার নিষ্ঠুরতার কথা উপলব্ধি করেও, যদি ধর্মের অঙ্গীভূত বলিদানের নামে নিরীহ ছাগল ছানাকে হত্যা করতে চায়, তা হলে সেটা হবে চরম পরিতাপের বিষয়।

কপটাচারীর ভাবজড়তা

ধর্মের নামে এই সব নিষ্ঠুর প্রথার পিছনে কাজ করে যে মনস্তত্ব তা হচ্ছে কপটাচারীর ভাবজড়তা। অনেকেই এই ধরনের ভাবজড়তাকে মেনে চলেন ও বলেন, "শাস্ত্রের নির্দেশ; বাপ ঠাকুরদা এটা করে' এসেছেন, তাই আমাকেও করতে হবে।” এক্ষেত্রে হয়তো না জেনে ভাবজড়তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হ'ল। অবশ্য এমন অনেক উদাহরণ আছে যেক্ষেত্রে জেনে শুণেই ভাবজড়তার অনুসরণ করা হয়। যখন মানুষ জানে বা ভাল করেই বোঝে যে, একটা বিশেষ প্রথা ধর্মমতগত ভাবজড়তা ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও সে সেটাকেই মেনে চলে একেই বলে কপটাচারীর ভাবজড়তা। উদাহরণস্বরূপ, যখন মানুষ কোন ধর্মমতগত অনুষ্ঠানে একটা ছাগলকে

হাঁড়িকাঠে ফেলে বলি দিচ্ছে আর মুখে "মা, মাগো” চিৎকার করছে, তারা কি জানে না যে জন্তুজানোয়ারেরাও এই সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ? তা সত্ত্বেও তারা এটাই করে। এই হ'ল কপটাচারীর ভাবজড়তা। কোন মানুষ যদি তার নিজের ভাইকে মায়ের সামনে হত্যা করে, সেটা কি তার মায়ের কাছে প্রীতিদায়ক হবে? এই দু'টো উদাহরণের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মাটির প্রতিমা প্রাণহীন, তাই চোখের সামনে কোন এক জীবের প্রাণহরণ প্রতিহত করার কোন ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরের একজন মায়ের তা আছে। মাটির দেবতার তাই যদি থাকত তাহলে সেই মূর্তি নিশ্চয়ই নিজে থেকে ব্যবস্থা নিত, আর এই নিষ্ঠুর ও অর্থহীন প্রাণীহত্যা বন্ধ হত।

"মন তোমার ভ্রম গেল না
কালী কেমন তা চেয়ে দেখলে না।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা
দিয়ে কত খাদ্য নানা
তুমি তৃপ্ত করতে চাও মায়েরে
হত্যা করে ছাগল ছানা।"

ভারতে দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমাকে নানা প্রকারের মাটির বা চুমকি জাতীয় অলংকার দিয়ে বিশেষভাবে সুসজ্জিত করা হয়, যাকে বলে ডাকের সাজ। সাধক রামপ্রসাদ তাই আরও বলছেন– 'ও মন, তুমি তোমার অন্তরের ভক্তিঅর্ঘ্য আর মন্ত্র দিয়ে তোমার ইষ্টের আরাধনা কর। এই সব লোকদেখানো ও জঙ্কালো গয়না দিয়ে পূজো করার কোন অর্থই হয় না, কারণ মা কারোর ঘুষ খাবে না।'

নিহিত স্বার্থ নিয়ে যারা চলে তারা জেনে বুঝেই কপটাচারীর ভাবজড়তার দাস হয়েই থাকে, যদিও অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ ভাবজড়তাকে মেনে চলে। সাধারণ মানুষকে ভাবজড়তার পুরোহিতেরা বা যাজকেরা বলে 'এটা করবে না, ওটা করবে না, কেন না শাস্ত্রে নিষেধ আছে। আর তুমি যদি আমার কথা না শোণ তাহলে তুমি সবংশে ধ্বংস হবে'। বিচারশীল কোন মানুষ যদি এই অযৌক্তিক কথাকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন আবার সেই ডগমার ধ্বজাধারীরা কথা ঘুরিয়ে বলবে 'মা স্বয়ং স্বপ্নে এসে এই বলেছেন, ওই বলেছেন' এইভাবে তার বক্তব্যের সারবত্তাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এ সবই হচ্ছে কপটাচারীর ভাবজড়তা।

ভাবজড়তা ও বেদ

বেদ থেকেও অনেক রকম ভাবজড়তার সূত্রপাত হয়েছে। বেদের শিক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ড আবার দুই ভাগে বিভাজিত – আরণ্যক ও উপনিষদ। প্রথমে জ্ঞানকাণ্ডের কথা নেওয়া যাক।

বৈদিক যুগে সামাজিক নিয়ম এটাই ছিল যে পঞ্চাশ বছর বয়স হলে, মানুষ পরিবারজীবন থেকে অবসর নিয়ে বনে বসবাস করবে, ও তার জ্ঞান চর্চা দিয়ে সমাজের সেবা করবে। একে বলা হত বাণপ্রস্থ। যাই হোক, বনে বসবাসকারী আরণ্যক ঋষিরা বা জ্ঞানীরা যে সমস্ত প্রবচন ও শিক্ষা দিতেন তাই নিয়ে জ্ঞানকাণ্ডের আরণ্যক অংশ রচিত হয়েছে। আর উপনিষদে আছে সেই সমস্ত শিক্ষা যা পরমপুরুষ তথা পরম চৈতন্য সত্তা বা পরাজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধিত। 'উপ' মানে নিকটে, 'নি' মানে নিয়ে আসা আর 'সদ' মানে থাকা বা বসা। তাহলে উপনিষদ মানে যা আমাদের পরমতত্ত্বের কাছাকাছি নিয়ে আসে। যারা অধ্যাত্মপথের পথিক তাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে জ্ঞানকাণ্ডের এই উপনিষদ অংশেরই। কর্মকাণ্ডও দুই ভাগে বিভক্ত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। 'মন্ত্র' অংশে আছে প্রার্থনামূলক বিভিন্ন স্তবস্তুতি, যা ধর্মীয় মতবাদগত বিশ্বাস ও আচার–অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধিত। 'ব্রাহ্মণ' অংশ হচ্ছে বিভিন্ন বিধিনিয়মের সমষ্টি, যা ওই সব

প্রার্থনা, স্তবস্তুতি, আচার–অনুষ্ঠান বা যাগযজ্ঞে পালন করা হবে। বেদে প্রথমের দিকে যে অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দটার ব্যবহার করা হয়েছে তা উঁচুজাতের হিন্দু ব্রাহ্মণ নয়, কিন্তু পরবর্তী কালে শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

বৈদিক যুগে অধিকাংশ মানুষ অত্যধিক পরিমাণে গ্যাজানো মদ অর্থাৎ সোমরস পান করত। **তারা মাংস এমনকি গো–মাংসও ভক্ষণ করত।** শিবের আগমনের পরে ও যজুর্বেদের যুগে এই মাংসভক্ষণ রহিত হয়ে যায়, আর মানুষ দুগ্ধ উৎপাদনের জন্যে গোপালনে উৎসাহী হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও বৈদিক যুগে অনেক মানুষ মদ্যপ্রিয় ছিল, এমনকি যারা যাগযজ্ঞের কাজে নিয়জিত থাকত তারা এজন্যে তাদের কর্তব্য সম্পাদনে অসুবিধায় পড়ত। ফলস্বরূপ একটা প্রথা তৈরী হ'ল যে যাঁরা যজ্ঞ সম্পাদনকারী তারা যজ্ঞকালে কাঁধে মৃগচর্ম ধারণ করে' থাকবেন, যার নাম দেওয়া হ'ল উপবীত। এর ফলে যে সব যজ্ঞসম্পাদনকারী যজ্ঞের সময় মদ্যপান করবেন না, তাদের নির্দিষ্ট করা সম্ভব হত। কালক্রমে মৃগচর্মের পরিবর্তে যজ্ঞসূত্রের ব্যবহার শুরু হয়। আজ এই যজ্ঞোপবীত হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়বাহক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈদিক যুগে নানা রকম সুখাদ্য, যেমন ঘি (উপসেচনম্), উন্নত মানের চাল (ব্রীহি বা তণ্ডুল),

শাকসবজি (সদ), মহার্ঘ বস্ত্র ইত্যাদি ধর্মীয় আচারের অঙ্গ হিসেবে উৎসর্গ করা হত বা আহুতি দেওয়া হত। মৃতের ঊর্ধ্বদৈহিক কাজের সময় এই সমস্ত জিনিস প্রদান করা হত এই বিশ্বাস নিয়ে যে, পরলোকে গিয়ে সেই মৃত ব্যষ্টি ওই সব বস্তু ভোগ করবে।

সেই যুগে বেদের গায়ত্রী মন্ত্রেরও অর্থ বিকৃতি ঘটেছিল। নির্দিষ্ট ঋক্টি গায়েত্রী ছন্দে রচিত, এই কথাটির মর্ম না বুঝেই এটিকে বলা হত গায়েত্রী মন্ত্র, যদিও গায়ত্রী মন্ত্র বলে আদপে কিছু হয় না। গায়ত্রী ঋক্ বা সবিতৃ ঋকের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, "হে মহান ও বরণীয় স্রষ্টা, আমার বুদ্ধি ও মেধাকে শুভের পথে পরিচালিত কর।” কিন্তু কিছু শ্রেণীর পণ্ডিত প্রচার করল যে গায়ত্রী দেবকে পূজার্চনা করার জন্যেই গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে। এই গায়ত্রী দেবের বা সবিতা দেবের পূজার্চনার নাম করেই অনেক পুরোহিত সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দক্ষিণা বা সিধা আদায় করত। এ কথাও বলা হত যে, তারা যদি দিনে মাত্র একবার 'গায়ত্রী দেবীর' চরণে মাথা নত করে, তা হলে তারা স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। গায়ত্রী ছন্দ বা সবিতৃ ঋক্রে সঙ্গে গায়ত্রী দেবের কোন সম্পর্কই নেই।

একদিকে জ্ঞানকাণ্ডের শিক্ষা ছিল এই যে মৃত্যুর পরে শরীর পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। এইভাবে শরীর

পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। অন্যদিকে কর্মকাণ্ডের বিধান ছিল যে, মৃত্যুর পর মৃতের উদ্দেশ্যে সুখাদ্য বা মহার্ঘ বস্ত্র ইত্যাদি প্রদান করতে হবে, যাতে মৃত আত্মা, পারলৌকিক জীবনে তা উপভোগ করতে পারে। কর্মকাণ্ড এই রকম অসংখ্য যুক্তিহীন ও বিভ্রান্তিমূলক নির্দেশে পরিপূর্ণ।

কেউ কেউ আবার এই বলে' লোককে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন যে, বেদের ভিত্তিতে রক্তপাতহীন অথচ সশস্ত্র বিপ্লব নাকি সম্ভব। প্রথমত, একই সঙ্গে রক্তপাত হবে না, অথচ সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত হবে এটা বাস্তবে অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, যে বেদ নিজেই অজস্র ভাবজড়তার সমাহার, সেই বেদের ভিত্তিতে সমাজের বুকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন বা বিপ্লব কীভাবে সম্ভব?

শাস্ত্র, শস্ত্র, অস্ত্র– এই শব্দগুলোর বিভিন্ন অর্থ আছে। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল– মানবীয় মনস্তত্ব, বুদ্ধি ও হিতের ভাবনা সংযুক্ত করে' মানুষের পালনীয় চর্য–অচর্যকে নির্দেশিত করা। যেমন, কোন শাস্ত্রে আছে মদ্যপান

স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। এই সতর্কবাণীর মাধ্যমে শাস্ত্র মানুষকে উপযুক্ত পথ নির্দেশনা দেয়। আর 'শস্ত্র' মানে হচ্ছে শারীরিক বল প্রয়োগ করে' মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা। এর অর্থ শস্ত্রের ব্যবহারে, অন্য শরীরে বলপ্রয়োগের ব্যাপারে রক্তপাতের

সম্ভাবনা অবশ্যই থাকবে; আর 'অস্ত্র' কথাটার অর্থ হচ্ছে লাঠি, ছোরা, বন্দুক, ইত্যাদির সাহায্যে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করা, বা অন্যের ওপর আধিপত্য কায়েম করা। এক্ষেত্রে রক্তপাত তো অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রের ক্ষেত্রে যেখানে প্রয়াস হয় অপ্রত্যক্ষভাবে সেখানে 'শস্ত্র' বা 'অস্ত্রে'র মাধ্যমে প্রয়াস হয় প্রত্যক্ষভাবে। তাই শস্ত্র–বিপ্লবই বলি বা অস্ত্র–বিপ্লবই বলি, এই দু'টিতেই শরীর আঘাতপ্রাপ্ত হবে। তাই এ ধরনের বিপ্লব কখনই রক্তপাতহীন হতে পারে না। কেউ যদি রক্তপাতহীন সশস্ত্র বিপ্লবের বাণী প্রচার করে, তা হলে বুঝতে হবে তারা মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে।

বেদে অবশ্য জাতপাত নিয়ে (caste discrimination) বড় একটা ভেদাভেদের ব্যাপারটা নেই। কিন্তু বেদের বৃহত্তর অংশে জাতিসংক্রান্ত ভেদাভেদ (racial discrination) তথা সেন্টিমেন্ট খুব ভাল করেই আছে। যেমন আর্যদের দেহের রং শাদা, ও তারা উচ্চতর গোষ্ঠীভুক্ত। তাদের অভিহিত করা হত সূর বা দেবতা বলে'। তথাকথিত অনার্যদের বর্ণ কালো, তারা আর্যদের চেয়ে নিকৃষ্টতর গোষ্ঠীভূক্ত। তাদের বলা হত দানব বা অসুর। বেদে অসাম্য বা পক্ষপাতের কথা বেশ ভাল করেই বলা আছে। **তাই বেদের ভিত্তিতে সমাজে সাম্য আনবার যে কোন প্রয়াস প্রমাদপূর্ণ।**

অতীতে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তথা ডগমার ভিত্তিতে অনেক অমনোবৈজ্ঞানিক ধারণা সাধারণ মানুষ বা নারী সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখব যে, এই কারণেই দলে দলে মানুষ প্রথমে জৈন–বৌদ্ধ ধর্মমত, পরে ইসলাম ধর্মমতের আশ্রয় নিয়েছিল। এটা হয়েছিল এই জন্যে যে, মানুষ সেই সময়কার শ্বাসরোধকারী ও অবিচারমূলক পরিবেশে থাকতে চায়নি।

অতীতে ভারতে যদি কোন নারী ভুল করেও বেদের মন্ত্র শুণে নিত, তবে সীসা গালিয়ে তার কাণে ঢেলে দেওয়া হত। এটা করা হত এই জন্যে যাতে নারীকে অবদমিত রেখে সহজেই তাদের শোষণ করা, তথা দাসী হিসেবে খাটিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। তাই আজকে নারীরা এই সব অবিচার আর শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

গৌতম বুদ্ধ প্রথম সেই যুগের ভাবজড়তা আর ভেদাভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এই কারণেই সাধারণ মানুষ দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল, ও তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

সেই যুগে আর্যরাও অনার্যদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য আর পশু লুট করে' নিত, আর সেগুলি তাদের যজ্ঞের কাজে লাগাত। তারই প্রতিক্রিয়ায় অনার্যরাও আর্যদের যজ্ঞস্থল

আক্রমণ করে' তাদের অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করে' আনত। বেদে এই ব্যাপারটাকে বিকৃত করে দেখানো হয়েছে যে, আর্যরাই একমাত্র সদগুণযুক্ত, আর অনার্যরা সর্বক্ষেত্রে দুষ্ট স্বভাবের। অনেক ক্ষেত্রে অনার্যরা বেঁচে থাকার তাগিদেই অপহৃত খাদ্যশস্য উদ্ধার করার জন্যে আর্যদের আক্রমণ করত।

বেদে এমন শ্লোক আছে যাতে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করা, নিষ্ঠুর আচরণ না করা, ইত্যাদি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "মা-হিংসী” অর্থাৎ অন্যের প্রতি হিংসা না করতে; "সংগচ্ছদ্ধম্” অর্থাৎ সকলে মিলে মিশে চলতে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে সমাজে বিদ্বেষ বা অসাম্য বিরাজ করত। না হলে এই সব ভাবধারা প্রচারের কী প্রয়োজন ছিল?

যারা আজ বৈদিক বিপ্লবের কথা বলেন তারা সমাজকে সেই সুদূর অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। বেদে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের কোন ধারণাই নেই। বরং একদিক থেকে দেখতে গেলে, বেদের কিছু কিছু শিক্ষায় প্রতিবিপ্লবাত্মক ভাবধারাই বর্তমান, কেন না তাতে সমাজে অবিচার-জাতিবৈষম্যকে সমর্থন করা হয়েছে। বুদ্ধ ও মহাবীর জৈন তাদের শিক্ষায় প্রথম বিপ্লবাত্মক ভাবধারার প্রবর্ত্তন করলেন, কেন না তাঁরা বৈদিক অসাম্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে

বুদ্ধের শিক্ষা মহাবীর জৈনের শিক্ষার চেয়ে বেশী বিচারসম্মত ও যুক্তিসম্মত।

ৰৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ দুই–ই কেন সময়ের নিরিখে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হ'ল না? এদের দুই–এরই দু'টি প্রধান ত্রুটি আছে, যে কারণে তাদের বিপুল জনপ্রিয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত হ'ল। গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বর ও মানুষের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা দিতে পারেন নি। তাছাড়া তিনি তাঁর শিক্ষা অনুসারে এক উপযুক্ত মানব সমাজ গড়ার চেষ্টা করে' যান নি। মহাবীর জৈন অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন নিগ্রন্থবাদের ওপর। আদিম মানব বস্ত্র পরিধান করত না, কিন্তু আবহাওয়াগত পরিবর্তনের দরুণ তারা শরীরকে আবৃত রাখা শুরু করল। আর তারা যখন এতে অভ্যস্ত হয়ে পরল তখন বস্ত্রহীন অবস্থায় বাইরে যেতে লজ্জাবোধ করত। এজন্যে মহাবীরের নিগ্রন্থবাদের দর্শন কখনই জনসমর্থন পায় নি। দ্বিতীয়ত,

তিনি দয়া আর ক্ষমা করার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি মানুষকে শেখালেন যে সাপ বা বিছের মত মারাত্মক হলেও ঘোর শত্রুকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে' দিতে। এর ফলে মানুষ সমাজের সত্যিকারের শত্রুর বিরুদ্ধেও লড়াই করবার মানসিকতা হারিয়ে ফেলল। তাই যদিও ৰৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ ভাবজড়তাশ্রয়ী নয়, বা তারা সচেতন ভাবে

মানুষকে বিপথে পরিচালিত করতে চায় নি, তবুও তারা কালবাধিত হয়ে পড়লো এই জন্যে যে, তাদের ভাবধারা যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

"প্রণবো ধনু শরোহি আত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ"।।

প্রণব বা আধ্যাত্মিক কাল্ট হচ্ছে একটি ধনুকের মত, জীবাত্মা হচ্ছেন ধনুকে সংস্থাপিত শর; ব্রহ্ম হচ্ছেন লক্ষ্য। যে লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে চায় তাকে শরের ন্যায় একাগ্র হতে হবে। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে এইভাবে লক্ষ্যের প্রতি তন্ময় হতে পারলে তবেই লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব।

সংস্কৃত শব্দ 'মত্ত' এসেছে মূল ধাতু 'মদ' থেকে, যার অর্থ হচ্ছে মাদক ভক্ষণ করা বা তার কবলে পড়া, যার ফলে মানুষ নিজের বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে। ধূমপান ঠিক এই পর্যায়ে না পড়লেও, হাশিস বা আফিম গ্রহণ বা মদ্যপান করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হ'ল স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়া, যার পরিণতিতে শরীর-মনে আসে একটা ঝিমুনি ভাব, ও শেষ পর্যন্ত একজনের বোধশক্তি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আর এক ধরনের মাদক আছে যার ব্যবহারে মানুষের মধ্যে অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, ও ফলস্বরূপ সে নিজের ওপর

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাংঘাতিক কিছু কাণ্ড করে' বসে। এই ধরনের মানুষেরা ভালমন্দ বিচার করবার ক্ষমতাও খুইয়ে বসে। উপরি–উক্ত দুই ধরনের মাদককে বলতে পারি মদ। অহংকারও এক ধরণের মদ। অহংকারের বশবর্তী হয়েও মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

'মত্ত' কথাটার নির্গলিতার্থ হচ্ছে যে তাতে ভাল মন্দ দুই–ই আছে, অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে যে একেবারে মন্দ তা নয়। 'প্রমত্ত' কথাটার অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মন্দ – শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত অনিষ্টকারক। যাদের মধ্যে বিচারশীলতা আছে তারা মানবীয় মনস্তত্ত্বের বা মৌল মানবিক নীতির পরিপন্থী কোন কিছুকেই গ্রহণ বা সমর্থন করতে পারে না। কার্লমার্ক্স প্রদত্ত কম্যুনিজম্ প্রমত্ত ভাবধারার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কম্যুনিজম্ মানুষের জন্যে নিয়ে এসেছে চরম দুর্দশা। এই মতবাদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। মানবসমাজের অবনতির অন্যতম কারণ হচ্ছে এই ত্রুটিপূর্ণ মতবাদ।

ধনী ও স্বার্থপর মানুষেরা অনেক সময় সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষকে নানারকম কুযুক্তিপূর্ণ ভাবধারার বন্ধনে বেঁধে ফেলে, যাতে করে' তারা আরও অধিক ধনসঞ্চয় করতে পারে বা নিজেদের ভোগলালসা চরিতার্থ করতে পারে। ভারতের জাতপাত ব্যবস্থা মানুষকে এই ভাবে শোষণ করবার জন্যেই

ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অতীতে সমাজের উঁচুশ্রেণীর মানুষেরা প্রচার করত যে, তথাকথিত নিচুজাতের গোয়ালা কর্তৃক উঁচুজাতের মানুষকে জল খাওয়ানো পাপ। এর পিছনে এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জল বিহীন দুধের সরবরাহ নিশ্চিত থাকে। অথচ তথাকথিত নিচুজাতের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর ছোঁয়া বা দেওয়া জল খাওয়া উঁচুজাতের পক্ষে পাপ বলে' গণ্য হত না। কেননা তাহলে তো এই সব উঁচুজাতের মানুষদের জল আর দুধ দিয়ে তৈরী নানা রকম লোভনীয় মিষ্টান্ন খাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।

সুবিধাভোগী শ্রেণী নিজের আরাম-আয়েস ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। তারা দরিদ্র মানুষদের মনে হীনম্মন্যতার সূচীকাভরণ করে' দিয়ে তাদের ওপর শোষণ চালাতে থাকে, আর এইভাবে তাদের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বঞ্চিত-শোষিত মানুষেরা কয়েক যুগ পরে হলেও একদিন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, গর্জে ওঠে। মানুষের মূল মনস্তত্ত্বের বিরোধী যা কিছুই থাকবে, তার বিরুদ্ধাচরণ হবেই। যখন অবিচার-অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে' যায় তখন বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

সমস্ত প্রকারের ভাবজড়তাকেই সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। কিন্তু ভাবজড়তার বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে

চাই সৎসাহস। তোমরা সেই সাহস অর্জন করে' নাও, আর ভাবজড়তার বিরুদ্ধে বিপ্লব সংসাধিত করতে ব্রতী হও।

১৩ এপ্রিল ১৯৮৮, কলিকাতা

আইন অমান্য আন্দোলন

তোমাদের কস্তুরী–মৃগনাভি প্রসঙ্গে বলেছিলুম যে, কস্তুরী–মৃগের দেহ–নিঃসৃত হর্মোন নাভিচক্রে জমা হয়ে যতই শক্ত হতে থাকে ততই তার সুগন্ধের মাত্রা বাড়তে থাকে। পরে শেষ পর্যন্ত সে যখন অতি মাত্রায় কঠোরতা প্রাপ্ত হয়, সুগন্ধ বাড়ে অত্যন্ত অধিক। এই অবস্থায় গন্ধমত্ত হরিণ গন্ধের খোঁজে ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যেমন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মদমত্ত মাতঙ্গ যদি উন্মাদ হয়ে যায় তখন সেই উন্মাদ অবস্থায় অল্প কিছুক্ষণ থাকার পরে মারা যায়। তবে সবাই উন্মাদ হয় না। যারা উন্মাদ হয় তারাও বেশী দিন উন্মাদ অবস্থায় বাঁচে না। হাতীদের মধ্যে এই ধরনের মৃত্যু খুব বেশী ঘটে না.......তবে ঘটে বৈকি। পাগলা হাতী যে কেবল মানুষের পক্ষেই ভয়ঙ্কর তাই নয়, অন্য হাতীর কাছেও ভয়ঙ্কর। অন্য হাতীরা তার

ভয়ে দূরে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সাধারণ অবস্থায় হাতী লোকালয়ে প্রবেশ করে খাদ্যান্বেষণে। তাদের অতি প্রিয় খাদ্য হচ্ছে সবুজ ডাল–পালা, পাকা ভুট্টা, পাকা ধান, পাকা গম। নিরুপদ্রবে খাদ্য গ্রহণ করতে পারলে তারা কারও ওপর কখনও আক্রমণ করে না। গ্রামবাসীরা আগুন জ্বেলে, ক্যানেস্তারা–টিন বাজায় তাদের ভয়ে নয়, ঝামেলা এড়াবার জন্যে সে সবই করে থাকে। তোমাদের একবার রাঢ়ের ছড়াটা বলেছিলুম না। রাঢ়ে যখন বর্ষা শেষে শরৎ ও হেমন্তে হাতীর আগমন বাড়ে, গ্রামের লোকেরা তখন হাতীর দিকে তাকিয়ে হাত জোর করে' বলে:

"গড় করিলাম গণেশ ঠাকুর ধনেপ্রাণে বাঁচাইও
কেলা (কেড়া) দিব, ভুট্টা দিব
দুধি ভাতি খাওয়াই দিব
পাণ সুপারি পৈতা দিব
ধনে প্রাণে বাঁচাইও।”

কিন্তু মদমত্ত হাতী যখন ক্ষেপে গেছে খাওয়ার কথা সে তখন ভাবে না, কয়েকদিন অনাহারেই পড়ে থাকে..... নির্জলা অবস্থাতেও থাকে। তার মাথার গরম তাকে প্রেষিত করে বিধি ভাঙার দিকে........সে তখন বিধানকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

তোমরা জান, বিধি ভাঙতে যারা উৎসাহ দেয়, প্ররোচিত করে তাদের পরিণাম ভাল হয় না। তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা পাবার জন্যে ভারতের এক শ্রেণীর নেতা ইংরেজ যুগে আইন অমান্য আন্দোলন (civil disobedience movement: হিন্দীতে কানুন তোড়না) শুরু করেছিলেন। কেউ কেউ বলতেন, এই কানুন ভাঙ্গা তো আমাদের লক্ষ্য নয়...... আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অন্ধকারের কুহেলিকা ভেদ করে' সত্যকে পরিস্ফুট করা...... অন্ধকারের করালকৃষ্ণগ্রাস থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা, এটা আইন অমান্য নয়। এটা আমাদের সত্যকে খুঁজে পাবার আগ্রহ......... এটা সত্যাগ্রহ। কিন্তু গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন সে গোলাপই..... ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে........আইন অমান্য করার পথটাই হ'ল একটা বিধি ভাঙ্গার ব্যবস্থা......বিধানকে চ্যালেঞ্জ করার মনোবৃত্তি। এর ফল ভাল হয় না। তারই অনুরণনে আজ একটু বিক্ষোভ....... একটু অসন্তোষ জাগলেই তিলমাত্র চিন্তা না করে' বেমালুম তারা নিজেদের কর–দত্ত পয়সায় কেনা ট্রাম–বাস পোড়ায়. ..সরকারী–বেসরকারী ভবনে অগ্নি সংযোগ করে' নিজেরই কষ্টার্জিত সম্পদ ভস্মীভূত করে। এসবের আড়ালে লীলাখেলা করে চলেছে সেই ইংরেজ যুগের আইন অমান্য আন্দোলন (civil disobedience movement) বা

সভ্যভব্য ভাষায় সত্যাগ্রহ। না, চুলচেরা বিচারে একে সত্যাগ্রহ বলব না– বলব দুরাগ্রহ। এ সমাজকে ভাঙ্গবার করপেটিকা।

বিপ্লবের নামে, বামতন্ত্রের নামে যারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করে' বেড়ায়, যুক্তিজাল বিবর্জিত হয়ে ভ্রান্ত দর্শনের প্রেষণায় মানবতাকে খুইয়ে বসে, তারাও এই ধরনের মনোবৃত্তির দ্বারা সম্প্রেষিত।

যাই হোক, এত কথা বলা হ'ল পাগলা হাতীর বিধান ভাঙ্গার কথা বলতে গিয়ে। প্রকৃতি বিধান ভাঙ্গা পছন্দ করে না। বিধি বা বিধান যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তা মানতেই হবে। যদি তা ক্ষতিকর বলে' বিবেচিত হয়, যদি তা সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করে, যদি তা প্রতি পদবিক্ষেপে মানুষের চলার পথকে নাগপাশের মত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জাপটে ধরে' রাখতে চায় তবে সে বিধিকে ভেঙ্গে দিয়ে চূর্ণ করে' ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে নূতন বিধি তৈরী করে' সেই বিধিকে মানতে হয়। অন্যথা সমাজে মাৎস্যন্যায় দেখা দেবে যা একক বা সামূহিক দু'য়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। Civil disobedience movement ভারতের সমাজে সেই ক্ষতির ক্ষতই রেখে গেছে।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, কলিকাতা

(শব্দচয়নিকা অষ্টাদশ খণ্ড প্রবচন ১৪০)

সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ

গন্ধহারি+ভীষ = গন্ধহারিণী। সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে জেগেছিল শিল্প সৃষ্টির এষণা ও প্রেষণা। এষণাই প্রেষণাকে ডেকে আনে। সভ্যতার প্রথম ধাপে শিল্পমাত্রই ছিল কুটির শিল্প। নারী-পুরুষ-বালক-বালিকা নির্বিশেষে সবাই শিল্প রচনায় হাত লাগাত। পরে দেখা গেল কিছু শিল্প গ্রামে গ্রামে করা যায় না.....করতে হয় কিছু সংখ্যক গ্রাম নিয়ে। তা না হলে তাদের একদিকে যেমন বাজারের ঘাটতি পড়ে, অন্যদিকে তেমনি শিল্পীর সংখ্যাতেও অভাব দেখা দেয়। তখন মানুষ প্রথম শিল্পায়োগ বা কারখানায় *

* ফার্সি ভাষায় 'কার' শব্দের মানে কাজ। যার কার নেই সে 'বেকার', যে 'কার' জানে সে-ই 'কার-ই-গর'। ফার্সী ভাষায় কর্তৃত্বে **'বর', 'গর', ও 'দার'** এই তিনটি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন যে সওদা করে সে সওদাগর, যে জাদু জানে সে জাদুগর, যার দোকান আছে সে দোকানদার, শর আছে তো শদরি, জান আছে তো 'জানবর', হিম্মৎ আছে তো 'হিম্মৎত্বর'।

যেতে শুরু করল। এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলে' রাখি। শিল্প যত বেশী কুটীর-শিল্প হয়, শিল্প যত বিকেন্দ্রীকৃত হয় মানুষের সুবিধা তত বেশী। এতে যে শুধু আর্থিক সামর্থ্যকে

সূচীপত্র

চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয় তাই-ই নয়, ধনের সর্বত্র মোটামুটি রকমের বন্টন হওয়ায় আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা দেয় না। কোথাও অভাবের তাড়নায় মৃত্যুর হা-হা ধ্বনি, কোথাও প্রাচুর্যের স্ফীতিতে অনাচার কোনটাই বড় একটা হতে পারে না। শুধু কি তাই, বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পে মানুষকে শিল্পায়োগে কাজ করবার জন্যে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে হয় না, যার ফলে বাইরে থাকার জন্যে দু'টো সংসারের খরচের হাত থেকে বাঁচা যায়। আবার কর্মী সংগ্রহেরও সুযোগ পাওয়া যায়। একই মানুষ অর্থোপার্জন ও গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজও করে' থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদী কাঠামোয় সেটা করা যায় না। পুঁজিবাদে সেটাকে সমর্থনও করা হয় না, কারণ পুঁজিবাদে শিল্পায়োগ মুনাফার জন্যে (producation for profiteering): প্রাউটের বক্তব্য...... যে বক্তব্য প্রতিটি সংবেদনশীল মানুষ স্বীকার করবেন পণ্যের উৎপাদন মানুষের প্রয়োজনে

(production for consumption)। তাঁরা [পুঁজিবাদীরা] চান সস্তায় উৎপাদন, ও অধিক মূল্যে বিক্রয়। সস্তায় উৎপাদন করতে গেলে পরিবহন-যোগ্য নৈকট্য চাই, কাঁচামাল চাই, শক্তি চাই, সস্তায় শ্রমিক চাই, প্রয়োজনীয় জল চাই।

তাই পুঁজিবাদ শিল্পে কেন্দ্রীকরণ চাইবেই তা সে পুঁজিবাদ বৈয়স্টিকই হোক, বা গোষ্ঠীগতই হোক। এই ধনতান্ত্রিক মনোভাবের ফলে কলকাতা, মুম্বাই, আমেদাবাদ, দিল্লী,

কানপুর, মাদ্রাজের কাছাকাছি জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে শত সহস্র শিল্পায়োগ। আর বীরভূমের খয়রাসোল, পুরুলিয়ার পুঞ্চা, আরামবাগের গোঘাট ও ন'দের নাকাশিপাড়া অন্ধকারের চামচিকার মত কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে রয়েছে। ওই জায়গাগুলির নামও হয়তো অনেকে শোণনি, শুণবেই বা কী করে? ওখানকার মানুষেরা ভীষণ গরীব, শীতের দিনে পশমী কোট- প্যান্ট তো দূরের কথা, অনেকের আলোয়ানও (র্যাপার) জোটে না। কম্যুনিজম্ হচ্ছে রাষ্ট্রীক পুঁজিবাদ। তাই পুঁজিবাদের দোষগুলি থেকে কম্যুনিজম্ মোটেই মুক্ত নয়। বৈয়ষ্টিক ও গোষ্ঠীগত পুঁজিবাদের মতই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রিক সত্তার দ্বারা পরিচালিত শিল্পায়োগ, অর্থাৎ রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদে যেমন শিল্পায়োগ কেন্দ্রীকৃত হয়, রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদের পরিপোষক কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রেও তেমনি কেন্দ্রীকৃত পুঁজিবাদকে সমর্থন করা হয়। তাই তত্ত্বগত বিচারে বৈয়ষ্টিক মুক্তির প্রশ্নে কম্যুনিজমের সঙ্গে ধনতান্ত্রিকতা বা পুঁজিবাদে কিছুটা লোক দেখানো বা খোসা-খোলার পার্থক্য থাকলেও, ভেতরের আঁটিটি দু-য়েরই এক। দুই-ই একই পুঁজিবাদের পোঁ-ধরা। মানুষকে যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে মুক্তির আশ্বাস দিতে হয়, তাহলে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ করতেই হবে।

গ্রাম–ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়তে যদি সাময়িক অসুবিধা থেকেও থাকে, তবু উপভুক্তি–ভিত্তিক (block-level) অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরী করায় এমন কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যে শিল্পায়োগ স্থাপনায়, পরিচালনায় তথা ভোগ্যবন্টনে উপভুক্তি ভিত্তিতে গড়তে একান্ত ভাবে অসুবিধা জনক কেবল সেগুলিই বৃহত্তর পরিভূতে করা যেতে পারে। যেমন ইস্পাতের কারখানা গ্রামে গ্রামে, ব্লকে ব্লকে, জেলায় না করে' একটা বৃহত্তর পরিভূতে করলে সুবিধাজনক। এমন কিছু কিছু প্রগ্রহ শিল্প (key Industry) আছে, যার পরিচালনা ক্ষুদ্র পরিভূতে বা সমবায়ের দ্বারা হওয়া একটু সুবিধাজনক। সেগুলিকে রাষ্ট্রিক পরিচালনাতেই করতে হবে। একটু বৃহত্তর পরিভূতেই করতে হবে। তবে এই বৃহত্তর পরিভূতে পরিচালিত প্রগ্রহ শিল্পকে ধনতান্ত্রিকের হাতে ছাড়া সম্ভব নয়, কারণ তাতে জনগণের প্রয়োজন পূর্ণভাবে না হোক আংশিকভাবে অস্বীকৃত থেকেই যাবে। ধনতান্ত্রিকের হাতে ছেড়ে দিলে [যেমন অসুবিধা তেমনি] সেই সকল ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পকারখানায় ছোট বড় নানান রকম ঝামেলা থাকায় সমবায়ের দ্বারা [সেগুলির] পরিচালনায় অসুবিধা দেখা যেতে পারে। কেবল সেই অতি বৃহৎ শিল্পগুলি রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় থাকবে। তাকে বিকেন্দ্রীকরণ না করে' কেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে। তবে যাকে আজ বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভবপর নয়

বলে' মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাকেও হয়তো বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব হবে। তখন তাকে তাই–ই করতে হবে। কেন্দ্রীকৃত শিল্পে আরও অনেক অসুবিধা রয়েছে। যেমন– কেন্দ্রীকৃত শিল্পে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, তাজা ফলমূল, শাকসব্জী, দুধের অভাব, নৈতিক অনাচার, চোর–ডাকাত–সমাজবিরোধীদের লুকিয়ে থাকার আস্তানা, নেশাগ্রস্তদের ভীড়–ভাড়াক্কা, পাপাচারীদের কৃষ্ণ গহ্বর, ওজনের অভাব, বায়ু বিদূষণ, জল বিদূষণ .....আর কত বলি।

হ্যাঁ, সাবেকী কথায় ফিরে আসা যাক। প্রাচীনকালে যে সকল মানুষকে কাজ করবার তাগিদে দূরের কর্মশালায় যেতে হত তাদের বলা হত 'গন্ধহারিণ'। মেয়েরা সাধারণতঃ বাড়ীর বাইরে কাজকর্ম করতে যেতেন না কারণ তাঁরা ঘরে থেকে যেমন শিল্প–কর্ম করতেন, তার সঙ্গে তাঁরা ফাঁকে ফাঁকে গৃহস্থালীর অনেক কাজও করতে পারতেন। তবু যাঁদের যেতে হত তাঁদেরই বলা হত 'গন্ধহারিণী' (গন্ধহারি+ঙীষ)।

তোমরা জান এমন কিছু দক্ষ শিল্পী থাকেন যাঁদের গাঁয়ে গঞ্জে ঠিক কদর হয় না। শুধু কদরের জন্যেই বা বলি কেন, উদরের প্রয়োজনেও বাধ্য হয়ে তাঁদের দূরে যেতে হয়। শুণেছি, নবাবী আমলে বর্ধমানে হাতীর দাঁতের ভাল শিল্পী ছিলেন। কিন্তু বর্ধমানে হাতীর দাঁতের জিনিসের তেমন কোন বিক্রয়কেন্দ্র ছিল না.....ছিল বড় ধরনের কেন্দ্র

মুর্শিদাবাদে...... আর ছোট ধরনের বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর আর ঢাকায়। তাই সেদিনের বর্ধমানের হাতীর দাঁতের কারিগরদের বর্ধমান ছেড়ে ওই সব অঞ্চলে যেতেই হত। এই সব দক্ষ কারিগর, যাদের অন্যত্র যেতে হত তাদের বলা হত 'গন্ধহারিক', আর ওই ধরনের দক্ষ মহিলাকে বলা হত 'গন্ধহারিকা'।

৬ নভেম্বর ১৯৮৮, কলিকাতা

(শব্দচয়নিকা ঊনবিংশ খণ্ড প্রবচন ১৪৮)

তিন প্রকারের জীবিকা

মানুষের রয়েছে তিন ধরনের জীবিকা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবিকা। কিন্তু পশুদের জীবিকা হ'ল কেবল একটি শারীরিক জীবিকা। তাই পশুদের যদি খাবার জুটে গেল তো তারা দিব্যি খুশীতে দিন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু মানুষের তেমনটি হয় না, মানুষ কেবল দু'মুঠো খাবার পেলে অর্থাৎ তার দৈহিক জীবিকার পূর্ত্তি ঘটলেই সে তৃপ্ত হতে পারে না। মানুষ চায় তার মনের জীবিকা পূরণ করতে, আধ্যাত্মিক ক্ষুধার আত্যন্তিকী নিবৃত্তি বা আত্মিক জীবিকারও

পূর্ত্তি ঘটাতে। মানসিক জীবিকা বলতে এখানে কি বোঝান হচ্ছে? মানসিক জীবিকা হ'ল সেই সব মানসিক কর্ম যা মানুষের মনকে বিষয়ভাবে নিযুক্ত করে চলেছে। আর আধ্যাত্মিক বা ধার্মিক জীবিকা বলব তাকেই যা মানব মনকে ধর্মের অধিক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছে।

আজ থেকে প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে এই পৃথিবী নামক গ্রহে প্রথম মানব শিশুর আবির্ভাব ঘটেছিল– ঘটেছিল পূর্ব ভারতে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূমিখণ্ড রাঢ়ের মাটিতে।

যেদিন যে মানুষ পৃথিবীতে এসেছিল তারা অবশ্য পশুদের তুলনায় খুব বেশী একটা উন্নত জীব ছিল না। সেই নবাগত প্রায়–পশুস্বভাবের মানুষদেরও সেদিন ছিল একটিই মাত্র জীবিকা– অর্থাৎ তাদের দৈহিক জীবিকা। তাদের প্রতি মুহূর্ত্তে বেঁচে থাকতে হত ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সেদিনের অনগ্রসর মানুষ তখনও কৃষি আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই খাদ্যের জন্যে তাদের উদয়াস্ত শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হত বনে জঙ্গলে। তাদের তখন রাত্রি–দিন শুধু একটাই চিন্তা থাকত যে কীভাবে তাদের দিনের প্রয়োজনীয় খাবারটুকু তারা সংগ্রহ করবে। খাদ্যের খোঁজে শিকারের প্রয়োজন মেটাতে মানুষ সেদিন অস্ত্রের প্রয়োজনও অনুভব করেছিল। মানুষ তার প্রয়োজন মেটাতে হাড়ের সহায়তায় অস্ত্র নির্মাণ করতে শুরু করল।

এমনিভাবে আদিম মানুষ তাদের চলার পথে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন এক সন্ধিক্ষণে সূচনা করল অস্থি যুগের **(Bone age)।** মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রথম চরণ রূপে চিহ্নিত হয়ে আসছে মানুষের সেই সুপ্রাচীন কালের অস্থি–যুগটি। কিন্তু জীবন সংগ্রামের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে মানুষের সব প্রয়োজন অস্থি– নির্মিত অস্ত্রের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

তাই মানব জাতির অগ্রগতির দ্বিতীয় অধ্যায়ে এল **প্রস্তর যুগ।** এই যুগে প্রস্তর নির্মিত নানা জাতীয় অস্ত্র–শস্ত্রই প্রাধান্য পেল। অস্থির তুলনায় প্রস্তরখণ্ড অধিকতর শক্ত, সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় মানুষ অস্ত্র নির্মাণে প্রস্তরকেই প্রাধান্য দিতে শুরু করল। আজও রাঢ় অঞ্চলের অনেক পাহাড়ের পাদদেশে যেখানে অতি সুপ্রাচীন কালে বয়ে যেত জানা–অজানা বিভিন্ন নদীর সলিল ধারা, তাদের অধুনালুপ্ত নদীবক্ষের দু'ধারে যদি খনন কাজ চালানো যায় তবে মৃত্তিকা গর্ভ থেকে উঠে আসবে প্রস্তর যুগের মানুষদের ব্যবহৃত অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণের প্রত্ন– নিদর্শন।

তারপর মানুষের অগ্রগতির তৃতীয় ধাপে এল তাম্র যুগ **(Bronze Age)।** এই যুগে ঘটল মানুষের প্রথম ধাতু নির্মিত শৈল্পিক অভিব্যক্তি, ভাস্কর্য বিদ্যার স্থূল অভিপ্রকাশ। তামার

ধাতুতে মানুষ গড়ে তুলতে চেষ্টা করল নানা দেবদেবীর মূর্তি। আজও রাঢ়ের ওই সব পরিত্যক্ত অখ্যাত অঞ্চলের বুজে যাওয়া নদীগুলির দু'ধারে খুঁজলে পাওয়া যাবে তাম্র নির্মিত নানা মূর্তি ও ব্যবহার সামগ্রী।

তাম্র যুগ মানুষের চলার পথকে এগিয়ে নিয়ে গেল আর এক গুরুত্বপূর্ণ যুগের সিংহদ্বারে। মানব সভ্যতায় সূচনা ঘটল তৃতীয় যুগের। এল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই লৌহ যুগ (**Iron age)।** এই যুগ মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এনে দিল দ্রুতি ও ব্যপ্তি। সংগ্রামরত অগ্রসরমান মানব জাতির পূর্বপুরুষেরা এই যুগেই ঘটাল যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অর্থাৎ চাকা (wheel)। মানুষ এই পৃথিবী নামক গ্রহে আবির্ভূত হয়েছিল আজ থেকে ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে, কিন্তু ৯ লক্ষ বৎসরের দীর্ঘ সময়কাল অতিক্রম করতে হয়েছিল সেদিন মানুষকে অস্থি যুগ থেকে প্রস্তর যুগ, তারপর তাম্রযুগ অতিক্রম করে লৌহ যুগে পৌঁছুতে। আজ থেকে ১ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানব-জীবনে সূচনা হয়েছিল ঘটনাবহুল এই লৌহযুগের। এখানে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি। লৌহ যুগ' শুরু হবার পূর্ব সময় অবধি মানুষ কিন্তু বসবাস করত পাহাড়ের গুহায় অথবা বৃক্ষ শাখায়। এই সব অনুন্নত আদিম মানুষদের জীবিকাও তখন ছিল মাত্র একটি তাদের শারীরিক জীবিকা। যদিও তারা তখন অল্প-স্বল্প ভাবনা-চিন্তায় নিজেদের বৈয়স্টিক

শক্তিকে নিয়োজিত করতে শুরু করেছিল, তবু মুখ্যতঃ তাদের কর্ম ও ভাব-ভাবনাগুলি ছিল দেহ-কেন্দ্রিক। তাই তারা ছিল একটি মাত্র জীবিকা-নির্ভর। তাদের জীবন অতিবাহিত হয়ে যেত খাদ্য সংগ্রহ করতে, খাবার তৈরী করতে ও উদরের পূর্ত্তি ঘটাতে। মানসিক জীবিকা বলতে তাদের তখন যতটুকু অভিব্যক্তি ঘটত সেগুলি কেবলমাত্র লোক-নৃত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আজকের মানুষের শুণতে হয়ত কেমন লাগবে তবু তোমাদের জানিয়ে রাখি যে সেই অনগ্রসর আদিম সমাজে মানুষের যতগুলি যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেছিল তাদের মধ্যে মই-য়ের (Ladder) ব্যবহারও ছিল একটি। বৃক্ষশাখায় বাঁধা কুটীরে মানুষকে দিনে রাতে নানা প্রয়োজনে ঘন ঘন উঠতে নামতে হত। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সেদিন মই আবিষ্কার করেছিল। পরবর্ত্তী কালে এই মইয়েরই পরিবর্ত্তিত সংস্করণ রূপে কর্ষকরা কৃষিক্ষেত্রে শক্ত মাটির ঢেলা গুড়ো করতে বা জমিকে সমান করে গড়ে তুলতে মই-য়ের ব্যবহার শুরু করেছিল। আজও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্ষকরা জমিতে হলকর্ষণের সময় মইয়ের ব্যবহার করে থাকেন।

আরও পরবর্ত্তীকালে মানুষ আবিষ্কার করল তাদের সমাজ ও সভ্যতা গড়ে ওঠার পথে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটিকে

অর্থাৎ কৃষি পদ্ধতিকে। কৃষির মাধ্যমে মানুষ খড় উৎপাদন করল ও তার ব্যবহারও শুরু করল। মাটির বুকে খড় দিয়ে তারা বাসা বাঁধতে শুরু করল। ধীরে ধীরে মানব মনীষা আয়ত্ত করল বাস্তু-বিজ্ঞান, তারা শুরু করল গৃহ-নির্মাণ। কৃষির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরাও নিজেদের পছন্দ অনুসারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করল। সেই সঙ্গে তাঁদের জীবনে এল কিছুটা স্থিতি ও নিরাপত্তা। জীবনে তাঁদের এই যে স্থিতি ও নিরাপত্তার স্বস্তিৰোধ জাগল তারই অবকাশে মানুষ দৈহিক ও মানসিক জগতের অধিক্ষেত্রকে অতিক্রম করে আরও সূক্ষ্মতর ও উর্দ্ধতর লোকের কথা ভাবতে শুরু করল। এমনি ভাবে মানুষ তার মনোজগতে ভাবতে ও অনুভব করতে শুরু করল আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূর্ত্তির বিষয়টি। আজ থেকে অনুমানিক ১৬,০০০ বছর পূর্বে মানুষের চেতনার পরিভূতে নেমে এল দ্যূতিময় এক অধ্যাত্মৰোধ। সেই থেকে মানুষের জীবনে তৃতীয় মাত্রাটিও যুক্ত হ'ল যার নাম আত্মিক জীবিকা। মানুষ পরমতত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করল। এল দর্শনের কিছু কিছু তাত্বিক ধারণা। এভাবে ক্রমে লিখিত হ'ল বেদের আরণ্যক ও উপনিষদের অংশগুলি।

প্রায় একই সময়ে নানামুখী কর্মৈষণার ধারা বেয়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক কাজেও দক্ষতা অর্জন করতে শুরু

করল। শারীরিক শক্তিতে যাঁরা ছিলেন যথেষ্ট বলবান তাঁরা দায়িত্ব নিলেন, গ্রাম বা জনগোষ্ঠীর ধনপ্রাণ ও নিরাপত্তা রক্ষার। আর যাঁরা সূক্ষ্মতর শৈল্পিক দক্ষতার কিছুটা পরিচয় দিতে সক্ষম হলেন তাঁরা মৃৎপাত্র নির্মাণ, হস্তশিল্প, বস্ত্রবয়ন বা ওই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন কাজে দক্ষ হয়ে উঠলেন। এভাবে বৃত্তি-নির্ভর শ্রম-বিভাজন ঘটলেও তখনও এই বিভাজনের ভিত্তিতে সমাজে কিন্তু জাতিবাদের (casteism) উদ্ভব ঘটেনি।

লৌহ যুগে মানুষেরা অধিকতর বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করে এগিয়ে চললেন কৃষি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে। তারা নানা ধরনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্মাণ করতে শুরু করলেন। মানুষের চাকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গো-শকটের ব্যবহারও সমাজে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না। সেই অনগ্রসর সমাজের প্রায়ান্ধকার যুগে যে সব মহান ব্যষ্টি তাঁদের চিন্তাশক্তি, বৈদূর্য ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভাবলে চাকা বা গো-শকট জাতীয় এক একটি জিনিস আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সমাজের সাধারণ মানুষ তাঁদের গভীর শ্রদ্ধায় 'মহাত্মন' নামে অভিহিত করতে শুরু করলেন। আজ যাঁরা পুরুলিয়া বা রাঢ় অঞ্চলে 'মাহাতো' উপাধি ব্যবহার করে থাকেন তাঁরা আসলে অতীতের সেই উন্নত-ধী মানুষেরই ভবিষ্যৎ বংশধর। প্রাচীনকালের সেই 'মহাত্মন' শব্দ থেকেই আজকের 'মাহাতো' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। অনেকে ভাবেন

যে মাহাতোরা হয়তো বা স্বতন্ত্র কোন জাত (caste); তাঁদের এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল; মাহাতোরা কোন 'জাত' নয়, মাহাতোরা তাঁদের অতীতের প্রতিভাধর জ্ঞানোদীপ্ত পূর্বপুরুষ মহাত্মনদেরই বর্তমান বংশধর। এভাবে জাত–পাতের ভাবধারা মনে ঢুকিয়ে সমাজের মানুষদের খণ্ড–বিখণ্ড করে রাখার বিভেদমূলক প্রথাটাই সম্পূর্ণতঃ যুক্তি বিবর্জিত ও মানবতাবিরোধী।

যাইহোক, বর্তমান যুগের মানুষেরা অধিক থেকে অধিকতর হারে মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবিকাতেই নিজেদের আত্মনিয়োগ করে চলেছেন। ভবিষ্যতে তাঁদের এই মানসিক জীবিকা ও আত্মিক জীবিকার প্রতি ঝোঁকটা আরও অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

ভবিষ্যতে **আনন্দমার্গ কিন্তু কখনও কাউকে জোর জবরদস্তি করে মার্গের দর্শন ও আদর্শের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে না। আমাদের সংঘ সব মানুষকে নিঃস্বার্থ সেবা, ত্যাগ, সাধনা, নৈতিক আচরণ ও সর্বাত্মক জ্ঞান অর্জনের জন্যে নিরলসভাবে প্রেরণা যুগিয়ে যাবে।**
আনন্দমার্গ এক সর্বকৌণিক ও সুসংহত জীবনধারা। মার্গের প্রদত্ত আধ্যাত্মিক অনুশীলন পদ্ধতি যে জপ–ধ্যান বা ধারণা ইত্যাদি শিক্ষা দেয় সেগুলিই হ'ল আত্মিক বা ধার্মিক জীবিকা।

সূচীপত্র

এমনিভাবে চলার পথে মানুষ তাদের জীবনকে শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে চরম চরিতার্থতার শীর্ষ বিন্দুতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার অস্তির জন্যে দৈহিক বা ভৌতিক স্তরে তাকে নানাভাবে আপন শক্তিকে নিয়োজিত করতে হচ্ছে। ভৌতিক স্তরে মানুষের টিকে থাকার এই যে প্রয়াস একেই বলছি শারীরিক জীবিকা। মানস ভূমিতে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর যে জিজ্ঞাসা, মনন বা চিন্তন ঘটে চলেছে সেগুলি হ'ল তার মানস-জীবিকা; আর ধ্যানে-জপে, ধারণায় অথবা প্রত্যাহার যোগে মানুষের যে চরম আধ্যাত্মিক অধিক্ষেত্রে পৌঁছুবার অন্তর্মুখী একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সেগুলি হ'ল তাঁর আত্মিক-জীবিকা। এই তিন ধরনের জীবিকার সাহায্যেই মানুষ বেঁচে আছে, তার বিস্তার ঘটাচ্ছে ও পরিণামে চরম সম্প্রাপ্তিতে নিজেকে মনুষ্যত্বের গৌরবোজ্জ্বল স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হচ্ছে। সব মানুষেরই উচিত তাদের বৈয়ষ্টিক সামূহিক জীবনে এই জীবিকা-ত্রয়ের যথাযথ ও সুসন্তুলিত সম্প্রয়োগ ঘটানো।

১১ নভেম্বর ১৯৮৮, কলিকাতা

তিনটি মৌল সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক নীতি

সূচীপত্র

মানুষের সার্বিক বিকাশ ও কল্যাণের স্বার্থে সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হচ্ছে কয়েকটি মৌলিক সামাজিক–রাষ্ট্রনৈতিক নীতি অনুসরণ করে চলা। এই ধরনের সুদৃঢ় ভিত্তি না থাকলে অনৈক্য, অবিচার ও শোষণ সমাজের বুকে বাসা বাঁধবেই। এটা থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্যে ও প্রতিটি মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সমাজ নেতাদের কর্তব্য হচ্ছে মৌল সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক নীতিগুলি যাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয় তা সুনিশ্চিত করা। এটা না হলে বৈয়ষ্টিক ও সামূহিক ক্ষেত্রে প্রগতিলাভ অসম্ভব।

তিনটি মৌল সামাজিক–রাজনৈতিক নীতিকে কখনই অমান্য করা উচিত নয়। প্রথমতঃ **বিকল্প ব্যবস্থা না করে কখনও কাউকে জীবিকা থেকে ছাঁটাই করা উচিত নয়।** দ্বিতীয়তঃ চাপসৃষ্টি করে কাউকে ধর্মমতান্তরিত করা উচিত নয়। তৃতীয়তঃ কোন মাতৃভাষাকেই দাবিয়ে রাখা উচিত নয়।

জীবিকা, আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও মাতৃভাষা–এই তিনটি মানুষের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেন্টিমেন্ট আঘাতপ্রাপ্ত হলে মানুষ গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তাই এগুলির অন্যথা হওয়া উচিত নয়।

অতীতে এই ধরনের মৌলনীতি লঙ্ঘিত হওয়ার ফলে সামূহিক ও বৈয়ষ্টিক জীবনে যে দুর্দৈব ও বিপর্যয় নেবে

এসেছে তার ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে। মানুষ জীবিকাচ্যুত হলে কী বিষময় ফল হয় তা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। ধরা যাক ভারতের রিক্সাচালকদের কথা। রিক্সাচালকদের কাজ প্রচণ্ড পরিশ্রমসাধ্য অথচ সেই তুলনায় তারা যা উপার্জন করে তা অতিসামান্য। কিন্তু রিক্সাচালনা বেআইনী ঘোষিত হলে তারা কর্মচ্যুত হয়ে পড়বে ও নিদারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। যারা বিকল্প জীবিকা খুঁজে নিতে পারবে না তারা হয় না খেয়ে মরবে বা বেঁচে থাকার তাগিদে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হবে। এই দুই ক্ষেত্রেই সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই রিক্সা চালানো বেআইনী ঘোষণা করার আগে প্রতিটি রিক্সাচালকের জন্যে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। পাঠান যুগে ও মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে জমিদারদের সৈন্যদল রাখার অনুমতি ছিল। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ও ব্রিটিশ শাসনের শুরুতেই এই প্রথার বিলোপ সাধন হয়ে যায়। ফলস্বরূপ রাঢ়ের বাদীরা, মেদেনীপুরের চুয়াড় ও লোধা জনগোষ্ঠীর লোকেরা কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে ও তারা ক্রিমিন্যালে পরিণত হয়। এমন কি তিরিশ–চল্লিশ বছর আগেও এই সব জনগোষ্ঠীর লোকেরা অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকত। অবশ্য বর্তমানে তারা প্রায় সকলেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।

যদি সেই সময়েই এই মানুষদের মিলিটারী বা পুলিশে কর্মসংস্থান করে দেওয়া হত তাহলে তারা খেয়ে পরে বেঁচে থাকত ও সমাজের ক্ষতি করতে বাধ্য হত না। সেক্ষেত্রে আজ তাদের অবস্থা আরও ভাল হত।

আরও একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ব্রিটিশ যুগে অনেক ছোটছোট রাজ্য রাজামহারাজাদের শাসনাধীনে ছিল। ভারত যখন স্বাধীন হ'ল তখন এই সব দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়ে গেল আর ভারত সরকার পূর্বতন রাজামহারাজাদের ভাতা প্রদান শুরু করলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা একেবারেই ফলপ্রসূ ছিল না কেন না ওই পূর্বতন রাজামহারাজারা অনেকেই বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন ও বেহিসাবী জীবন অবলম্বন করে অর্থের অপচয় ঘটাতে লাগলেন। জনৈক নেতার প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে এই ব্যবস্থা হঠাৎ করে রদ্ করে দেওয়া হ'ল। এর ফলে ভাতা গ্রহীতাদের মধ্যে যাঁদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না তাঁরা বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা করে নিতে পারলেন না ও তাঁরা খুব কষ্টের মধ্যে পড়ে গেলেন। বিশেষ করে এঁদের মধ্যে যাঁরা বৃদ্ধ ছিলেন তাঁরা এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে দারুণ অসুবিধায় পড়লেন। প্রথমত সরকারের পক্ষে এই ভুল নীতি গ্রহণ করাই উচিত ছিল না। আর যদি তা গ্রহণ করা হ'ল তবে সরকারের কর্তব্য ছিল ধাপে ধাপে এই ব্যবস্থা রহিত করা

আর মানবিকতার খাতিরে বয়স্কদের পুরো আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করা।

তাহলে তোমরা বুঝলে বৈকল্পিক ব্যবস্থা না করে মানুষকে জীবিকাচ্যুত করলে কী ফলশ্রুতি হয়?

দ্বিতীয় অবশ্য পালনীয় নীতি হচ্ছে মানুষকে জোর করে ধর্মমতান্তরিত না করা। যদি কোন রিলিজন মানুষকে ঠিক মত দিশানির্দেশ করতে পারে তবে তা ত্যাগ করে নিশ্চয়ই কেউ যাবে না। কিন্তু কোন রিলিজন যদি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলে বা যদি তার নীতি–শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ হয় যেমন জাতিভেদ ব্যবস্থাকে সমর্থন করা বা দরিদ্র মানুষদের ওপর অত্যাচার করা তবে সেই রিলিজনের অনুসরণকারীদের স্বভাবতই নিজ রিলিজন সম্পর্কে মোহভঙ্গ হবে। অন্য রিলিজনের লোকেরা তখন এই ত্রুটির সুযোগ নিয়ে তাদের জোর করে ধর্মমতান্তরিত করার চেষ্টা করবে।

এমন অনেক উদাহরণ আছে যে অতীতে হিন্দুদের এক বৃহৎ অংশকে বাধ্য হয়ে অন্য রিলিজন গ্রহণ করতে হয়েছিল। অনেক হিন্দু ধর্মমতাবলম্বীকে তাদের অজান্তে পেঁয়াজ বা নিষিদ্ধ মাংস খাইয়ে দিয়ে অথবা হিন্দু রমণীদের জোরপূর্বক অপহরণ করে শাস্ত্রীয় বিধিভঙ্গের অপরাধে পাপগ্রস্ত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। এর ফলে হিন্দু স্মার্ত পণ্ডিতেরা তাদের

সমাজচ্যুত তথা জাতিচ্যুত বলে ঘোষণা করলেন। যারা এই জোরপূর্বক ধর্মমমতান্তরণকে প্রোৎসাহিত করেছিল তারা যখন বুঝল যে এইভাবে কাজ হাসিল করা খুব সহজ তখন তারা বলপূর্বক ধর্মমতান্তরিত করার অভিযানকে আরও জোরদার করে তুলল।

কালাচাঁদ নামে ৰাংলার এক জমিদার যে কালীর উপাসক ছিলো ও পরবর্ত্তীকালে কালাপাহাড় নামে অভিহিত হয়েছিলো সম্পর্কে যে গল্পটি প্রচলিত আছে তা অনেকেই জানে। সে এক পাথরের কালীমূর্তিকে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে পূজো করতো। তখন বিদেশী আক্রমণকারী ভারত জুড়ে তথাকথিত হিন্দুদের মন্দির ও দেবতা ধ্বংস করার অভিযান চালাচ্ছিল। যখন কালাচাঁদের মন্দির ধ্বংস হবার উপক্রম হ'ল তখন সে কালীমূর্ত্তিব কাছে প্রার্থনা করলো, "মা, তোমাকে রক্ষা করার সামর্থ্য আমার নেই। তুমি নিজেই নিজেকে রক্ষা কোরো।" কিন্তু পাথরের তৈরী একটি মূর্ত্তি কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবে? যথাসময়ে সেই কালী মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল। এতে কালাচাঁদ কালীদেবীর প্রতি বিশ্বাস হারাল। আক্রমণকারীদের ধর্মমত গ্রহণ করল ও তার নাম হ'ল শেখ কালুদ্দিন খাঁ। সে এরপর বাঙলা ও ওড়িষ্যা জুড়ে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল ও জোর করে মানুষকে তার নবলব্ধ ধর্মমতে ধর্মমমতান্তরণ করাতে লাগল। সে দেবদেবীর মূর্ত্তি

বিকৃত করে দিত। মন্দির ধ্বংস করত আর ধর্মমতান্তরণের জন্যে অকথ্য অত্যাচার চালাত। একবার সে কাশী পৌঁছল আর তার বড় ভগিনীকে ধর্মমত ত্যাগ করতে চাপ সৃষ্টি করল। ভগিনী কিন্তু সেই ভীতি প্রদর্শনের কাছে নতিস্বীকার করল না। বরং তার অন্যায় আচরণের জন্যে তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করল। এতে সে তার ভুল বুঝল ও সেই অভিযান ত্যাগ করল।

এই ঘটনা থেকে ৰাংলার পণ্ডিতেরা বুঝতে পারলেন যে খুব শীঘ্রই এখানকার ব্রাহ্মণেরা নিজ ধর্মমত ত্যাগ করে ইস্লাম ধর্মমতকে গ্রহণ করে নিতে পারে। তখন দেবীবর ঘটক (মল্লারপুর, বীরভূম) নামে একজন পণ্ডিত তথাকথিত হিন্দুদের জাতিচ্যুত হয়ে অন্য ধর্মমত গ্রহণ করা প্রতিহত করতে একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি যুক্তি দিলেন যে যাঁরা বাধ্য হয়ে হিন্দু ধর্মমতের শাস্ত্রীয় নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাঁদের সমাজচ্যুত না করে হিন্দু ধর্মমতের মধ্যেই পৃথক একটি গোষ্ঠী বলে স্বীকার করে নেওয়া হোক। উদাহরণস্বরূপ, যে পরিবারের মেয়েকে জোর করে অপহরণ করা হয়েছে তারা একটি গোষ্ঠী; আবার যাদের জোরপূর্বক পিঁয়াজ বা নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করানো হয়েছে তারা আর একটি গোষ্ঠী।

এই সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে ও এই ভাবে নিজেদের স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাত্রা বজায় রাখতে পারবে। এই ব্যবস্থাকে বলা হ'ল মেলবন্ধন আর এর ফলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ইসলামে ধর্মান্তরণ থেকে অনেকাংশে রক্ষা পেল। ৰাংলার কায়স্থরা যদিও এই মেলবন্ধন ব্যবস্থাকে মেনে নেয়নি কিন্তু এর মূল ভাবধারাকে তারাও স্বীকার করে নিয়েছিল ও সেই অনুযায়ী তারা কাউকে জাতিচ্যুত করেনি।

বিহারে ব্যাপারটা হয়েছিল একটু অন্যরকম। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাদের জোর করে ধর্মমতান্তরিত করা হয়েছিল তারা নিজেদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী তৈরী করল ও 'সৈয়দ' উপাধি গ্রহণ করল। ধর্মমতান্তরিত কায়স্থরা নিল 'মল্লিক' উপাধি, রাজপুতরা 'মিয়া মুসলমান' বা 'পাঠান মুসলমান', আর ভূমিহাররা হ'ল 'শেখ মুসলমান'।

হিন্দু ধর্মমতে যত দিন জাতপাত বজায় থাকবে ততদিন তার পতন হতে থাকবে আর মানুষ অন্য ধর্মমতে ধর্মমতান্তরিত হতে থাকবে। আর হিন্দু ধর্মমতের যদি এইভাবে পতন হতে থাকে তা হলে ভারতীয় সমাজের প্রগতিও ব্যাহত হবে কেননা তথাকথিত হিন্দুরা হচ্ছে ভারতের প্রধান জনগোষ্ঠী। তাছাড়া যদি ধর্মমতান্তরণ চলতেই থাকে তাহলে মহিলারাও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবেন। এতে

সমাজের অধোগতি আরও ত্বরান্বিত হবে। তাই জোর পূর্বক এক ধর্মমত থেকে অন্য ধর্মমতে ধর্মমতান্তরণ কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

সমস্ত ধর্মমত অবশ্যই যুক্তি আর বিচারশীলতার শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তাহলে এই পরিস্থিতি তৈরী হবে না। যদি কোন ধর্মমতের মানুষ পরিস্থিতির চাপে সেই ধর্মমতের শিক্ষা প্রতিপালন করতে অক্ষম হয় তাহলে তাদের কখনই জাতিচ্যুত করা উচিত নয়। এমন কি জেনেশুনেও কেউ যদি সংশ্লিষ্ট ধর্মমতের আচরণবিধি ভঙ্গ করে তাহলেও তাকে ভুল শোধরানোর যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া উচিত। কোন ধর্মমত একটা কাঁচের পাত্রের মত ঠুনকো হওয়া উচিত নয় যাতে একটু টোকা দিলেই তা ভেঙ্গে পড়বে।

ভবিষ্যতে যদি অধিকাংশ মানুষ আনন্দম গী হয়ে যায় তাহলে তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই কারোর ধর্মমতগত সেন্টিমেন্ট যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত থাকবে সব দেবদেবীর মূর্তি, আর মঠ-মন্দির ইত্যাদির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে যাতে দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য খুন্ন না হয়।

তৃতীয় হচ্ছে কোন মাতৃভাষাই অবদমিত হবে না। মাতৃভাষাকে দাবিয়ে রাখলে তার পরিণতি হয় ভয়ানক। বাঙলাদেশের উদাহরণই ধরা যাক। পাকিস্তান হওয়ার পর উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছিল। কিন্তু (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলিয়ে) অবিভক্ত পাকিস্তানে জনগণের ৬০ শতাংশ বাংলায় কথা বলতো, আর হিন্দী বালুচী, পঞ্জাবী ও উর্দু ভাষায় কথা বলতো বাকী ৪০ শতাংশ লোক। এই ছিল প্রকৃত ভাষা পরিস্থিতি। কিন্তু উর্দু ভাষাকে জাতীয় ভাষা করায় পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) বিদ্রোহ করলো। শেষপর্যন্ত পাকিস্তান ভেঙে গেল, ও বাঙলাদেশ স্বাধীন হ'ল। সেই সময়ের একটি বিখ্যাত গান 'ওরা আমার মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়' জনগণের আবেগের উদ্বোধন ঘটিয়েছিল, আর মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবীকে ঘিরে সমস্ত দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ভারতে অ–হিন্দীভাষীদের ওপর হিন্দীভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে এক রাজ্যের সঙ্গে আর এক রাজ্যের, ও কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বৈরী মনোভাব তৈরী হয়েছে। হিন্দী চাপিয়ে দেওয়ার ফলে হিন্দীসাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি হয়েছে, আর যারা হিন্দীতে কথা বলে না তারা অবদমিত বোধ করছে। উদাহরণস্বরূপ, বিহারে হিন্দী চাপিয়ে দেওয়ার ফলে ভোজপুরী, মৈথিলী, অঙ্গিকা, মগহী ও নাগপুরীর মত প্রধান প্রধান

ভাষায় যারা কথা বলে তারা অবদমিত হচ্ছে। বিহারের লোকেদের যেহেতু নিজস্ব উষ্চারণ শৈলী রয়েছে, সেহেতু তারা হিন্দী ঠিকভাবে উষ্চারণ করতেও পারে না। ঠিক এইভাবে কানাডায় ফ্রেঞ্চ, স্পেনে বাস্কে, ও সিসিলিতে সিসিলিয়ান ভাষা অবদমিত হচ্ছে।

কয়েক দশক আগে হিটলার ফ্রান্স আক্রমণ করে সে দেশের মানুষকে জোর করে জার্মান ভাষা শিখিয়ে ফরাসী ভাষাকে সে দেশ থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছিলেন। তা যদি সফল হত তা হলে অন্য যা কিছু হোক না কেন ফ্রান্সে এ জন্যে অবশ্যই প্রবল বিদ্রোহ দেখা দিত। জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবার মানসিকতা দেশের প্রগতিকে ব্যাহত করে। মানুষ শেষ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবেই ও বিদ্রোহ করবেই। জনগণের আবেগকে বেশী দিন জোর করে দাবিয়ে রাখা যায় না। মানুষ মাতৃভাষাতেই সব থেকে ভালভাবে নিজেকে প্রকাশ করে থাকে, আর এসই মাতৃভাষাকে দাবিয়ে রাখার অর্থ প্রাণধর্মকে হত্যা করা। তাই ভাষার অবদমন করা একটা পাপ। বহু-ভাষী ও বহু-ধর্মমতের দেশ ভারতে কোন একটি স্থানীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা দেশের সার্বিক উন্নতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। বস্তুতঃ, ভারতের সমস্ত ভাষাকেই স্বীকৃতি দেওয়া ও উৎসাহিত করা উচিত। এ ব্যাপারে ভারতের উচিত অন্যান্য কয়েকটি দেশকে অনুসরণ

করা। উদাহরণস্বরূপ, সুইজারল্যাণ্ডের কথাই ধরা যাক। এখানে ইতালিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও রোমাঁশ্ ভাষায় যতলোক কথা বলে, তার দ্বিগুণের বেশী লোক জার্মান ভাষায় কথা বলা সত্ত্বেও, চারটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটাই সঠিক পন্থা–কারণ এই নীতি জনগণের সামূহিক মনস্তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায় না।

ঠিক তেমনি যদি কোন দেশে একটি বিশেষ ধর্মমত জাতীয় ধর্মমত বলে ঘোষিত হয় তবে অন্য ধর্মমতের অনুসরণকারীরা সেই দেশের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবে না। ফলস্বরূপ সেই দেশের একতা বাধা প্রাপ্ত হবে। এই মৌল নীতি (জোর করে ভাষা বা ধর্মকে অবদমিত করা) উপেক্ষা করা হলে স্বল্পকালের জন্যে কোন রাজনৈতিক স্বার্থ হয়ত চরিতার্থ করা যায় কিন্তু এতে দেশের বিরাট ক্ষতিসাধন করা হয় আর সমস্ত প্রয়াসই এক দিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কখনও এহেন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যে কোন বিষয়ে সংখ্যাগুরুর মত সমাজে একতা স্থাপনের অনুকূল হচ্ছে না, কেন না জনমত এক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত এই অবস্থায় সামাজিক নেতাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, আর প্রত্যেকের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্যে বিশেষ করে যত্নশীল হতে হবে। তাদের কর্মপন্থা এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে কোন গোষ্ঠীরই

সেন্টিমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যেমন কোন এক একান্নবর্তী পরিবারে সাত ভাই–বোন কোন বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত। চারজন একদিকে আর তিনজন অন্য দিকে। যদি পরিবারের কর্তা সংখ্যাগুরুর মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন তা হলে নিশ্চিত ভাবে পরিবার দুই ভাগে বিভাজিত হয়ে যাবে। তাই এ ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্তই নিতে হবে যাতে সব ভাইবোনের স্বার্থই সুরক্ষিত থাকে।

যদি কোন গোষ্ঠী এই মৌল সামাজিক–রাজনৈতিক নীতির বিরোধিতা করে, তাহলে তোমরা বজ্রকণ্ঠে ও পূর্ণ শক্তিতে অবিলম্বে তাদের বিরোধিতা করবে। যেহেতু তোমরা জনগণের সামূহিক মনস্তত্ত্বের সমর্থন করছো, তাই তোমরাই জয়ী হবে। কিন্তু আন্দোলন শুরু করার আগে জনগণকে এই ধরণের শোষণ সম্পর্কে সচেতন করে' নেবে, তা না হলে তোমাদের আন্দোলন ব্যর্থ হবে। যদিও জনগণের সচেতনতা আনতে কিছুটা সময় লাগবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তোমরাই জয়যুক্ত হবে।

বিহারের মৈথিলী জনগোষ্ঠীর জনৈক নেতা মৈথিলী ভাষার প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন গড়ে তুলতে মনস্থ করলেন আর সেই উদ্দেশ্যে এক বিশাল জনসভা সংগঠিত করলেন। তিনি সেই সভায় মৈথিলী ভাষার অবদমন সম্পর্কে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। প্রথমের দিকে শ্রোতারা প্রত্যেকেই মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য শুণছিল ও সমর্থনও

করছিল। তাঁর ভাষণের শেষের দিকে জনতাকে সম্বোধিত করে তিনি বললেন, "আমরা মিথিলাতেই বাঁচবো আর মিথিলাতেই মরবো।"

তা শুণে জনতার মধ্যে একজন চিৎকার করে বলে উঠল, "হ্যাঁ, আমরা মিথিলার জন্যেই সব কিছু করব আর মিথিলার জন্যেই বাঁচব কিন্তু মিথিলাতে কেন মরব, মরব তো মরব কাশীতে মরব।” পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী যদি কেউ কাশীতে মৃত্যুবরণ করে তবে সে স্বর্গে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সভার সমস্ত লোক এই ব্যষ্টির মতকে সমর্থন করা শুরু করল। ফলে সভাই পণ্ড হয়ে গেল। এটা হ'ল এইজন্যে যে সেখানকার মানুষ নিজেদের মাতৃভাষার অবদমন সম্পর্কে যথেষ্ঠ ভাবে সচেতন ছিল না। তাই তারা সহজেই ধর্মমতগত ভাবজড়তা বা কুসংস্কারের পথকেই অনুসরণ করল।

তাই তোমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে ও সুনিশ্চিত হবে যে উপরি-উক্ত তিনটি মৌলনীতি যেন লঙ্ঘিত না হয়। এই ভাবে তুমি সমাজকে প্রকৃত কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারবে।

১৪ নভেম্বর ১৯৮৮, কলিকাতা